গোপালদেবের স্বপ্ন

বনফুল

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা ৭৩

গ্রন্থালয় সংস্করণ ঃ
২৭শে আষাঢ় ১৩৭০

প্রকাশক ঃ
আনন্দরূপ চক্রবর্তী
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ ঃ
রূপায়ণ
কলকাতা-৫

মুদ্রাকর ঃ
দুলালচন্দ্র ভূঞা
৪/১এ সনাতন শীল লেন
কলকাতা-১২

গোপালদেবের স্বপ্ন

উৎসর্গ

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

॥ ১ ॥

গঙ্গার তীর। বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে চারিদিক ঝলমল করিতেছে। একটা শুষ্ক গাছের উচ্চ শাখে বসিয়া তীক্ষ্ণ মিহি সুরে একটা চিল তাহার সঙ্গিনীকে আহ্বান করিতেছে। চারিদিকে ছোট বড় বালুর স্তূপ। শীর্ণ-ধারা গঙ্গা একটা সংকীর্ণ খাতে বহিতেছে। খাতের দুই পাশে নানারকম সবুজ। দূরে দূরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঝাউ-গাছ। এখানে—এই বালুর চরে—সবই যেন অবাধ। এখানে যেন সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে। কোন প্রহরী নাই। নাম-না-জানা কয়েকটা পাখী নদীর উপরে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে ফড়িং প্রজাপতিও দেখা যাইতেছে, একটা ছাগলের পিঠের উপরে ফিঙে বসিয়া আছে একটি। এই বিরাট চরে—এই আলো-বাতাস-আকাশের রাজত্বে—দৃষ্টি দিগন্তরেখায় গিয়ে ঠেকে। কোথাও কোন বাধা নাই।

এই চরে ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে কার্তিক আসিয়া হাজির হইল। আর তাহার পিছনে পিছনে আসিল একটা ল্যাবরাডর কুকুর। কার্তিকের হাতে একটি ময়লা থলি। থলিটি নামাইয়া বসিল সে। বসিয়া নিজের পা-টা দেখিল। পা-টা মচকাইয়া গিয়াছিল। কুকুরটা তাড়া করিয়া গেল ছাগলটাকে। ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল ছাগলটা।

লর্ড ফিরিয়া আসিল। তাহার চোখে স-প্রশ্ন দৃষ্টি।

"পরের ছাগল ধরতে যেও না। ও ছাগল আমরা হজম করতে পারব না। পারো তো মুর্গি-টুর্গি ধর একটা—"

লর্ড ল্যাজ নাড়িতে লাগিল। কার্তিক বাঁ পায়ের পাতাটাকে নাড়াইয়া দেখিল খানিকক্ষণ। তাহার পর কুকুরটাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আচ্ছা, লর্ড, তুমি আমার পিছু পিছু বাড়ি থেকে চলে এলে কেন। আমি তো একটা ভ্যাগাবণ্ড, আর তুমি তো একটি রাক্কোস। আমার নিজের খাবার যোগাড় করাই মুশকিল, তোমার খাবার পাব কোথায়—"

লর্ড ল্যাজ নাড়িতে লাগিল। তাহার পর থাবা গাড়িয়া বসিয়া থাবার উপর মুখটি রাখিয়া সোৎসুক দৃষ্টিতে কার্তিকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"বিস্কুট নেই, লেড়ুয়াও নেই, একটি পয়সা পকেটে নেই। কি খাবি এখন ? বোকা ভুত কোথাকার, কেন চলে এলি আমার সঙ্গে—"

লর্ড ল্যাজ নাড়িতে লাগিল। লর্ড অভিজাতবংশীয় কুকুর। তাহার কুচকুচে কালো রং রেশমের মতো চকচকে। চোখ দুটি বুদ্ধিদীপ্ত, দুষ্টু দুষ্টু। মুখটি সুশ্রী, কান দুটি ছোট ছোট, মখমলের মতো নরম। কপালটি চওড়া। বুকটাও চওড়া। কার্তিকের মুখের দিকে চাহিয়া সে ক্রমাগত ল্যাজ নাড়িতে লাগিল।

কাছেই একটা বড় অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। কার্তিক উঠিয়া গিয়া তাহারই গুঁড়িতে ঠেস দিয়া বসিল। খানিকক্ষণ সে সবিস্ময়ে অশ্বত্থ বৃক্ষের শিকড়গুলির দিকে চাহিয়া রহিল। শিকড় নয় যেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নখ, প্রাণপণে মাটি আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার পর থলিটা উপুড় করিল সে। থলি হইতে বাহির হইল একটা ছেতো-ধরা রুটির আধখানা, অনেক তরিতরকারি এবং ফলের খানিকটা খোসা, বিবর্ণ লাল শাক, একটা লোহার ছোট কড়াই এবং খুন্তি, আর কয়েকটা ছোট ছোট টিন। প্রত্যেকটি

টিনের ঢাকনা খুলিয়া খুলিয়া দেখিল সে। দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল। গুঁড়ো মশলা একেবারে নিঃশেষ হয় নাই। এসব ছাড়াও বাহির হইল একটা ছেঁড়া-ছেঁড়া জাবদা গোছের খাতা। খাতাটা উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল সে।

কার্তিককে দেখিলেই মনে হয় ভদ্রঘরের ছেলে। গৌরবর্ণ, সুপুরুষ। কয়েকদিনের অনাহারে, অনিদ্রায় এবং পথশ্রমে তাহার মুখে কিন্তু একটা ক্লান্তির ছায়া পড়িয়াছে। বড় বড় ভাসা-ভাসা চোখের কোলে কালী, মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। গায়ের পাঞ্জাবী সিল্কের, কিন্তু ময়লা হইয়া গিয়াছে। পায়জামাটার অবস্থাও ভদ্র নহে। পায়ে জুতা নাই।

লর্ড হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়া গেল। গঙ্গার শীর্ণ জলধারার আশেপাশে গোটা তিনেক বাটান চরিতেছিল। উড়িয়া গেল।

"ছি, ছি, লর্ড উড়িয়ে দিলে। আগে দেখতে পেলে আমি গুলতি বার করতুম।"

পকেট হইতে সে একটা গুলতি এবং কয়েকটি মাটির গুলিও বাহির করিল।

আবার লর্ড ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়া গেল. কার্তিক দেখিল সেই বামনটা আসিতেছে। তাহার হাতেও একটা থলি। সার্কাস-পলাতক এই বামনটার সহিত রাস্তায় আলাপ হইয়াছিল। তাহার পর হইতে লোকটা আর সঙ্গ ছাড়িতেছে না। কার্তিক চাহিয়া রহিল তাহার দিকে কয়েক মুহূর্ত। প্রকাণ্ড মাথা, হেলিয়া দুলিয়া হাঁটিতেছে। লর্ডের সহিত কয়দিনেই খুব ভাব হইয়া গিয়াছে। লর্ড তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিতে লাগিল।

বামন মুখে আঙুল ঢুকাইয়া জোরে সিটি দিল একটা। তাহার পর মুখ সুচালো করিয়া শব্দ করিয়া উঠিল—হুই—হুই—হুই—

তাহার পর আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল কয়েক মুহূর্ত। আবার হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল। কাছে আসিয়া বলিল—"আমি গঙ্গার ঘাটের দিকে চলে গিয়েছিলাম। তুমি বললে, গঙ্গার ঘাটে যাবো—সেখানে গিয়ে দেখি মেলা লোক চান করছে। অনেক খুঁজলাম তোমাকে। ওদিক পানে গেলাম—গিয়ে দেখি শ্মশান। তারপর এই দিকে এলাম হাঁটিতে হাঁটিতে—"

"তুমি চরের ওপারে বড় গঙ্গায় গিয়েছিলে ?"

"হুঁ"। অনেক হেঁটেছি। কোথাও পাই না তোমাকে। কিন্তু আমি বেঁটে বীর আনটারাম, ছাড়বার পাত্র নই। ঠিক করলুম খুঁজে বার করবই। করলামও। হুই—হুই—হুই—"

বগল বাজাইয়া নাচিতে লাগিল। লর্ডও ঘেউ ঘেউ করিয়া লাফাইতে লাগিল তাহার চতুর্দিকে।

"তুমি হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে ঢুকে গেলে কোথা। তোমাকে বললাম, চল গঙ্গার ধারে যাই, তার আগে কিছু খাবারও জোগাড় করতে হবে, তারপর গঙ্গার ধারে গিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়ব—"

আনটারাম আকর্ণবিস্তৃত হাসি হাসিয়া বলিল—"ভীড়ের মধ্যে ঢুকেছিলাম রোজগারের চেষ্টায়। কিছু রোজগার করলামও। নানারকম খেলা দেখালাম। মাথা মাটিতে রেখে পা দুটো আকাশপানে তুলে বনবন করে ঘুরলাম খানিকক্ষণ। চড় চড় চড় করে হাততালি পড়ল। বললাম—হাততালিতে পেট ভরবে না দাদা। পয়সা চাই।

আরও একটা খেলা দেখাচ্ছি। নাচ দেখাব একটা। ভীল সর্দারের ওয়ার ডান্সটা দেখালাম। তরোয়াল ছিল না, কিন্তু একটা বাখারি দিয়েই মাত্ করে দিলাম। অনেক পয়সা পড়ল। তিন টাকা বারো আনা। এই থলিটা কিনলাম। কিছু কুঁচো চিংড়ি আর আধখানা লাউ কিনলাম। কাঁচা লংকাও কিনেছি—তুমি কোনও খাবার যোগাড় করতে পেরেছ—? সন্দেশ কিনব ভাবলাম, কিন্তু বড্ড দাম—"

"আমার পয়সা ফুরিয়ে গিয়েছে। সেদিন তুমি চপ কাটলেট খেতে চাইলে, তাইতেই সব পয়সা ফুরিয়ে গেল আমার—"

"খাসা ছিল কিন্তু চপ কাটলেটগুলো। আমাকে মোহিনী মাঝে মাঝে খাওয়াত কিনা, তাই লোভ হয়ে গেছে—"

"মোহিনী কে?"

"সার্কাসের একটা মেয়ে। ওস্তাদ মেয়ে। ছাতা নিয়ে তারের উপর গটগট করে চলে যায়। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে টপ্ করে চড়ে আবার টপ করে নাবে। আর সাইকেল যা চালায়—এক চাকায়, দু'চাকায়, দুমড়ে. মুচড়ে সে এক কাণ্ড—!"

"সার্কাস থেকে পালালে কেন?"

"ওই যে বললাম, সবাই আমাকে ক্ষেপাত। আমাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করত না কেউ। চাকরবাকরগুলোও আমাকে ডাকত—এরে বামনা, এরে নাটা। মোহিনীকে একদিন লজ্জার মাথা খেয়ে বলেছিলাম—তোকে আমি ভালোবাসি মোহিনী। বললে—জুতিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ে দেব হারামজাদা বেঁটে কোথাকার। বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চাস—"

তাহার চক্ষু দুইটি জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল। সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল সে।

"অথচ আমি কোন বংশের ছেলে তা যদি জানত হারামজাদি—"

কার্তিক ও প্রসঙ্গে আর আলোচনা করা সমীচীন মনে করিল না। সে থলি হইতে যে জিনিসগুলা বাহির করিয়াছিল সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল—"ওগুলো কি খাওয়া উচিত?"

"কি ওগুলো, কোথায় পেলে?"

"একটা ডাস্টবিন হাটরে বার করেছি। তার মধ্যে এই খাতাটাও ছিল। একটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি—"

"যাবে না কেন? পাঁউরুটির ছেতোগুলো ধুয়ে ফেলি। শাক আর খোসাগুলো ধুয়ে ফেলা যাক। তার সঙ্গে লাউ আর কুঁচোচিংড়ি, আর কাঁচা লংকা দিয়ে সেদ্ধ করে ফেলি এস। নুন-টুন আছে তো?"

"আছে। গোলমরিচের গুঁড়ো পেঁয়াজ আর হলুদের গুঁড়োও আছে। একটু তেল পেলে ভালো হতো। মাছগুলো লাল করে ভেজে নিলে—"

"তেল নিয়ে আসছি। কাছেই একটা মুদির দোকান আছে। এখনও আমার পয়সা আছে কিছু—"

আন্টারাম আবার হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেল।

কার্তিক অশ্বত্থ গাছের গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়া পায়ের উপর পা-টা তুলিয়া দিল। দশদিন হইল শ্বশুরবাড়ি হইতে অপমানিত হইয়া শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করিয়াছে সে।

বড় শালা তাহাকে জুতো ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। মারিবেই তো, বেকার ঘরজামাইকে সেকালে লোকে পূজিত, একালে পূষিতে পারে না। সহসা তাহার মনে হইল সেকালের লোকও কি পূষিত? 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' কথাটা তো সেকালেরই। না, বেকার লোককে কোনকালেই কেহ প্রশ্রয় দেয় না। উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা আবার তুলিয়া লইল সে। উপন্যাস পড়িতে বরাবরই ভালোবাসে। কলেজে যখন পড়িত তখন পাঠ্যপুস্তকের দিকে তত আগ্রহ ছিল না। লাইব্রেরি হইতে উপন্যাস প্রচুর পড়িয়াছিল। বি-এতে থার্ড ক্লাস অনার্স পাইয়াছিল ইতিহাসে। চাকুরি জুটে নাই। বাবা মা কেহ নাই। ভাই বোনও না। মামার বাড়িতে মানুষ। চেহারাটা ভালো ছিল বলিয়া এক বড়লোক জমিদার সাধিয়া তাহাকে ঘরজামাই করিয়াছিলেন। একটি ছোট শালা উকিল হইয়াছেন। তিনি অনেকদিন হইতেই বলিতেছিলেন এইবার তুমি চরিয়া খাও, আর আমি তোমার ভরণপোষণ করিতে পারিব না। কার্তিক কথাটায় এতদিন কান দেয় নাই। কারণ সে জানে চরিয়া খাইবার মতো মাঠ নাই দেশে। কিন্তু পাদুকা-প্রহারের পর আর সেখানে থাকা গেল না। অথচ ব্যাপারটা কিছুই নয়, তাহার বড় শালার সিল্কের পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়া সে বেড়াইতে গিয়াছিল। আগেও গিয়াছে। সেইদিনই লোকটা হঠাৎ মারমুখী হইয়া উঠিল। স্ত্রী নিমুর রোগা মুখটা মনে পড়িল তাহার। ভাসা-ভাসা অশ্রুভরা চক্ষু দুইটি আবার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। তাহাকে বলিয়া আসিয়াছে দেশে হুগলী জেলায় তাহার যে পৈতৃক ভিটা আছে সেইখানে সে যাইতেছে। গ্রামটার নাম সিংরা। কখনও সেখানে যায় নাই। সেই অচেনা গ্রামে গিয়া সে সংসার পাতিবে। কুঁড়েঘরে শাকান্ন খাইয়া নিমুকে লইয়া সুখে থাকিবে। এই তাহার আশা। এই আলেয়ার পিছনে সে এখন ছুটিতেছে। হাতে পয়সা নাই। জুতো জোড়া একটা মুচিকে বিক্রয় করিয়াছে। বিক্রয় করিবার মতো আর কিছু নাই। হাতে পয়সা থাকিলে ট্রেনে হুগলি যাইত। সেখানে গিয়া সিংরা গ্রামের সন্ধান করিত। কিন্তু পয়সা নাই। হাঁটিয়াই যাইতে হইবে। মুঙ্গের হইতে হুগলি কতদূর? কে জানে। কাল অন্ধকারে হাঁটিতে হাঁটিতে একটা খানার ভিতর পড়িয়া গিয়া পা-টা মচকাইয়া গিয়াছে। ভাগ্যে আন্টা ছিল, সে তাহাকে টানিয়া তুলিল; কিছুদূরে কাঁধে করিয়া বহিয়া আনিল। অসম্ভব জোর ছোঁড়াটার গায়ে। পথের বন্ধু। ভগবান জুটাইয়া দিয়াছেন। নিজের পরিচয় বলিতে চায় না। বলে—সার্কাস হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। আর কিছু বলিতে চায় না। আজ হঠাৎ মোহিনীর কথা বলিল। হঠাৎ যেন তাহার মন খুলিয়া গেল। জুতো জোড়া বিক্রয় করিয়া সে পাঁচসিকে মাত্র পাইয়াছিল। রাস্তার পাশের একটা দোকানে বসিয়া চা আর লেড়ুয়া খাইতেছিল। হঠাৎ নজরে পড়িল, আন্টা তাহার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। কার্তিক লর্ডকেও খান দুই লেড়ুয়া দিয়াছিল। লর্ডের মুখ হইতে কয়েকটুকরা লেড়ুয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। কার্তিক দেখিল আন্টা সেই টুকরাগুলির উপরও লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। তখন তাহাকে বলিতেই হইল—"আপনি চা খাবেন?" সঙ্গে সঙ্গে আন্টা ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিয়াছিল—"হিঁ—"। সে 'হাঁ'কে 'হিঁ' বলে। খাওয়া শেষ করিয়া সে যখন আবার চলিতে শুরু করিল দেখিল আন্টাও তাহার পিছু পিছু আসিতেছে। সে যখন মোড় ফিরিল আন্টাও ফিরিল। তখন তাহাকে থামিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইল, "আপনি কোথা যাবেন—"

"তোমার সঙ্গে। বন্ধু হ'য়ে গেলাম—"

'আপনি' না বলিয়া সে একেবারেই 'তুমি' বলিল।

মুচীক হাসিয়া কার্তিককে হাতটা বাড়াইয়া দিতে বলিল।

"বেশ চল। কিন্তু জেনে রাখ, আমি বেকার।"

"আমিও তাই। কাজ জুটিয়ে নেব কোথাও না কোথাও। দু'খানা হাত দু'খানা পা আছে তো—অ্যাঁ কি বল!"

"তা তো বটেই। লেখাপড়া কতদূর?"

"সেদিকে অন্তরম্ভা, ম্যাট্রিক ফেল! সার্কাসে ঢুকেছিলাম! থাকতে পারলাম না, পালিয়ে এলাম। দেখা যাক অদৃষ্টে কি আছে—"

লর্ডকে কার্তিকই পুষিয়াছিল। একজন বড়লোকের ছেলে তাহাকে বাচ্চাটা দিয়াছিল। এজন্য তাহাকে অনেক কথা শুনিতে হইয়াছে শালার কাছে। বলিত—আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শংকরাকে ডাকে। লর্ড তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। এ লোকটাও জুটিল। আজ কিন্তু সে আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছে—এ তো একটা অ্যাসেট্ (asset)—টাকা রোজগার করিয়া আনিয়াছে। উঠিয়া পড়িল। নদীর ধারে গিয়া ছেতোধরা পাঁউরুটি, শাক আর খোসাগুলো সে ধুইয়া ফেলিল। কড়া আর খুন্তিটাও মাজিল। এ দুইটা তাহার নিজস্ব সম্পত্তি। ঠিক নিজস্ব নয়, শালার পয়সাতেই কেনা। বাড়িতে মাঝে মাঝে রান্না করিত সে। শৌখীন নূতন রকমের রান্না কচু, আলু সিদ্ধ করিয়া তাহাতে প্রচুর আদার রস দিয়া (এবং ঘি দিয়া) কচালবাদা প্রস্তুত করিয়াছিল একবার। বড় শালাও খাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল অনেক মাছের ছানা জলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গামছা থাকিলে ছাঁকিয়া তুলিতে পারিত। লুব্ধ দৃষ্টিতে মাছের ছানাগুলোর দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইঁট জোগাড় করিল গোটা চার। শুকনা ডালপালা জোগাড় করিল কিছু। উনুন চাই। কিন্তু উনুন খুঁড়িবে কি করিয়া? না খুঁড়িলে কি উনুন ধরিবে? একটু গর্ত মতো হওয়া দরকার।

"লর্ড—লর্ড—"

কোথায় গেল কুকুরটা। গাছের পিছনে যে ঝোপঝাড় ছিল সেখান হইতে লর্ড সাড়া দিল—ঘেউ ঘেউ ঘেউ। কার্তিক গিয়া দেখে লর্ড সেখানে গর্ত খুঁড়িতেছে। সম্ভবত ইঁদুর বা ছুঁচোর সন্ধান পাইয়াছে। অন্য সময় হইলে কার্তিক তাহাকে বকিত। এখন কিছু বলিল না। খুঁড়ুক খানিকটা। লর্ড বেশ খানিকটা খুঁড়িয়া ফেলিল। তাহার পর তাহার ভিতর মুখ ঢুকাইয়া দিল। নাকে মুখে মাটি লাগিয়া গেল। আবার খুঁড়িল খানিকটা। কোথায় ইঁদুর, কোথায় ছুঁচা, কিছুই নাই।

"সর দেখি—"

কার্তিক আশ পাশের জঙ্গল ছিঁড়িয়া গর্তটার চারিদিক পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। তাহার পর হাত দিয়া মাটিগুলা সরাইয়া সরাইয়া দেখিতে লাগিল গর্তটা কত বড় হইয়াছে। লর্ড ঘাড় বাঁকাইয়া কান খাড়া করিয়া ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে চাহিয়া রহিল গর্তটার দিকে। যদি কিছু বাহির হইয়া পড়ে।

"হুই—হুই—হুই—"

তাহার পরই একটা শিস। আন্টা আসিতেছে বোঝা গেল। কার্তিক ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল আন্টা বেশ দ্রুতপদে আসিতেছে।

"এই শিশিটাও কিনে নিলাম। তেল না হলে রাখব কিসে? রোজই তো তেল লাগবে।"

"বেশ করেছো—"

"আর এই ছুরিটাও। লাউ কুটতে হবে তো—"

"সব খরচ করে' ফেললে?"

"না, আনা চারেক আছে এখনও। বাঃ, তুমি তো খাসা উনুন বানিয়েছ দেখছি।"

"লর্ড বানিয়েছে—"

লর্ড ল্যাজ নাড়িতে লাগিল এবং অকারণে চীৎকার করিল—কাপ্ কাপ্ কাপ্।

লর্ডের গলা দিয়া নানারকম ডাক বাহির হয়।

আন্টা নদীর শীর্ণধারার দিকে চাহিয়া বলিল, "এতে কি চান করা চলবে?"

"বোধহয় না—"

"আরে আরে আরে!"

"কি—"

"হুই দেখ—বগমামা। তোমার গুলতিটা কোথা গেল। লর্ডের খাবারটাও যোগাড় করে ফেলি!"

গুলতি লইয়া আন্টা বকটার দিকে আগাইয়া গেল। কিছুদূরে গিয়া বসিল। তাহার পর হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। লর্ড হামাগুড়ি দিয়া তাহার পিছু পিছু চলিল। দেখা গেল আন্টার লক্ষ্য অব্যর্থ। বকটা ঝটপট করিয়া কিছুদূরে উড়িল, কিন্তু পড়িয়া গেল শেষ পর্যন্ত। লর্ড বনবন করিয়া ছুটিয়া গিয়া মুখে করিয়া লইয়া আসিল সেটাকে।

"ওটা তুইই খা। দাঁড়া পালকগুলো ছাড়িয়ে দিই—"

লর্ড প্রথমে কিছুতেই দিতে চায় না। অনেক ছুটাছুটি করিয়া তাহার মুখ হইতে আন্টা বকটা কাড়িয়া লইল। কার্তিক জিজ্ঞাসা করিল—"কুঁচো চিংড়ি কি করে কুটব?"

"এদিকে এস। একটা ইটও আন। ওরই উপর একটু রগড়ে নাও না। তারপর লাল করে ভাজ—"

ঘণ্টা দুই পরে।

আন্টা হাতের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। বকের পালক চারিদিকে ছড়ানো। উনুনটার আগুন নিবিয়া গিয়াছে। কার্তিকের চোখে ঘুম নাই। অশ্বত্থ গাছের জটিল গুঁড়িটার উপর ঠেস দিয়া সে দিগন্তের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। রৌদ্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ তাহার মনে হইল রোদটা যেন একটা বাঘ। রোজ ভোরে আসে আর পৃথিবীর বুক হইতে রস শোষণ করিয়া লয়। তাহার পর অসংলগ্ন-ভাবে মনে হইল নিমু কি এখন ছাতে বসিয়া বড়ি দিতেছে? চিন্তাধারা কেমন যেন এলোমেলো হইয়া গেল। মনে পড়িল, নিমু তাহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছিল। বলিয়াছিল, "চলে যেও না। দাদা রাগী মানুষ, রাগের মাথায় একটা কাজ করে

ফেলেছে, আবার সব ঠিক হ'য়ে যাবে। তুমি দাদার পাঞ্জাবী আর পোরো না। থাকো, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। তুমি চলে গেলে আমি কাকে নিয়ে থাকব? ভগবান একটা ছেলেপিলেও তো দেন নি—"। নিমু চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিয়াছিল। এই ছবিটা বারবার মনে পড়িতে লাগিল। সে তখন নিমুকে বলিয়াছিল—কেঁদো না, আমি সিংরায় পেঁছে তোমাকে নিয়ে যাব। এরকম গলগ্রহ হ'য়ে পশু-জীবন যাপন করতে আর বোলো না আমাকে।·নিমু তবু কাঁদিয়াছিল। হঠাৎ একটা হাওয়া উঠিল। পাণ্ডুলিপির পাতাটা ফরফর করিয়া উড়িতে লাগিল। পাণ্ডুলিপিটা তুলিয়া সে পাতা উল্টাইতেছিল, এমন সময় লর্ড ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিল আন্টা। তাহার ঘুম খুব সতর্ক।

"কি হ'ল কুকুরটার আবার।"

"কিছু দেখেছে বোধহয়।"

আন্টা উঠিয়া গেল এবং একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"বোকাটা! গাছের উপর চড়াই পাখী দেখে লাফালাফি করে মরছে। যেন ধরতে পারবে—"

আন্টা শুইল আবার।

"আবার ঘুমুবে না কি।"

"না, আর ঘুম হবে না। একবার ঘুম ভাঙলো তো নিশ্চিন্দি। আর দু'পাতা এক হবে না—"

"তাহলে এইটে শোন—"

"কি ওটা—"

"পড়ছি শোন না।"

"পড়। ছেলেবেলায় রামায়ণ শুনতে খুব ভালো লাগত—পড়, পড়—আমি শুয়ে শুয়ে শুনি—"

কার্তিক পড়িতে শুরু করিল। আন্টা তাহার পাশে শুইয়া পড়িল।

"সূত্রধার প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কণ্ঠে চম্পকের মালা। ললাটে রক্ততিলক। কেশদামে মেঘমহিমা। দৃষ্টি স্বপ্নময়। পরিধানের কাষায় বস্ত্রে স্বর্ণ-দ্যুতি! শুভ্র উত্তরীয়টা বন্ধুর মতো কণ্ঠ-লগ্ন। উত্তরীয়ের ফাঁকে শুভ্র উপবীতগুচ্ছ দেখা যাইতেছে, মনে হইতেছে যেন ঐতিহ্যের প্রবহমান ধারা। সূত্রধার করজোড়ে নিমীলিত নয়নে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর সম্ভবত মহাকালকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তোমার অনন্ত-বিস্তৃত রঙ্গমঞ্চে যে মহানাটক বারবার অভিনীত হয়েছে, বারবার অভিনীত হবে, বিস্মৃতির পলিমাটিতে যা বারবার আচ্ছাদিত হয়, আবার সহসা আত্মপ্রকাশ করে নবরূপে নবীন দীপ্তিতে, যার বাণী দিবসে সূর্যের মতো, রাত্রিতে নক্ষত্রময়, যার তেজ নবোদ্ভিন্ন অঙ্কুরে অমর—তারই কথা আমি প্রথমে বলব একটি রূপকের আকারে। তোমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।"

কিছুক্ষণ নিমীলিত নয়নে থাকিয়া তিনি গোপালবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"গোপালবাবু, এবার হয়তো আপনার তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হবে। তখন আপনি দেখবেন দুঃসাধ্য সাধনই মানুষের ব্রত, অসম্ভবকে সম্ভব করেই তার কীর্তি কালজয়ী হয়েছে। তার আগে অনলস আর অরূপের রূপকথাটি শুনুন। এই রূপ-কথাই কাব্যে মণ্ডিত হয়ে ইতিহাসে প্রত্যক্ষ সত্যরূপে দেখা দিয়েছে নানারূপে।

কখনও রক্তসমুদ্র সন্তরণ করে, কখনও বিক্ষুব্ধ শোভাযাত্রার পুরোভাগে। যে শক্তি চিরচঞ্চল, সেই অনলস। তাকে আমি পুরুষরূপে কল্পনা করেছি। আর যার বিশেষ কোন রূপ নেই, কিন্তু যা নানারূপে বিকশিত হবার জন্যে সদা উন্মুখ, সেই অরূপ। এদের কথোপকথন শ্রবণ করুন।

অনলস বলছিলেন—"আমি তো এক মুহূর্ত থামতে পারি না। অনন্তের অন্ত দেখবার অসম্ভব আশা আমাকে পাগল করে তুলেছে। জানি না সে আশা পূর্ণ হবে কিনা—"

অরূপ মৃদু হেসে উত্তর দিলেন কবিতায়।

"অনন্তের অন্ত পেতে মিথ্যা কেন চেষ্টা ভাই
অন্ত যার স্পষ্ট তার সবটা তুমি দেখতে পাও?
দেখতে পেলে দেখতে তুমি সান্তই যে অনন্ত
পরমাণুর আকাশেতেই মহাকাশ বিলম্বন।
ছোট্ট ফুল ছোট্ট নয়, সত্যি অতি মস্ত সে
তারই তরে সূর্য ওঠে পবন হয় প্রমত্ত
তারই তরে আকাশব্যাপী ষড়ঋতুর রহস্য
অন্তহীন লীলা তাদের টের পাও কি বয়স্য?"

অনলসের ভ্রূকুঞ্চিত হল। তারপর তিনি হেসে ফেললেন। বললেন, "না পাই না। কাজের ডাক ছাড়া আর কোনও ডাক শুনতে পাই না আমি। কাজের পর কাজ, তারপর আরও কাজ, একটার পর একটা কাজের মধ্যেই হারিয়ে ফেলতে চাই নিজেকে। কিন্তু পারছি না। তুমি তোমার কাব্যের সেতারে যে মীড় টেনে বার করতে পার আমি তাও পারি না। কিন্তু একটা সত্যি কথা বলব?"

"বল—"

"আমার মনে হয় তুমি সময় নষ্ট করছ। সুরের মীড় টেনে যে স্বপ্ন দেখছ তা অবাস্তব—"

আবার অরূপ হেসে উত্তর দিলেন কবিতায়।

অবাস্তব নয় স্বপ্ন:
বিষ-মগ্ন
ধূর্জটির চোখে পড়েছে স্বপ্নের ছায়া।
পার্বতীর কায়া
স্বপ্ন-বিনির্মিতা;
কর্মের হল-মুখে উঠেছিল স্বপ্ন-সীতা।
শূন্যের নীল আঁখি
থাকি থাকি
বর্ণের আভাস পায় স্বপ্ন থেকে
সন্ধ্যা উষা রামধনু এঁকে যায় যাহা সব
স্বপ্ন তাহা—নয় অবাস্তব।

অনলস একটু বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন অরূপের মুখের দিকে। তারপর বললেন—"আমি স্বপ্ন দেখতে পারি না বলেই হয়তো এত খেটেও ঠিকমতো কিছু

রে উঠতে পারি না। আমি জানি কাজের চাকায় জগৎ চলছে, আমি সেই চাকা হ'তে
াই, তোমার স্বপ্ন কি সে চাকায় তেল জোগাতে পারবে? তোমার স্বপ্ন তো কোনও
াজে মূর্ত হচ্ছে না। একটা রঙীন ধোঁয়ার মধ্যে বাস করছ তুমি। কি করবে তুমি এই
কেজো স্বপ্ন নিয়ে—"

"কিছুই করব না। কিছু করা তো আমার লক্ষ্য নয়, যদি কিছু হ'য়ে ওঠে
াপনি হবে, আমি তা নিয়ে মাথা ঘামাই নি। আমি কেবল দেখে মুগ্ধ হই। আমার
ক্ষ্য আনন্দ, এবং পেলে সেটা আঁকড়ে ধরে রাখা। কিন্তু রাখা যায় না, মুশকিল
ইখানে। দেখতে দেখতে লাল নীল হয়ে যায়, নীল রূপান্তরিত হয় সবুজে। মদমত্ত
তঙ্গ প্রজাপতি হয়, দৈত্য দেখতে দেখতে হ'য়ে যায় পরী। তাই আঁকড়ে ধরার চেষ্টা
ার করি না। আমি স্বপ্ন-বিলাসী। এতে তোমার রাগ কেন—"

"রাগ তোমার নাগাল পাই না বলে। কে যেন আমার মনের ভিতর বসে অনবরত
লছে তোমাকে পেলেই আমার কাজের গোছ হ'য়ে যাবে। তুমিই আমার কাজের
রণা। কিন্তু তুমি আমার নাগালের বাইরে কখন কোন স্বপ্নের আকাশে যে ঘুরে
ড়াচ্ছ তার ঠিক পাই না। মন খারাপ হয়ে যায়।"

অরূপ হাসিমুখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন—"আমারও মনের
তর কে যেন বলে অনলসের নাগাল না পেলে তুমি সার্থক হবে না। তবু আমি
খনও স্বপ্নের আমেজেই আছি। স্বপ্ন যেন দেখি জান? স্বপ্ন চোখে আটকে থাকে
। আগে আমার আটকে রাখার প্রবৃত্তি ছিল, তাই দুঃখ পেতাম। এখন বুঝেছি
দ যাওয়াটাও সুন্দর। আমি রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে স্বপ্নের শোভাযাত্রা দেখি
জকাল। কি ভালোই যে লাগে। —তুমি কাজ নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করছ সেটাও
রাপ লাগে না। মেঘ দৌড়য়, হাওয়া দৌড়য়, এমন কি গাছের অংকুররাও স্থির হয়ে
দ নেই। নিখিল বিশ্বে সবাই ছুটেছে, তুমিও তাব সঙ্গে ছুটছ এটা আমার বেশ
গে, কিন্তু আমার মনে হয় নিখিল বিশ্বের ছোটার যে ছন্দ তার সঙ্গে তোমার
টার ছন্দ ঠিক যেন মিলছে না। বললে বিশ্বাস করবে না, আমিও মনে মনে দৌড়াই
মার সঙ্গে। তোমার সঙ্গে যোগ দিতে পারলে হয়তো আনন্দই পেতাম। কিন্তু
রি না। তোমার কর্ম বড় স্থূল। দড়িব মতো জড়িয়ে যায় হাতে। ও স্বপ্নের মতো
 যায় না, স্থূল অস্তিত্ব নিয়ে অনড় হয়ে থাকে, আর ফাঁপিয়ে তোলে মিথ্যা
মিকাকে—"

অনলস সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন - "তুমি গীতা পড়নি?"

"পড়েছি"—উত্তর দিলেন অরূপ—"কিন্তু গীতা পড়লেই গীতার উপদেশ পালন
ার শক্তি হয় না। আসক্তি ত্যাগ কর বললেই কি তা ত্যাগ করা যায়? তুমি আসক্তি
গ করতে পেরেছ? সত্যি করে বলতো।"

"কাজ যতক্ষণ করি ততক্ষণ তার প্রতি আসক্তি থাকে বই কি। কিন্তু কাজ শেষ
গেলেই তার কথা ভুলে যাই আমি—"

"পথের ধারে দাঁড়িয়ে আমি যে স্বপ্নের মিছিল দেখি তা ভুলে যাব একথা ভাবতেও
ার খারাপ লাগে।"

হঠাৎ অনলস সানুনয়ে বললেন-—"তুমি এস আমার সঙ্গে অরূপ। এস আমরা
নে মিলে যাই।"

"তা কি করে সম্ভব—"

"শুনেছি সম্ভব। ওই যে দূরে দিগন্তে নীল পাহাড়ের উপর শ্বেতচন্দনতিলকের মতো মন্দিরটি দেখা যাচ্ছে—ওটি কার মন্দির জান?"

"সবাই বলে সরস্বতীর মন্দির। শুনে বিস্মিত হয়েছি। সরস্বতী কি কোন মন্দিরে আবদ্ধ থাকতে পারেন?"

"ও মন্দিরে কোনও প্রতিমা নেই। সুর আছে কেবল। অদ্ভুত সে সুর, সেই সুরে বহু এক হয়। বেসুরা সুরের সন্ধান পায়। ও মন্দিরের ছাত নেই। শুনেছি মাঝে মাঝে আকাশ থেকে স্বয়ং হংসবাহিনী আবির্ভূতা হন ওই মন্দিরে। তিনি স্বপ্নকে বাস্তব করেন, বাস্তবকে স্বপ্ন করে দেন অনায়াসে। অনেকে বলেন ওই মন্দিরে যে বিচিত্র সুর অহরহ ধ্বনিত হচ্ছে তাই মাঝে সর্বশুক্লা তন্বী তরুণী মোহিনীর রূপ ধারণ করে। তখন তাঁর পদপ্রান্তে স্থান পাবার আশায় আকাশ থেকে ছুটে আসে রাজহংস, তাঁর চতুর্দিকে মূর্ত হয় নীল সরোবর আর তাতে ফুটে ওঠে অসংখ্য শ্বেত পদ্ম। অসম্ভবকে সম্ভব করবার ক্ষমতা আছে ওই যাদুকরীর। চল আমরা যাই ওখানে—"

"আমার কল্পনা চলে গেছে। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি সুর সেখানে রঙের শোভায় মূর্ত। ভৈরবীর গৈরিকের সঙ্গে ভৈরবের রক্তরাগ, তোড়ির কনক কান্তির সঙ্গে পূরবীর সন্ধ্যাচ্ছটা মিশেছে সেখানে। কল্পনায় আমি সেখানে চলে গেছি অনলস।"

"কল্পনায় গেলে চলবে না। সশরীরে যেতে হবে। পথ অতি দুর্গম।"

"দুর্গমকে ভয় পাই না। চল এখনই বেরিয়ে পড়ি—"

অরূপ আর অনলস যাত্রা করলেন পর্বতের উদ্দেশ্যে। নভশ্চক্র-রেখালগ্ন বনানীতে একটা মৃদু গুরু গুরু শব্দ জাগল, আসন্ন কোনও আবির্ভাবের আশায় উন্মুখ হ'য়ে উঠল সমস্ত প্রকৃতি।

"আমি এখন চললাম। আবার আসব।' সূত্রধার অন্তর্হিত হইলেন।

পাগলা-গারদে বন্দী গোপালচন্দ্র দেব বিস্ফারিত নয়নে বসিয়াছিলেন। তিনি এতক্ষণ যাহা দেখিলেন, যাহা শুনিলেন তাহা তাঁহার নিকট অলীক মনে হইল না। তিনি অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—"এ মায়া নয়, স্বপ্ন নয়, মতিভ্রম নয়, রূপকও নয়, এ সত্যি।"

নাক-ডাকার শব্দে কার্তিক ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল বামনটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। লর্ডও তাহার পাশে ঘুমাইতেছে। একটা ঘুঘুর করুণ সুর কখন যে রুক্ষ বালুচরকে স্বপ্নাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল তাহা সে টেরও পায় নাই। সে-ও অনেকক্ষণ আচ্ছন্ন হইয়া বসিয়া রহিল। মনে হইল ঘুঘুর ওই করুণ সুরে যেন তাহারই মর্মের বাণী রূপ পাইয়াছে। আবার পড়িতে আরম্ভ করিল সে। এবার মনে মনে।

"গোপালচন্দ্র দেব সেকালের লোক। একালে হঠাৎ তিনি যেন বেমানান হইয়া গিয়াছেন। তিনি কাঁসার প্রশস্ত বগি থালায় পাঁচ রকম ব্যঞ্জন সহযোগে ভাত খাইতেছিলেন, হঠাৎ কে যেন সে থালাটা তুলিয়া লইয়া শালপাতার উপর কয়েক মুঠা ছাই দিয়া গেল। বলিল—ইহাই খাও। ইহাই এ যুগের খাদ্য। স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন গোপালচন্দ্র দেব। তিনি বড়লোকের ছেলে। অর্থোপার্জনের জন্য তাঁহাকে কখনও চাকুরি বা ব্যবসার নোংরামির মধ্যে যাইতে হয় নাই। লেখাপড়া লইয়া তেতলার

রটাতেই তিনি প্রায় একা একা সারাজীবন কাটাইয়াছেন। পিতার আদেশে বিবাহ করিয়াছিলেন, একটি পুত্র এবং একটি কন্যা হইয়াছে। তিনি কিন্তু সংসারী হইতে পারেন নাই। ছাত্রজীবনে স্কুল কলেজের সহপাঠীদের সংগেও তিনি তেমন মিশিতে পারিতেন না। তাঁহার একটিমাত্র বন্ধু ছিল। সে এখন এখানকার সিভিল সার্জন। গোপালচন্দ্র দেব যে বিরাট পণ্ডিত একথা বিদগ্ধ সমাজে অবশ্য অবিদিত নাই। এদেশের এবং বিদেশের অনেক নামজাদা পত্রিকায় তাঁহার নানা বিষয়ে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রতিবেশীরা কেহ তাঁহাকে চেনেন না। সকলের ধারণা তিনি ধনী লোক এবং অহংকারী। সত্যিই তিনি কাহারও সহিত মেশেন না। তাঁহার স্ত্রী দময়ন্তী সংসার চালান। দেব মহাশয়ের বয়স যদিও পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দেখিলে তাঁহাকে চল্লিশের বেশী বলিয়া মনে হয় না। ছিপছিপে লম্বা চেহারা, মুখটাও ঈষৎ লম্বাটে ধরনের, ভারী চিবুক, পাতলা ঠোঁট, প্রদীপ্ত চোখ। যদিও তিনি পণ্ডিত মানুষ, লেখা-পড়া লইয়াই সারা-জীবন কাটিয়াছে, কিন্তু তাঁহার চেহারাটা ক্ষত্রিয় সৈনিকের মতো। তাঁহার পেশল সুগঠিত দেহে ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব যেন উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। স্কুল-জীবন হইতে স্যাণ্ডোর ডাম্বেল লইয়া ব্যায়াম করিতে তাঁহার বাবাই তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন। সে অভ্যাস এখনও তাঁহার আছে। খুব প্রত্যুষে উঠিয়া ডাম্বেল ভাঁজেন। নিজেকে লইয়াই থাকেন তিনি সমস্ত দিন। যে জগতে বাস করেন, তাহা বাস্তব জগত নহে, কল্পলোক। নিজের ছেলেমেয়েকেও তিনি চেনেন না। তাহারা তাঁহার তেতলার ঘরে আসিতে ভয় পায়। তাহাদের দূর হইতে দেখিয়া তাঁহার যে ধারণা হইত তাহাতে তিনি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ অদ্ভুত। বাঙালীর ছেলে সাহেবী পোষাকে সাজিয়া ফ্যাসের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বাঙালীর মেয়ে সালোয়ার পাঞ্জাবী পরিয়া সিনেমা অভিনেত্রীর নকল করিতেছে—এসব তাঁহার স্কুল বা কলেজজীবনে তিনি কল্পনাও করিতে পারিতেন না। অথচ তাঁহার নিজের ছেলেমেয়েই এখন ওই সব বিদেশী পোষাক পরিতেছে। তিনি আপত্তি করিয়াছিলেন। মানে, গৃহিণীকে বলিয়াছিলেন—ছেলেমেয়েদের এ কি অদ্ভুত সাজে সাজাচ্ছ। গৃহিণী উত্তর দিয়াছিলেন, আজকাল স্কুল কলেজে সব ছেলেমেয়েরাই ওই ধরনের পোষাক পরে ওই আজকাল ফ্যাশান। তোমাদের যুগে তোমরা যা করেছিলে তা এ যুগে চলবে না। ওরা যদি আলাদা রকম কিছু করতে যায় লোকে ওদের টিট্‌কারি দেবে। গুরুদেবকে জিগ্যেস করেছিলাম, তিনিও বললেন দোলের সময় সবার গায়েই রং লাগে, সে রং বেশীদিন থাকে না। দোল ফুরুলে রং-ও চলে যায়। যুগের ফ্যাশান যুগের সংগেই চলে যাবে, ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। তাঁহার প্রবীণা গৃহিণী কিছুদিন হইতে একটি ছোকরা বাবাজীকে গুরু-পদে বরণ করিয়াছেন এবং পেটকাটা কোমর-বাহির-করা ব্লাউজ পরিয়া তাঁহার মেদবহুল কুৎসিত কোমরটাকে সকলের সমক্ষে প্রকটিত করিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন না। অথচ এই মহিলাই একদিন একগলা ঘোমটা দিতেন। আজকাল ঘোমটা উঠিয়া গিয়াছে। এককালে যিনি অবগুণ্ঠনবতী ছিলেন তিনি আজকাল মুখে ক্রীম পাউডার ঘসিয়া ডগমগে শাড়ি পরিয়া মহিলা সমিতিতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় যান। সেখানে ওই গুরুদেবই প্রধান বক্তা। শিষ্য-শিষ্যাদের কলুষিত আত্মাকে পরিষ্কার করিবার জন্য প্রত্যহ নাকি আধ্যাত্মিক বক্তৃতা দেন। গোপালদেব মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিতেন

কিন্তু মুখে কিছু বলিতেন না। তাঁহার ত্রিতল মহলটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। পাশাপাশি তিনটি বড় ঘর আছে। একটি ঘরে তাঁহার লাইব্রেরী, আর একটি তাঁহার শয়নঘর তৃতীয় ঘরটির ভিতর তাঁহার স্নান বাথরুম প্রভৃতির ব্যবস্থা। এখানে তিনি প্রত্যহ ব্যায়ামও করেন। তিনটি ঘরের সামনে প্রকাণ্ড ছাদ। খুব অস্বস্তি বোধ করিলে ছাদের উপর পায়চারি করেন—পৃষ্ঠে নিবদ্ধ হস্তের অঙ্গুলিগুলির সঞ্চালন হইতে তাঁহার মনের ভাব খানিকটা হয়তো বোঝা যায়। তিনি আর একটি কাজও করেন তাঁহার লাইব্রেরী ঘরের দেওয়ালে একটি কোষবদ্ধ তরবারি টাঙানো আছে। মাঝে মাঝে সেটি কোষমুক্ত করিয়া সেটির ধার পরীক্ষা করেন। শিরিষ কাগজ ঘসিয়া সেটিকে পরিষ্কারও করেন মাঝে মাঝে। ঝকঝকে শাণিত তরোয়াল। এটি তাঁহার প্রপিতামহ জীমূতবাহন দেবের অস্ত্র। তিনি একজন নিপুণ তরবারি চালক ছিলেন। এই তরবারির সাহায্যে তিনি বাঘ মারিয়াছিলেন। কথিত আছে এই তরবারির সাহায্যে তিনি একাই একদা এক ডাকাতের দলকেও নাকি হটাইয়া দিয়াছিলেন। দস্যুসর্দারের ছিন্ন মুণ্ডটি বর্শাফলকে গাঁথিয়া সেটি উপহার দিয়াছিলেন তদানীন্তন এক ইংরেজ রাজপুরুষকে। ইংরেজ রাজপুরুষটি সংস্কৃত রামায়ণ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি খুশী হইয়া জীমূতবাহনকে রাঘববাও উপাধি দেন। রাঘববাওয়ের তরবারিটি বহুবৎসর দেব-পরিবারের গুদাম-ঘরে পড়িয়াছিল। গোপালদেব সেটি বাহির করিয়া তাহাতে শান দেওয়াইয়া পরিষ্কার করিয়াছেন। সেকালের খাঁটি স্টীল মরিচা-মুক্ত হইয়া পুনরায় নব-দীপ্তিতে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। ইহার জন্য একটি নূতন সুদৃশ্য খাপও করিয়াছেন গোপালদেব। এই তরবারিটি তাঁহার লাইব্রেরির দেওয়ালে টাঙানো থাকে। তরবারিটি মাঝে মাঝে খুলিয়া তিনি কখনও চোখের সম্মুখে ধরিয়া রাখেন, কখনও মাথার উপর ঘোরান। তাঁহার মনে তখন অদ্ভুত একটা প্রেরণার সঞ্চার হয়। তিনি অনুভব করেন তাঁহার প্রপিতামহ জীমূতবাহন যেন তাঁহার মনের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেছেন। যদিও তিনি ত্রিতল হইতে নীচে নামেন না। তাঁহার খাবারও ঠাকুর চাকরে ত্রিতলের ঘরে দিয়া যায়—যদিও সমাজের সহিত এমন কি নিজের স্ত্রী ছেলেমেয়ের সহিতও তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কম,—কিন্তু দেশের মধ্যে পাপের আবর্জনা স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতেছে একথা তাঁহার অবিদিত নাই। কারণ প্রত্যহ তিনি বাংলা ইংরেজি অনেকগুলি খবরের কাগজ পড়িতেন। তিনি অনুভব করিতেন যে স্বাধীনতার নামে অরাজকতাই এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার মনে পড়িত ঐতিহাসিক গোপালদেবের কথা। মনে পড়িত তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে দেশে মাৎস্যন্যায় প্রচলিত ছিল। বড়রা ছোটকে গিলিয়া খাইত। মনে পড়িত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার বাংলাদেশের ইতিহাসে লিখিয়াছেন—"শশাঙ্কের মৃত্যুর পর শতবর্ষব্যাপী অনৈক্য, আত্মকলহ ও বহিঃশত্রুর পুনঃপুনঃ আক্রমণের ফলে বাংলার রাজতন্ত্র ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল। প্রায় সহস্র বৎসর পরে তিব্বতীয় বৌদ্ধলামা তারানাথ এই যুগের বাংলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, সমগ্র দেশে কোন রাজা ছিল না। প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত লোক, ব্রাহ্মণ এবং বণিক নিজ নিজ এলাকা স্বাধীনভাবে শাসন করিতেন। ফলে লোকের দুর্দশার আর সীমা ছিল না। সংস্কৃতে এইরূপ অরাজকতার নাম মাৎস্যন্যায়। পুকুরে যেমন বড় মাছ ছোট মাছ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে, দেশে অরাজকতার সময় সেইরূপ প্রবল অবাধে দুর্বলকে

উপর অত্যাচার করে…”—এইসব কথা স্মরণ করিয়া মনে মনেই তিনি উত্তেজিত হইতেন। ভাবিতেন, আমার নামও তো গোপালদেব—আমি কি—। তরবারিটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে এইসব কথা তাঁহার মনে হইত। প্রায়ই মনে হইত।

এইখানে, গল্পের মধ্যেই আমি একটা কথা উল্লেখ করিতে চাই। উল্লিখিত কাহিনীর গোপালদেব একটি কাল্পনিক ব্যক্তি। আমিই তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছি। আমিই এই গ্রন্থের গ্রন্থকার। আমার নাম ফকিরচাঁদ সামন্ত। আমি ইতিহাসের ছাত্র। হঠাৎ একদিন আমার মনে হইল ইতিহাসে তো কত বীরপুরুষের নাম পড়িয়াছি তাহাদের কীর্তিকলাপ মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাইয়াছি। কিন্তু ফল কি হইয়াছে? কোনক্রমে একটা সাধারণ মার্চেণ্ট আপিসে কেরানী মাত্র হইয়াছি। একজন বড়লোকের ছেলেকে ইতিহাস পড়াই. বিনিময়ে তাহার বাড়িতে থাকিতে পাই। তাহাদের আস্তাবলের পাশে একটা ঘর আছে, সেইটাই আমার বাসস্থান। বড়লোকটি খুবই ধনী। ঘোড়া রাখিয়াছেন রেস খেলিবার জন্য। মাঝে মাঝে পোলোও খেলেন। ঘোড়ার মলমূত্রের গন্ধ, হ্রেষাধ্বনি, সহিসদের দলাইমলাইয়ের শব্দ, সবই আমার সহিয়া গিয়াছে। বড়লোকের ছেলেটির যখন সময় হয় তখন সে আমাকে ডাকিয়া পাঠায়। আমি পোষা কুকুরের মতো যাই এবং ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করি—আজ কি পড়বে? ছেলেটি সিগারেট টানিতে টানিতে উত্তর দেয়—আজ কয়েকটা ইমপর্টাণ্ট কোশ্চেনের ‘আনসার’ লিখে দিন। এবার শুনছি আওরাংজীব থেকে কোশ্চেন দেবে। ইহাই আমার কাজ। হঠাৎ একদিন মনে হইল এই হীনতাপঙ্ক হইতে কি উদ্ধার নাই? যে গোপালদেব, ধর্মপাল, দেবপাল, শশাঙ্ক, শিবাজী, রাণা প্রতাপ সিংহের কথা ইতিহাসে পড়িয়াছি তাঁহাদের মহিমা তাঁহাদের শৌর্যবীর্য কি আমার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে না? শার্লামেন, নেপোলিয়ন, আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট—এলোমেলো অনেকের কথাই মনে হইতে লাগিল। ইহাদের কথা পড়িয়াছিলাম শুধু কি পরীক্ষা পাশ করিবার জন্য, কেরানীগিরি করিবার জন্য? ওই বড়লোকের ছেলেটার নিকট জুজু হইয়া থাকিবার জন্য? মনে ধিক্কার জাগিত, কিন্তু কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতাম না। হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে পথ মিলিয়া গেল। পথের ধারেই ধুলার উপর গুরুর দেখা পাইলাম। তাহাকে ‘গুরু’ বলিতেছি বটে, কিন্তু তাহার কিছুমাত্র গুরুত্ব ছিল না। শ্যামবর্ণের কিশোর বালক একটি। পথের ধারে আপন মনে লাট্টু ঘুরাইতেছিল। আমি আপিস যাইতেছিলাম, কিন্তু ছেলেটিকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। অমন কমনীয়কান্তি প্রাণরসে টলমল কিশোর মূর্তি আমি আগে কখনও দেখি নাই। মনে হইল শহরের রাস্তার ধারে একটি সতেজ শিশু শালগাছ যেন কিশোর বালকের রূপ ধরিয়াছে। বিস্মিত হইয়া তাহাকে দেখিতেছিলাম, ছেলেটির কথায় আমার চমক ভাঙিল।

“কি দেখছেন—”

“তোমাকেই দেখছি। তোমার বাড়ি কোথা।”

“ওসব বৃত্তান্ত জেনে লাভ কি। আপিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে যে। স্যানডার্স সাহেবের ধমকানির ভয় নেই?”

শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। আমার আপিসের বড় সাহেবের নাম যে স্যানডার্স

তাহা এ জানিল কি করিয়া। আমি যে চাকরি করি তাহাও তো ইহার জানিবার কথা নয়।

"আমি যে আপিস যাচ্ছি তা জানলে কি করে।"

"তোমাকে দেখেই। কেরানী ছাড়া ওরকম কুকুর-মার্কা চেহারা আর তো কারো হয় না।"

ছেলেটি লাট্টু ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া যাইতেছিল। আমি তাহাকে ডাকিলাম।

"শোন। তুমি আমাকে অপমান করলে কেন!"

"কুকুরকে কুকুর বললে কি অপমান করা হয়?"

"কানাকে কানা বলা কি ভদ্রতা?"

"তুমি কানাও, তোমাকে কিন্তু সে কথা বলিনি।"

ক্রমশই অবাক হইতেছিলাম। কে এই ছোকরা। অথচ ইহার উপর রাগও তো হইতেছে না। চোখে মুখে হাসির বিদ্যুৎ, সর্বাঙ্গে নবীনতার আভাস, একটা প্রাণবন্ত চঞ্চলতা যেন মূর্তি ধরিয়াছে। এ কে? কোথা হইতে আসিল?

"আমাদের আপিসের বড় সাহেবের নাম যে স্যানডার্স তা তুমি জানলে কি করে?"

মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল ছোকরা।

"তোমার বাবার নাম বলব? হরিপদ সামন্ত। মায়ের নাম জগদ্ধাত্রী। আর একটা কথা বলব? তোমার কপালে রাজতিলক আছে। তুমি যদি তপস্যা কর রাজা হতে পারবে!"

"আমি?"

"হ্যাঁ তুমি।"

"রাজা হতে পারব?"

"পারবে। রাজা মানে হাতী-ঘোড়া, মোটর-এরোপ্লেন, জমিদারি, ব্যাঙ্কের টাকা, এসব নয়—রাজা মানে সত্যিকারের রাজা!"

"সত্যিকারের রাজা, মানে?"

"পরের ভালো করাই যার জীবনের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যে তন্ময় হয়ে নিজেকে যে ভুলে থাকে এবং সেই জন্যেই যে সবার উপরে উঠে যায়, কোন অভাব বোধ থাকে না—সেই রাজা। মাথায় উষ্ণীষ পরে দামী পোষাক পরিচ্ছদ পরে তাঞ্জামে চড়ে যারা বেড়ায় তারা রাজা নয়, দাস। দাসানুদাস। রাজা হতে হলে তপস্যা করতে হবে। এদেশে সন্ন্যাসীদের নামই মহারাজ। ইচ্ছে করলে তুমি রাজা হতে পারবে। কিন্তু তার জন্যে তোমার আগ্রহ থাকা চাই, তার জন্যে অহোরাত্র তপস্যা করা চাই। তা কি তুমি পারবে? পারবে না। বাঙালীর ছেলেরা তপস্যা করতে ভুলে গেছে—"

মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। তারপর বলিল—"আমি এবার যাই—"

"শোনো—"

"না, এখন তুমি আপিস যাও। সন্ধের পর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ধারে মাঠে বসে আমি আজ বাঁশী বাজাব। যদি আলাপ করতে চাও, সেইখানে এসো—রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপিস যাওয়ার মুখে আলাপ জমবে না। চললুম—"

"শোন, কোথায় থাক তুমি—!"

আবার মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"যদি বলি আকাশে বিশ্বাস করবে ?"

আমাকে আর কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া হঠাৎ সে পাশের গলিটার মধ্যে অন্তর্ধান করিল।

সেদিন আপিস হইতে যখন বাহির হইলাম তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। যে চায়ের দোকানটায় রোজ বসিয়া চা খাই, সেইখানেই ঢুকিলাম। খান দুই টোস্ট এবং এক কাপ চা খাইয়া যখন বাহির হইলাম তখনও অন্ধকার হয় নাই। অন্য দিন হইলে বাড়ি ফিরিয়া যাইতাম। কিন্তু সেদিন গেলাম না। গড়ের মাঠে ঢুকিয়া পড়িলাম। গড়ের মাঠ আমার আপিসের কাছেই। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে অনেকক্ষণ ঘোরা-ফেরা করিলাম। কোথায় সে ছোকরা ? বাঁশীর শব্দও শুনিতে পাইলাম না। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম শেষে। একটা খালি বেঞ্চ পাইয়া তাহার উপরই বসিয়া পড়িলাম। চমৎকার দখিনা হাওয়া বহিতেছিল। সম্ভবত বসিয়া বসিয়াই একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙিল তখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ বাঁশী শুনিতে পাইলাম। উঠিয়া পড়িলাম। সুর লক্ষ্য করিয়া অনেকক্ষণ অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। কিন্তু বংশীবাদককে দেখিতে পাইলাম না। কিছুক্ষণ পরে সহসা একটা অদ্ভুত জিনিস দেখিতে পাইলাম। নজরে পড়িল একটা গাছের তলায় সবুজ আলোকপুঞ্জ বিকীর্ণ হইতেছে, ভাবিলাম জোনাকীর দল নাকি, —আগাইয়া গেলাম সেইদিকে। দেখি সেই ছোকরা বসিয়া অছে। আমি যাইবামাত্র সবুজ আলো নিবিয়া গেল।

"ও তুমি এসে গেছ ? বস।"

"এইখানে একটা সবুজ আলো দেখলাম যেন।"

"ও কিছু নয়, বস।"

হঠাৎ মনে হইল ছোকরা আমার চেয়ে তো বয়সে অনেক ছোট কিন্তু অসংকোচে আমাকে তুমি বলিতেছে। একটু বিরক্ত হইলাম।

"তুমি ভাবছ আমি বুঝি তোমার চেয়ে বয়সে ছোট তা নয়। আমার অনেক বয়স।"

একটু অবাক হইয়া গেলাম। আবার আমার মনের কথা টের পাইল কি করিয়া !

"কত বয়স তোমার—!"

"অনেক। গাছ পাথর নেই। আমি বুধ—"

"বুধ ? তার মানে ?"

"আমি বুধ গ্রহ। যার স্তোত্র তোমরা পাঠ কর এই শ্লোকটি পড়ে—প্রিয়ঙ্গু-কলিকাশ্যাম রূপেণাপ্রতিমং বুধম। সৌম্যং সর্বগুণোপেতং ত্বং বুধং প্রণমাম্যহম্। প্রিয়ঙ্গু মানে জান ?"

কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

"প্রিয়ঙ্গু মানে জান ?"

"না।"

"প্রিয়ঙ্গু মানে শ্যামালতা। প্রিয়ঙ্গুকলিকার মতো সবুজ রং বুধের। বুধ চিরকিশোর। চিরশ্যাম। উন্মুখ যৌবনের প্রতীক সে। সামাজিক জীবনে আমার নাম ছিল ফেলারাম। যখন বুড়ো হয়ে গেলাম শরীর অসমর্থ হয়ে পড়ল—স্ত্রী পুত্র

কন্যারা সব মরে গেল—তখন একদিন তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়লাম। মানে, মরব বলেই বেরুলাম। হরিদ্বারে গিয়ে সাক্ষাৎ পেলাম এক মহাপুরুষের। তিনি বললেন—মরবে কেন! তুমি বুধের আরাধনা কর, যৌবন ফিরে পাবে। তোমার তপস্যা যদি নিশ্ছিদ্র হয় স্বয়ং বুধই এসে হাজির হবেন তোমার শরীরে। আমি অনেকদিন হিমালয়ে কাটিয়েছি বুধের আরাধনা করে। অনেক দিন। প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যাম রূপেণাপ্রতিমং বুধম্। সৌম্যং সর্বগুণোপেতং ত্বং বুধং প্রণমাম্যহম্। এই মন্ত্র জপ করেছি দিবারাত্রি। এক আধদিন নয়—অনেকদিন। অনেকদিন পরে হঠাৎ গভীর রাত্রে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। হিমালয়ের একটা অন্ধকার গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম সেদিন। কাছেপিঠে কেউ ছিল না। আমি গুহায় শুয়ে শুয়ে বুধেরই ধ্যান করছিলাম, শীতে ক্ষুধায় ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম, ধ্যান কিন্তু অবিচলিত ছিল। বস্তুত আমার দুঃখের অসীম সমুদ্রে ওইটেকেই ভেলা করে আমি আঁকড়ে ধরেছিলাম। সেই গুহায় হঠাৎ সেদিন আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। কিন্তু অজ্ঞান হয়েও আমি ধ্যানের সূত্রটি ছাড়িনি—এক চিরকিশোর শ্যামকান্তি দেবতা আমার চোখের সম্মুখে অহরহ দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু তবু মনে হয় আমি অজ্ঞানই হয়ে গিয়েছিলাম, হিমালয়ের শীত বা নিদারুণ ক্ষুধা আর আমি অনুভব করতে পারছিলাম না। আমার দেহটা যেন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সীমানা পার হয়ে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ জ্ঞান হল। দেখলাম আমার জীর্ণ জরাগ্রস্ত দেহটা গুহার একধারে পড়ে আছে। আমি তাহলে কে? যে আমি আমার শবদেহটাকে দেখছি সে কি অন্য লোক? আমার বিস্ময় কিন্তু বেশীক্ষণ রইল না। অপরিসীম আনন্দে সমস্ত মন ভরে গেল পরমুহূর্তে, সদ্যজাগ্রত যৌবনের মহিমা অনুভব করলাম সর্বদেহ দিয়ে। তারপরই লক্ষ্য করলাম আমার দেহ থেকে সবুজাভ আলো বেরুচ্ছে একটা। ভয় পেয়ে গেলাম প্রথমে। তারপর লাফিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গুহা থেকে। দেখলাম অন্ধকার ফিকে হয়ে গেছে। উষার নবারুণ কিরণের আভাস দেখা যাচ্ছে পূর্বদিগন্তে। কাছেই একটা পাহাড়ী ঝরণা ছিল। সেইটের ধারে গিয়ে সেই ঝরণায় নিজের চেহারা দেখলাম। দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম—অবিকল বুধের চেহারা—প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যাম সেই সৌম্য কিশোরের হাসিমাখা মুখখানা আমার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল সেই কলস্বরা স্বচ্ছ জলের ভিতর থেকে। নিজের প্রতিচ্ছবির দিকেই চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর উপলব্ধি করলাম চন্দ্র এবং বৃহস্পতি-পত্নী তারার প্রণয়সঞ্জাত যে শিশু চির-নবীনের প্রতীক হ'য়ে গ্রহমণ্ডলীতে স্থান পেয়েছে, যার পত্নী ইলা—সহসা মনে হল ইলা কোথায় আছে খুঁজে বার করতে হবে। নিশ্চয়ই কোথাও আছে সে। তার পুত্র পুরুরবা আর পুত্রবধূ উর্বশীর কথা মনে আছে কি এখনও? উর্বশীকে তো রোজ উষা-সন্ধ্যায় আকাশে দেখতে পায়, পুরুরবা কোথায়—। তখনই উঠে পড়লাম ঝরণার পাশ থেকে, ইলা আর পুরুরবাকে খোঁজবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম। এর মধ্যে কোন মোহ নেই, শুধু কৌতুক, শুধু কৌতূহল। শত শত জন্মের আবর্তে পুরুরবা কোথায় তলিয়ে গিয়ে কোনরূপে এখন অবস্থান করছে তাই দেখার জন্য আমি নানাস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আজ কলকাতা শহরের রাস্তায় তোমাকে দেখে চিনলুম—তুমিই সেই হতভাগ্য পুরুরবা যে একটা নারীর প্রেমের মোহে নিজের পৌরুষকে বারবার অবনত করেছো। এখনও করছ। এখনও মালিনী নামে যে মেয়েটার স্বপ্নে তোমার দৃষ্টি

আছন্ন, তাকে তুমি পাবে না। সে বড়লোকের মেয়ে, পুরূরবার সঙ্গে যেমন সর্বদা দুটো ভেড়া থাকত, এর সঙ্গে সর্বদা তেমনি দুটো দারোয়ান আছে। উর্বশীর নানারকম শর্ত ছিল এরও নানারকম শর্ত আছে যা পালন করবার সামর্থ্য তোমার নেই। তবে তোমার ললাটে একটা অদৃশ্য রাজতিলক দেখেছি। তুমি যদি তপস্যা কর রাজা হ'তে পারবে। কোন রাজাকে তোমার পছন্দ সবচেয়ে বেশী—"

আমি যাহা শুনিতেছিলাম তাহা অবিশ্বাস্য, তবু বিশ্বাস করিতে হইতেছিল, কারণ প্রত্যক্ষকে ওড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু বিস্ময়ে এত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না।

"কোন্ রাজাকে তোমার বেশী পছন্দ ?"

"অষ্টম শতাব্দীর রাজা গোপালদেবকে--যিনি মাৎস্যন্যায়ের যুগে বাংলায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।"

"বেশ, তাঁরই তপস্যা কর—"

"তপস্যা কি করে করতে হয় আমি জানি না।"

"নিবিষ্টচিত্তে ধ্যান করার নামই তপস্যা—"

"চাকরি করতে করতে তা কি করা সম্ভব ?"

"খুব সম্ভব। চাকরি তো করে বাইরের মন। ভিতরের মন অন্তরতম সত্তা—সেই করে তপস্যা। তোমার নিষ্ঠা যদি খাঁটি হয়, আগ্রহ যদি প্রবল হয় তাহলে সে মনকে কেউ বিচলিত করতে পারবে না—"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

সহসা সে প্রশ্ন করিল—"তুমি বই লিখতে পারবে ?"

"ছেলেবেলায় লেখার অভ্যাস ছিল। কবিতা-গল্প ছাত্রজীবনে লিখেছি। ছাপাও হয়েছে দু'একটা কাগজে—"

"গোপালদেবকে নিয়ে বইই লেখ তুমি তাহলে একটা। বই লিখতে বসলে তার দিকে একাগ্র হবে তোমার মন, সর্বদা ভাবতে হবে তার কথা—সেইটেই হবে তোমার তপস্যার শুরু। তারপর ক্রমশ গোপালদেব তোমার মধ্যেই আবির্ভূত হবেন।"

"কিন্তু গোপালদেবের ইতিহাস তো তেমন কিছু জানা নেই—"

"ইতিহাস নিয়ে কি হবে। তুমি তাকে সৃষ্টি কর। তোমার সৃষ্টিতেই জীবন্ত হয়ে উঠবেন তিনি। ভগবানের কোন ইতিহাস আছে ? কিন্তু কোটি কোটি লোক কোটি কোটি রূপে সৃষ্টি করেছে তাঁকে —আর সব সৃষ্টিই জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাদের স্রষ্টার চোখে। বুদ্ধকে আমি কখনও দেখিনি, কিন্তু ওই একটি শ্লোক অবলম্বন করে আমি মনে মনে তাঁকে সৃষ্টি করেছি। তাই তিনি মূর্ত হয়েছেন আমার দেহে মনে। গোপালদেবকে তপস্যার আগ্রহ দিয়ে তুমিও যদি সৃষ্টি করতে পার তাহলে তিনিও জীবন্ত হয়ে উঠবেন তোমার মধ্যে—"

"আমি পারব ?"

"সে কথা নিজেকেই জিজ্ঞেস কর তুমি। স্থবির ফেলারাম কানুনগো যদি প্রিয়ঙ্গুকলিকা-শ্যাম বুদ্ধে রূপান্তরিত হতে পারে তাহলে ফকিরচাঁদই বা গোপালদেব হতে পারবে না কেন যদি তার আগ্রহ একনিষ্ঠ হয়। এবার আমি উঠি—"

"কোথা যাবে—"

"ইলাকে খুঁজে পাইনি এখনও। তাকে খুঁজে বার করতে হবে—"

"ইলা?—"

"হ্যাঁ, যে ইলা এককালে তোমার মা ছিল। জানি না এখন সে কোথা—"

হঠাৎ অন্তর্ধান করিল।

আমি গড়ের মাঠে একা বসিয়া রহিলাম। চারিদিকে নানারঙের আলো জ্বলিতেছে. কিন্তু সেই সবুজাভ প্রাণ-দীপ্ত আলোটি আর দেখিতে পাইলাম না।

আমি জানি এ গল্প অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করিবেন না। বিশ্বাস করিবার ক্ষমতাও একটা বিশেষ ক্ষমতা যাহা এ যুগে আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমরা এখন টাকা ছাড়া আর কিছুতে বিশ্বাস করি না। অর্থের ক্রয়-ক্ষমতাকেই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ক্ষমতা বলিয়া বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি আজকাল আমাদের মর্মে মর্মে শিকড় গাড়িয়াছে। অন্য কোন প্রকার ক্ষমতাকে—বিশেষত আধ্যাত্মিক বা দৈবিক ক্ষমতাকে বুজরুকি বলিয়া ব্যঙ্গ করিবার বুদ্ধি আমরা তথা-কথিত বিজ্ঞানের কাছে লাভ করিয়াছি। আমার নিজেরই মাঝে মাঝে মনে হয় ওই অলৌকিক ঘটনাটা বোধহয় উন্মাদের কল্পনা। হয়তো আমি দিনকয়েকের জন্য উন্মাদ হইয়াছিলাম। একজন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন, "এরকম সাময়িক পাগলামি হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। সেই পাগলামির ঝোঁকে অনেক রকম আজগুবি 'ভিশন'ও অনেকে দেখেন। আপনি হয়তো তাই দেখেছেন। আপনার অবদমিত কল্পনা হয়তো ছাড়া পেয়েছিল খানিকক্ষণের জন্য।"

অন্তরের অন্তস্তলে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আমি পাগল নহি। যাহা দেখিয়াছিলাম যাহা শুনিয়াছিলাম সব সত্য, উন্মাদের স্বপ্ন নহে। তাই বুধের আদেশ অমান্য করি নাই। গোপালদেবকে লইয়া উপন্যাস লিখিতে শুরু করিয়াছি। আমার গল্পের নায়ক যে গোপালদেব, তিনি প্রৌঢ়, বিদ্বান, তথাকথিত আধুনিকতার অনেক ঊর্ধ্বে বাস করেন। তাঁহারই কল্পনায় ইতিহাসের গোপালদেব জীবন্ত হইবেন, এই আমার আশা।

"গোপালদেবের ত্রিতল মহলে তাঁহার একমাত্র বন্ধু তাঁহার পুরাতন ভৃত্য মহাদেব। গোপালদেব তাহাকে মহান বলিয়া ডাকেন। তাহার প্রধান গুণ সে নীরব। কখন আসে কখন নীরবে সমস্ত কাজ পরিপাটি করিয়া নিষ্পন্ন করে গোপালদেব জানিতেও পারে না। মহাদেব প্রত্যহ পোস্টাফিসে গিয়া গোপালদেবের ডাকও লইয়া আসে। খামগুলির ধার নিপুণভাবে কাঁচি দিয়া কাটিয়া চিঠিগুলি প্রত্যহ তাঁহাকে আনিয়া দিয়া নীরবে চলিয়া যায়। গোপালবাবুকে খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিতে হয় না। তাঁহার অনেক চিঠি আসে রোজ। দেশের এবং বিদেশের অনেক বিদ্বান লোকেরা তাঁহাকে চিঠি লেখেন। এই চিঠির জগৎও তাঁহার আলাদা একটা নিজের জগৎ। সে জগতে বাহিরের কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। নিজেও তিনি সে জগতের অনেককে চেনেন না। পত্রের মাধ্যমেই আলাপ। কোন কোন ক্ষেত্রে সে আলাপ গভীর আত্মীয়তাতেও পরিণত হইয়াছে। মহান যখন তাঁহার পাশে ডাক রাখিয়া যায় তখন মনে মনে তিনি একটু চঞ্চল হইয়া ওঠেন। কিন্তু বাহিরে সে চঞ্চলতা প্রকাশ পায় না।

বরং তিনি এমন একটা ভাব দেখান যেন চিঠিগুলো তিনি দেখিতে পান নাই। মহানও কোন কথা না বলিয়া নীরবে চলিয়া যায়।

তাঁহার এই ত্রিতল সীমাবদ্ধ-জীবনে এই ডাক সত্যই বাহিরের ডাক। ইহাই একমাত্র ডাক যাহার জন্য তিনি মনে মনে আকুল হইয়া বসিয়া থাকেন। আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহার বিশেষ খবর লয় না। প্রয়োজন হইলে তাহারা গৃহিণীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে। গৃহিণী তাঁহার নিকট দুই একবার আসিয়া তাঁহারই আত্মীয়স্বজনের হইয়া দরবার করিয়াছেন। কখনও কাহারও ওঁছা ছেলেকে কলেজে ভর্তি করাইবার জন্য প্রিন্সিপালের নিকট চিঠি লিখিবার অনুরোধ করিয়াছেন, কখনও কোনও ফেল-করা ছেলেকে কোন আপিসে ঢুকাইয়া দিবার জন্য সুপারিশ পত্র লইয়াছেন, কাহারও কালো মূর্খ মেয়েকে কোন বিদ্বান সৎ-পাত্রের হস্তে সমর্পণ করাইবার জন্য তাঁহার বন্ধুকে (পাত্রের পিতা) প্রভাবিত করাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তাঁহার এই ধরনেরই সম্পর্ক। তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণার বা সাহিত্যিক প্রতিভার খবর তাহারা কেহ রাখে না। তবে বিনা পয়সায় দুই-একখানা বই পাইলে সেগুলি বগলদাবা করিয়া লইয়া যাইতে তাহাদের আপত্তি নাই। লইয়া গিয়া সেগুলি সত্যই তাহারা যদি পড়িত তিনি খুশী হইতেন। কিন্তু তিনি নিঃসংশয় হইয়াছেন বই তাহারা পড়ে না। তাহারা যে বই পাইয়াছে এইটা সকলের কাছে আস্ফালন করিয়াই তাহাদের সুখ। সুতরাং প্রত্যহ ডাকের জন্যই তিনি মনে মনে উন্মুখ হইয়া থাকেন। কারণ, এ ডাক সেই বহির্জগতের ডাক, যেখানে তাঁহার সমানধর্মা নর-নারীরা বাস করেন, যেখানে তাঁহার জীবন-ব্যাপী সাধনার নিরপেক্ষ আলোচনা কৃতবিদ্য রসিক চিত্তের কষ্টি-পাথরে নির্ধারিত হয়—এক কথায় যেখানে তাঁহার মনের মানুষরা বাস্তব-অথচ-অবাস্তব রূপকথালোক সৃজন করিয়াছেন—সেই অজানা বহির্জগতের সংস্পর্শ লাভ করিবার জন্য মনে মনে তিনি অপেক্ষা করিয়া থাকেন প্রত্যহ। তাঁহার মনে এই উন্মুখতার সহিত একটা অস্বস্তির ধারাও অবশ্য নিত্য বহমান। অস্বস্তির কারণ তিনি বুঝিয়াছেন, বর্তমানের সহিত তিনি বেমানান। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা যে স্রোতে মহানন্দে ভাসিয়া চলিয়াছে সে পঙ্কিল স্রোতে তিনি নামিতে পারিতেছেন না। তীরে দাঁড়াইয়া তিনি কেবল অস্বস্তি ভোগ করিতেছেন। স্রোতটা কতটা পঙ্কিল তাহাও তাঁহার জানা নাই। এইটুকু শুধু জানেন তীরে দাঁড়াইয়া দূর হইতে যাহা দেখিতেছেন মোটেই তাহা স্বচ্ছ-ধারা নহে। এ অবস্থায় কি করিবেন তাহাও তাঁহার মাথায় আসিতেছিল না, তিনি মনে মনে কণ্টকশয্যায় শয়ন করিয়া কেবল যন্ত্রণাভোগই করিতেছিলেন।

এই সময় একদিন বিপর্যয়টি ঘটিল। মহান সেদিনকার ডাক দিয়া গিয়াছিল। গোপালদেব একে একে সেগুলি খুলিয়া পড়িতেছিলেন। একটি অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত চিঠি পাইয়া আনন্দের সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করিয়াছিলেন তিনি। পত্রটি লিখিয়াছিলেন একজন অশ্বব্যবসায়ী। যদিও তিনি অশ্বব্যবসায়ী কিন্তু তাঁহার চিঠির প্যাডে তাঁহার ছাপা নামের শেষে যে ডিগ্রীগুলি ছিল সেগুলি অক্সফোর্ডের এবং হার্ভার্ডের। কিছুকাল পূর্বে গোপালদেব হিস্টোরিক্যাল হর্সেস (Historical Horses) নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন আমেরিকার কোনও কাগজে। প্রবন্ধটিতে অনেক ঐতিহাসিক ঘোড়ার নাম ও বিবরণ ছিল। যে সব ঘোড়ার নাম

ইতিহাসে পাইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম তো ছিলই, আরও ছিল নানা যুগের নানারকম ঐতিহাসিক উত্থান-পতনের সঙ্গে ঘোড়ার সম্বন্ধের মনোরম বিবরণ। অশ্ব-ব্যবসায়ী ওই ইরাণী ভদ্রলোক প্রবন্ধটি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং গোপালদেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিজ্ঞাপন-পত্রিকা 'দি ইকোয়েস্ট্রিয়ান' (The Equestrian) কাগজে যদি উক্ত প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিবার অনুমতি দেন তাহা হইলে তিনি অতিশয় বাধিত হইবেন। ইহার জন্য তিনি দক্ষিণাও দিতে প্রস্তুত। গোপালদেব সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে পত্র লিখিয়া দিলেন—'আপনি প্রবন্ধটি আপনার পত্রিকায় ছাপাইতে পারেন আমার আপত্তি নাই। দক্ষিণা কিছু দিতে হইবে না। যৌবনকালে আমার ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস ছিল। ঘোড়াও ছিল একটা। খুব ভালোবাসিতাম তাহাকে। হঠাৎ একদিন সেটা একটা মোটরের সহিত ধাক্কা খাইয়া মারা গেল। সহিস সেটাকে মাঠে লইয়া যাইতেছিল। তাহার পর আর ঘোড়া কিনি নাই। মনে হইয়াছিল মোটরের যুগে ঘোড়া অচল। কিন্তু এখনও আমার ঘোড়ার জন্য মন কেমন করে। এখনও যদি ঘোড়া পাই, চড়িয়া বেড়াইতে পারি। কিন্তু ঘোড়ার বাজার কাছে-পিঠে কোথাও নাই, আগে শোনপুর মেলায় যাইতাম, সেখান হইতেই ওই ঘোড়াটা কিনি। এখন লেখাপড়া লইয়া ব্যস্ত থাকি, কোথাও আর যাওয়া হয় না। আপনি যদি আমাকে একটা ভালো ঘোড়া দিতে পারেন, কিনিতে পারি। আমার পুরানো আস্তাবলটা এখনও আছে ......'। উচ্ছ্বসিত আনন্দে লম্বা চিঠি লিখিয়া ফেলিলেন একটা। তাহার পর অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। চিঠি পড়িয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন। তাহার পর চিঠিটা এবং উত্তরটা বারবার পড়েন। অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি উপভোগ করেন প্রত্যেকটি চিঠি।

দ্বিতীয় চিঠিখানি খুলিয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চিঠির প্রথম লাইনটার দিকেই কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিলেন তিনি। 'মাই ডিয়ার ফাদার—'। তাঁহার পুত্র প্রবাল তাঁহাকে ইংরেজিতে চিঠি লিখিয়াছে। একই বাড়িতে থাকিয়া ইংরেজিতে চিঠি লিখিবার কি এমন দরকার পড়িল। ইংরেজিতেই বা লিখিয়াছে কেন! বাঙালী পুত্র তাহার বাবাকে বাংলাতে পত্র লিখিবে এইটাই তো প্রত্যাশিত। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত, তাহার পর পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বানান ভুলে এবং ভাষার ভুলে পরিপূর্ণ চিঠিখানি। প্রবাল উপর্যুপরি তিনবার বি-এ ফেল করিয়াছে। এখন কোন একটা হোটেলে চাকরি করিতেছে। গৃহিণী তাঁহাকে আসিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাকে যদি তিনি বিলাতে পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে হয়তো সে উন্নতির শিখরে আরোহণ করিবার সিঁড়ি পাইবে, কারণ এদেশের স্কুল কলেজে ভালো পড়া হয় না, এখানকার মাস্টাররাও হিংসুটে, গোপালদেব সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাব ঈর্ষা-কাতর, সেই জন্য তাঁহার ছেলেকে তাহারা পাশ করিতে দিবে না। বলা বাহুল্য, গোপালদেব গৃহিণীকে আমোল দেন নাই। বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশের যাঁহারা গৌরব, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই বিলাত যান নাই। আমাদের পুত্রটি অপদার্থ, তাহার জন্য বিলাপ কর, তাহার পিছনে আর অর্থব্যয় করিও না। পত্রটি পড়িতে পড়িতে গোপালদেবের মুখ গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর হইতে লাগিল। প্রবাল যাহা লিখিয়াছে তাহা বাংলায় অনুবাদ করিলে এই দাঁড়ায়—

আমার প্রিয় পিতা,

আপনাকে আমি চিনি না, আপনিও আমাকে চেনেন না। দূর থেকে শুধু এইটুকু জেনেছি আপনি বিদ্বান এবং যশস্বী লোক। আপনার বিদ্যা-বুদ্ধির খ্যাতি, আপনার ধনের খ্যাতি, সকলেই জানে, আমিও জানি। এ-ও স্বীকার করব আমি অর্থাভাবে কোন দিন কষ্ট পাইনি। কিন্তু আমি আপনাকে চিনি না। আপনি আপনার মহিমা নিয়ে এমনি সু-উচ্চে বাস করেন যে আমি আপনার নাগাল পাই না। আপনিও আমাকে চেনেন কি? আপনি জানেন আমি একটা বখাটে ছেলে, কু-সঙ্গে পড়ে' উচ্ছন্নে গেছি। এ কথা মিথ্যা নয়। সত্যিই আমি খারাপ ছেলে। এমন সব কাজ করি যা আপনাদের নীতির মাপকাঠিতে গর্হিত কাজ। সিগারেট খাই, মদও খাই। বিলাসিতার দিকে লোভ আছে, বিলাসিতার উপকরণও সংগ্রহ করেছি অনেক। সবই অবশ্য হয়েছে আপনার টাকায়। মায়ের কাছেই পেয়েছি সে টাকা। আমি যে আপনার পুত্র নামের অযোগ্য তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। আমার যারা সঙ্গী-সঙ্গিনী তারাও আপনার ওই নীতির মাপকাঠিতে সবাই খারাপ। তারা পড়াশোনা করে না, হই-হাল্লা করে কলেজ পোড়ায়, মাস্টার ঠ্যাঙায়, সভা করে, শোভাযাত্রা করে, পুলিশের ব্যাটন খায় আর কাঁদুনে গ্যাসে চোখের জল ফেলে সকলের নিন্দাভাজন হয়। আমিও ওদের দলে। আপনি আশা করি শুনেছেন আমি এখন একটা বড় হোটেলে কেরানীর কাজ করি। মাইনে দু'শ টাকা। একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে আপনার খাতিরেই ওই হোটেলে আমার চাকরিটা হয়েছে। হোটেলের মালিক আপনার একজন ভক্ত। তিনিও বেশ বিদ্বান লোক। আমি আপনার ছেলে শুনেই আমাকে বাহাল করে নিলেন। আমার দৈনন্দিন নিত্য খরচের জন্য যে টাকার প্রয়োজন তা রোজ রোজ মায়ের কাছে চাইতে আমার লজ্জা করত। তাই একটা চাকরির চেষ্টা করছিলাম, দৈবাৎ পেয়ে গিয়ে আমার আর্থিক সমস্যা অনেকটা মিটেছে বটে কিন্তু আর একটি সমস্যায় আমি জড়িয়ে পড়েছি। এই হোটেলেই আলতা নামে একটি মেয়ে টাইপিস্টের কাজ করে। মেয়েটি শিডিউলড কাস্টের মেয়ে। শিডিউলড কাস্ট বললে একটু ভালো শোনায়, কিন্তু আসলে মেয়েটি বাগ্দীর মেয়ে। কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়েস্থের ঘরেও অমন সুশ্রী মেয়ে দুর্লভ। তাকে আমি দিন সাতেক আগে রেজেষ্ট্রি করে আইনত বিয়ে করেছি। মেয়েটির গুণ-বর্ণনা আমি করব না, কারণ সেটা আমার মুখে শোভা পাবে না। তাকে ভালো লেগেছে বলেই তাকে বিয়ে করেছি। মাকে জানিয়ে বিয়ে করেছি। তিনি প্রথমে মত দেন নি, কিন্তু তাঁর গুরুদেব যখন বললেন, মানুষের গুণ আর কর্ম দিয়েই তার জাত-বিচার হয়, কুল আর বংশ দিয়ে নয়--(তাঁর মতে আমি আর আলতা এক জাতের) তখন মা মত দিলেন। আপনার কাছে অনুমতি চাইবার সাহস হয়নি আমার। তবু আপনাকে পত্র লিখছি আর একটি কারণে। দিনচারেক পরে আমাদের বিবাহ উপলক্ষে হোটেলে একটি ভোজ হবে। আড়াইশো লোক খাবে। খরচ পড়বে আড়াই হাজার টাকা। মায়ের কাছে টাকাটা চাইলাম। তাঁর কাছে টাকা চেয়ে কখনও বিফলমনোরথ হই নি। কিন্তু মা এবার বললেন—দিতে পারবে না। নীলার বিয়েতে যৌতুক দেবেন বলে একটা হীরের হার করতে দিয়েছেন, তাইতেই তাঁর সঞ্চিত সব টাকা ফুরিয়ে গেছে, কিছু ধারও হয়েছে নাকি। আগামী মাসে মগনলাল নামে আপনার একটি ছাত্রের

সঙ্গে নীলার বিয়ে হবে সব ঠিক হয়ে গেছে। এ খবর আপনি সম্ভবত জানেন না। না জানাই স্বাভাবিক। আপনি এত ঊর্ধ্বে বাস করেন যে কেউ আপনার নাগালই পায় না। আপনি মাসের প্রথমেই একটা চেক লিখে মহানের হাত দিয়ে সেটা মাকে পাঠিয়ে দেন সংসার খরচের জন্য। সংসারের আর কোনও দায়িত্ব নেবার অবসর নেই আপনার। আপনাকে নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান-চর্চা করবার সুযোগও আমরা দিয়েছি, কেউ কখনও আপনার ধারে কাছেও যাইনি। অনেকদিন আগে, যখন আমি ছোট ছিলাম, যখন আপনি ঘোড়া চড়তেন, যখন আমাকেও আপনার সামনে ঘোড়ায় চড়িয়ে মাঠে নিয়ে যেতেন—সেই সময়ের কথা মাঝে মাঝে স্বপ্নের মতো মনে হয়। তখন আপনার এত খ্যাতি হয় নি, তখন আপনি আমাদের বাবা ছিলেন। তারপর খ্যাতির যে দেওয়াল আপনার চারদিকে আকাশ-চুম্বী হয়ে উঠল তা ডিঙিয়ে আপনার কাছে যাওয়ার আর সামর্থ্য রইল না আমাদের। আপনার টাকার সহায়তায় আমরা নিজেদের মতে নিজেদের স্রোতে ভাসতে লাগলাম। আপনাকে বিরক্ত করবার সাহস হয় নি কোনদিন। আজও হয়তো হত না। আজ কিন্তু একটা বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। মা টাকা দেবে এই আশায় ভোজের আয়োজন করেছি, নিমন্ত্রণ করা হয়ে গেছে, আপনার ছেলে হিসাবে হোটেলে আমার একটা 'প্রেস্টিজ'ও আছে—এখন যদি টাকার অভাবে ভোজটা বন্ধ করে দিতে হয় তাহলে লজ্জার আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না। আলতার কাছেও আমি খেলো হয়ে যাব। আমি কয়েক জায়গায় টাকাটা ধার করবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কোথাও পাইনি। তাই শেষে আপনার কাছে এসেছি। আপনার পক্ষে আড়াই হাজার টাকা দেওয়া কিছু শক্ত নয়। আপনি যদি সম্বন্ধ করে আমার বিয়ে দিতেন তাহলে ওর চেয়ে অনেক বেশী টাকা আপনার খরচ হয়ে যেত। প্রসঙ্গত, আর একটা কথাও বলছি। আপনার ওই টাকা আমাদের পূর্বপুরুষের সঞ্চিত টাকা। তাতে কি আমার একটুও দাবী নেই? তাঁরা বংশপরম্পরায় জমিদার ছিলেন। আপনিও অনেক দিন জমিদার ছিলেন। কিছুদিন আগেই জমিদারিপ্রথা লোপ পেয়েছে। তাতেও শুনেছি কয়েক লক্ষ টাকা পেয়েছেন আপনি। আমি আপনাদের বংশের একমাত্র বংশধর। আমার বিয়েতে আড়াই হাজার টাকা খরচ করে ভোজ দেওয়াটা কি খুবই অসঙ্গত? শুনেছি আপনার বিয়েতে নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। আমার দাবী মাত্র আড়াই হাজার টাকা। সেটা কি আপনি দেবেন না? আমার দাবী যদি না মানতে চান, টাকাটা ঋণস্বরূপই আমাকে দিন। আমি ক্রমশ ওটা শোধ করে দেব। আপনি কাল দুপুরে এই চিঠি পাবেন। কালই বেলা তিনটে নাগাদ আমি আপনার কাছে যাব। আশা করি টাকাটা আমাকে দিয়ে আপনি আমার ও নিজের মান রক্ষা করবেন। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।
ইতি
প্রণত প্রবাল।

চিঠিটা পড়িয়াই গোপালদেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা তাঁহার চোখে মুখে যেন বজ্রগর্ভ মেঘ ঘনাইয়া আসিল। অন্য চিঠিগুলি না পড়িয়া তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় নিজের লাইব্রেরি ঘরে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। দুইটি কথাই তাঁহার মনে তপ্ত শলাকার ন্যায় বিঁধিতেছিল। বান্দীর মেয়ে—আর দাবী—। সহসা তিনি তরবারিটা দেওয়াল হইতে নামাইয়া কোষমুক্ত করিলেন। তাহার পর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার ধার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঘড়িতে টং করিয়া শব্দ হইতেই চোখ

তুলিয়া দেখিলেন—আড়াইটা বাজিল। জীমূতবাহন দেবের তরবারিটা চক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর মাথার উপরে সেটা ঘুরাইলেন কয়েকবার। নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল, রগের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল, চক্ষুর দৃষ্টি হইতে বিচ্ছুরিত হইল অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ।

তিনটা বাজিল। দ্বারপ্রান্তে দময়ন্তী দেখা দিলেন। তাঁহার পিছনে প্রবাল। প্রবালের পরিধানে চোং প্যাণ্ট, গায়ে চকরা-বকরা ছিটের শার্ট। মুখে সুচালো দাড়ি এবং এক জোড়া উদ্ধত গোঁফ। চোখে একটা রঙীন চশমা। গোপালদেবের মনে হইল একটা স্প্যানিশ দস্যু যেন। গোপালদেব প্রবালকে এত সামনাসামনি অনেকদিন দেখেন নাই। এই তাঁহার পুত্র! সুপ্রসিদ্ধ এবং সম্মানিত দেব বংশের বংশধর—বান্দীর মেয়েকে বিবাহ করিয়া হোটেলে উৎসব করিবার জন্য টাকা দাবী করিতে আসিয়াছে! তাঁহার সমস্ত শরীরের রক্ত যেন টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল এখনই বুঝি মাথা ফাটিয়া আগ্নেয়গিরির লাভার মতো রক্তধারা ছুটিয়া বাহির হইবে।

দময়ন্তী আবদার-মাখা নাকিসুরে বলিলেন—"প্রবাল এসেছে। ওর চিঠি বোধহয় পেয়েছ। কি যে ক্ষ্যাপা ছেলে—কি কাণ্ড যে করে। বিপদে যখন পড়ে গেছে তখন আমাদেরই উদ্ধার করতে হবে—"

"চিরকালের মতো উদ্ধার করে দিচ্ছি—"

গোপালদেব তরবারি তুলিয়া তাড়া করিয়া গেলেন। নিমেষের মধ্যে তাঁহার হিতাহিত বুদ্ধি লোপ পাইয়া গেল। প্রবালকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি তলোয়ারটা চালাইয়াছিলেন, কিন্তু দময়ন্তী দুই হাত বাড়াইয়া পুত্রকে রক্ষা করিলেন। কোপটা তাঁহারই কাঁধে পড়িল। তিনি পড়িয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে গোপালদেবও জ্ঞান হারাইলেন।

গোপালদেবের যখন জ্ঞান হইল তখন তিনি দেখিলেন তিনি যে ঘরে আছেন তাহা তাঁহার লাইব্রেরী নহে। সম্ভবত হাসপাতাল। তাঁহার পাশে নার্স-বেশে সজ্জিতা যে মেয়েটি বসিয়াছিল সে তাঁহাকে চোখ খুলিতে দেখিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। গোপালদেব অনুভব করিলেন তিনি যাহা করিবেন বলিয়া তরবারি তুলিয়াছিলেন তাহা করিতে পারেন নাই। তিনি ঠিক করিয়াছিলেন স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলকে খুন করিয়া ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়া পড়িবেন। এতদিন ধরিয়া মনে মনে যে যন্ত্রণা তিনি ভোগ করিতেছিলেন তাহার অবসান হইয়া যাইবে। তাঁহার মেয়ে নীলার চেহারাটা মনে পড়িল। ঠিক যেন একটা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে, ভদ্র অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নয়, অভদ্র অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। তাহার পেট-কাটা জামা, উন্মুক্ত বগল, ঠোঁটের এবং গালের অতি উগ্র প্রসাধন, তাহার অভব্য পোষাক পরিচ্ছদ, স্তনযুগলের চোখে-খোঁচা-দেওয়া উদ্ধত ভঙ্গী, তাহার গণিকা-সুলভ চাহনি এবং গমনভঙ্গী বহুদিন হইতেই তাঁহার আদর্শের মুখে লাথি মারিতেছিল। তিনি সকলকে নিঃশেষ করিয়া মরণের অন্ধকারে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু অনুভব করিলেন, তাহা পারেন নাই।

একটু পরেই সিভিল সার্জন আসিলেন। তিনি পাশের ঘরেই ছিলেন। সিভিল সার্জন সুরেশ মৌলিক গোপালদেবের বাল্যবন্ধু।

"গোপাল, এখন কেমন আছ।"

"আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ কেন।"

"চিকিৎসার জন্যে। কথা বোলো না। একটা ইনজেকশন দিয়ে যাচ্ছি, ঘুমোও খানিকক্ষণ।"

নার্স ইনজেকশন ঠিক করিয়াই আনিয়াছিল। সিভিল সার্জন সেটা দিয়া বলিলেন —"এইবার ঘুমোও।"

"আমার কি হয়েছে।"

"টেমেপোরারি ইনস্যানিটি (temporary insanity), খানিকক্ষণের জন্য মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তোমার। আর কথা নয়। ঘুমোও এবার—"

সিভিল সার্জন চলিয়া গেলেন।

ইনজেকশন দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু ভালো ঘুম হইল না। নানারকম স্বপ্ন, নানারকম চিন্তা, নানারূপ ছায়ামূর্তি আসিয়া তাঁহার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করিতে লাগিল। সকালেই উঠিয়া চীৎকার চেঁচামেচি শুরু করিয়া দিলেন- বাড়ি ফিরিয়া যাইব।

সিভিল সার্জন তাঁহাকে নিজের মোটরে তুলিয়া লইয়া বলিলেন "চল।" সোজা তাঁহাকে লইয়া যেখানে তুলিলেন সেটা গোপালদেবের বাড়ি নয়—পাগলা গারদ।

হঠাৎ লর্ড খুব জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহার পর তাড়া করিয়া গেল। এক ঝাঁক ছোট পাখী একটু দূরে চরিতেছিল। লর্ডের তাড়ায় তাহারা উড়িয়া গেল। কার্তিকের মনে হইল, সম্ভবত মুনিয়ার ঝাঁক। আন্টা তখনও ঘুমাইতেছিল। কার্তিক খাতাটা বন্ধ করিয়া দূরে দিগন্তে চাহিয়া রহিল। সূর্য অস্তাচলগামী। মুনিয়ার ঝাঁক দেখিয়া তাহার একটা কথা মনে পড়িল। বহুদিন আগেকার কথা। ছেলেবেলায় মুনিয়া নামে তাহার একটি সঙ্গিনী ছিল। মুনিয়া পাখীর মতই সে বনে জঙ্গলে বাগানে বাগানে নদীর তীরে পুকুরের পাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইত। কত রকম জিনিস যে সংগ্রহ করিত সে। ঘেঁটু ফুল, মাকাল ফল, আলকুশি লতা, কুকুরশোঁকা গাছ, শ্বেত বেড়েলা, পুনর্ণবা, ঘলঘসে ফুল, ওসব মুনিয়াই তাহাকে চিনাইয়াছিল। তাহার পিঠে বিনুনি ঝুলিত একটা। ফিতা দিয়া বাঁধা নয়, কাপড়ের পাড় দিয়া বাঁধা। তাহার নামও ছিল মুনিয়া, মুখখানিতেও একটা পাখী-পাখী ভাব ছিল। ছোট্ট মুখ, ছোট্ট চোখ দুইটি। ছোট্ট নাকটি, মনে হইত যেন পাখীর ঠোঁট। চোখের দৃষ্টিও ছিল কৌতূহলী, সদা-চঞ্চল। ঠিক পাখীর মতো। খুব ভোরে আসিয়া তাহার মামার বাড়ির সামনের রাস্তাটায় ঘুরঘুর করিত আর মাঝে মাঝে ডান হাতটা মাথার উপর তুলিয়া টুসকি দিতে দিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিত আর মুখে শব্দ করিত টুক টুক টুক। ঠিক পাখীর মত ছিল সে। মাতৃহীন কার্তিকের ছেলেবেলাটা মামার বাড়িতে কাটিয়াছিল। মুনিয়ারই সমবয়সী সে। মুনিয়াকে দেখিলেই সে বাহিরে চলিয়া আসিত। কেহ মানা করিত না। মামার বাড়িতেও সে ছিল গলগ্রহ। সে বাহিরে চলিয়া গেলেই যেন তাহার মামী স্বস্তি বোধ করিতেন। তাহার প্রাপ্য জলখাবারট তিনি তখন নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন। বলিতেন, ও যখন মুনিয়ার সঙ্গে জুটেছে তখন বাগানে বাগানে ঘুরে ফলটা পাকড়টা খেয়ে নেবে মুনিয়া সত্যই তাহাকে নানারকম ফল খাওয়াইত। কুল, পেয়ারা, আম, সাপা

(মল্লিকদের বাগানে সাপাটু গাছ ছিল), গোলাপ জাম, লিচু, কালোজাম—নানারকম ফল সংগ্রহ করিতে পারিত সে। সবই পরের বাগান হইতে চুরি করা। ঢিল ছুঁড়িয়া পাড়িত, হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ ছিল। মুনিয়ার সঙ্গ কিন্তু বেশী দিন সে পায় নাই। মল্লিকদের বাগানেই একটা বিষধর গোক্ষুর তাহাকে নাকি দংশন করে। তখন তাহার সঙ্গে কার্তিক ছিল না। মুনিয়া বাড়ি ফিরিতে পারে নাই। বাগানেই মরিয়া পড়িয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে বাগানের মালীর ছেলেটা তাহাদের বাড়িতে খবর দেয়, সে নাকি সাপটাকে কামড়াইতে দেখিয়াছিল। মুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া যায়। মুনিয়ার মা ছিল না। সৎমা ছিল। তাহার বাবা পাশের গ্রামে ধান-কলে কাজ করিত। খবর পাইয়াও সৎমা যায় নাই। বলিয়াছিল, তাহার নাকি বড় ভয় করিতেছে। পাড়ার ছেলেরা অনেকক্ষণ পরে মুনিয়ার শবটা যখন বহন করিয়া আনিল তখন দেখা গেল, কাকে তাহার একটা চোখ ঠুকরাইয়া বাহির করিয়া লইয়াছে। কার্তিক মুনিয়ার শোকে কাঁদিয়াছিল, দুই দিন খায় নাই। তাহার পর বাবা তাহাকে কলিকাতায় একটা বোর্ডিংয়ে ভরতি করিয়া দিলেন। সেইসব কথা এখন মনে পড়িতে লাগিল। আর একটা ছবি মনে পড়িল। মুনিয়ার সেই মুখ-টেপা হাসিটা। কাক তাহার চোখটা নষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু হাসিটা নষ্ট করিতে পারে নাই। মৃত মুনিয়ার মুখেও সেই হাসিটুকু ছিল। মুনিয়ার কথাই নানাভাবে ভাবিতে লাগিল সে। মুনিয়া যদি বাঁচিয়া থাকিত···বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই তাহার কোথাও না কোথাও বিবাহ হইত তখন স্বরংকে সে কি চিনিতে পারিত। কার্তিকের ডাক নাম স্বরং। কার্তিক নামটা পোষাকী নাম, স্কুলে ভরতি করিবার সময় মামা এ নামকরণ করিয়াছিলেন. কার্তিকের মায়ের নাম ছিল দুর্গা, সেইজন্যই এই নাম তাঁহার মনে হইয়াছিল সম্ভবত। স্বরং ভাবিতে লাগিল এই বিপন্ন অবস্থায় সে যদি মুনিয়ার শ্বশুরবাড়িতে গিয়া বলিত—মুনিয়া বড় বিপদে পড়ে এসেছি, আমাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—আমাকে একটু আশ্রয় দিবি? সে কি আশ্রয় দিতে পারিত? আবার মনে হইল নিমুর সহিত বিবাহ না হইয়া তাহার যদি মুনিয়ার সহিতই বিবাহ হইত। হওয়া অসম্ভব ছিল না, কারণ মুনিয়া তাহাদের পালটি ঘরের মেয়ে) তাহা হইলে কেমন হইত? কিন্তু নিমুর সহিত কোন সম্পর্ক নাই একথা ভাবিতেও খারাপ লাগিল তাহার। তাহার পর হঠাৎ দেখিতে পাইল আকাশ দিয়া তিনটা বক উড়িয়া যাইতেছে। মনে হইল নিশ্চয়ই একটা পুরুষ, আর দুইটি তাহার সঙ্গিনী। হয়তো একজন মুনিয়া আর একজন নিমু। কল্পনার আকাশে খানিকক্ষণ সে বক হইয়া নিমু আর মুনিয়া দুইজনকে লইয়া উড়িতে লাগিল। তাহার পর সহসা তাহার মনে পড়িল উপন্যাসটার কথা। গোপালদেব? কেমন ছিল সে? মাৎস্যন্যায়ের যুগে সকলে ওই লোকটিকেই শাসকরূপে নির্বাচন করিয়াছিল কেন? তখন নির্বাচন কি এখনকার মতো ছিল? গোপালদেব কি কোনরকম ছল-চাতুরী-কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল? সে কি বক্তৃতা করিয়া বেড়াইয়াছিল গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে এখনকার নেতারা যেমন করে? সে কি বড়লোক ছিল, না গরীব? ইতিহাসে বলে সে ক্ষত্রিয় সৈনিক ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল সে। কেন? এইসব নানা কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। তাহার পর একটা বড় অদ্ভুত কথা তাহার মনে জাগিল। এটাও তো মাৎস্যন্যায়ের যুগ। আজকালও তো বড় মাছ ছোট মাছকে গিলিয়া খাইতেছে—এখন কি আবার কোন

গোপালদেবের আবির্ভাব সম্ভব ? কেন নয়। আমিই বা গোপালদেবের ভূমিকায় কেন অবতীর্ণ হইতে পারি না। হঠাৎ এই চিন্তাটা তাহাকে যেন পাইয়া বসিল। সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল সে। গোপালদেব বৌদ্ধ ছিলেন। সে-ও কি কার্যত বৌদ্ধ নয় ? সে তো যাগ-যজ্ঞ মানে না, তেত্রিশকোটি দেবতার উপর তো তাহার বিশ্বাস নাই, আত্মা-পরমাত্মার রহস্য লইয়াও সে কোনওদিন মাথা ঘামায় নাই। ভগবান আছেন কিনা, কি উপায়ে তাঁকে উপলব্ধি করা যায় এ ভাবনাও তাহার মনে আসে নাই কোনদিন। বরং নিজের অজ্ঞাতসারে যে নীতিগুলিকে সে এখনও আঁকড়াইয়া আছে তাহা বুদ্ধদেবেরই পঞ্চশীল—হিংসা করিও না, মিথ্যা কহিও না, চুরি করিও না, পরস্ত্রীগমন করিও না, মদ খাইও না। এই সবকেই সেও তো ধর্ম বলিয়া মনে করে। তবে ? এ 'তবে'র উত্তর সহসা তাহার মাথায় আসিল না। সে পঞ্চশীল পালন করে বলিয়াই কি তাহার গোপালদেব হইবার যোগ্যতা আছে ? সে যুগে অনেক লোকই তো 'পঞ্চশীল' পালন করিত, অনেক লোকই তো ত্রিশরণ লইয়া ভিক্ষু-বেশে সংঘে গমন করিত, কিন্তু সকলে তো গোপালদেব হয় নাই। কোন বিশেষ গুণের জন্য তিনি সকলের হৃদয় হরণ করিতে পারিয়াছিলেন ? এই প্রশ্ন কিছুক্ষণ তাহার মনে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইল, তাহার পর মনে হইল স্বয়ং বুদ্ধও তো গোপালদেব হইতে পারেন নাই, বুদ্ধ রাজ্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, গোপালদেব মাৎস্যন্যায়ের হিংস্রতাকে শান্ত করিয়া পত্তন করিয়াছিলেন নূতন রাজ্য। দুইজনের জীবন-নীতিতে আকাশ-পাতাল তফাৎ। সুতরাং বুদ্ধত্ব আর গোপাল-দেবত্ব এক বস্তু নহে। আবার মনে হইল আমার নাম যেমন কার্তিক অথচ দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র সহিত আমার যেমন কিছুমাত্র সাদৃশ নাই—এ-ও অনেকটা তেমনি। তখন হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার অধঃপতন ও অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া অনেকেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা সবসময়ে পঞ্চশীল অনুসরণ করিত না। এদেশের অনেক এমন জাতি বৌদ্ধ হইয়াছিল যাহারা প্রাণী-হিংসা করিয়াই জীবনযাপন করে—জেলে, মালো, কৈবর্ত, শিকারী, ব্যাধ—এরকম অনেক নাম তাহার মনে পড়িল। চীন জাপানও বৌদ্ধ, কিন্তু তাহারাও 'হিংসা করিও না' এ নীতি অনুসরণ করে না। তাহারা সব রকম মাছ মাংস খায়, অস্ত্র লইয়া রণাঙ্গণে রক্তপাত করিতে তাহাদের আপত্তি নাই। আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতেও অনেকটা এই কাণ্ড হইয়াছে। হিন্দুসমাজের কুসংস্কারের সহিত ও সামাজিক ব্যবস্থার সহিত একমত হইতে না পারিয়া অনেকে 'ব্রাহ্ম' হইয়াছিলেন উপনিষদের ধর্মের সহিত নবাগত বিদেশী আচার-ব্যবহারের 'পাণ্ড' করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচলিত হইয়াছিল, অনেকে ব্রাহ্ম হইয়াও ছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মলাভ করিয়াছেন এরূপ লোক সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। 'কমিউনিজম্'ও অনেকটা সেই ধরনের ব্যাপার। অনেকেই 'কমিউনিস্ট', কিন্তু প্রকৃত সাম্যবাদীর লক্ষণ কয়জনের জীবনচরিত্রে রূপায়িত ; সেইজন্য মনে হয়, গোপালদেব বোধহয় নামেই বুদ্ধ ছিলেন। প্রয়োজন হইলে ক্ষত্রিয়ের মতো তরবারি নিষ্কাশন করিয়া শত্রুর রক্তপাত করিতে তিনি দ্বিধা করিতেন না। কার্তিক কল্পনা করিল, তিনি নিশ্চয় আমিষাশী ছিলেন হয়তো শিকারীও ছিলেন। একটা ছবি সহসা তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল —একটা বিরাট বন্যবরাহকে অনুসরণ করিয়া একজন শিকারী ভল্ল হস্তে বনজঙ্গল ভাঙিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ক্ষাত্র পৌরুষের একটা বলিষ্ঠ আবির্ভাব তাহার কল্পনায়

মূর্ত হইয়া আবার পরক্ষণেই মিলাইয়া গেল। তাহার মনে হইল যে বাঙালীরা আজ কেরানীগিরি লাভ করিবার জন্য নানাভাবে নিজেদের অবনত করিতেছে এই সমর্থ পুরুষের সহিত কি তাহাদের কোন সম্পর্ক আছে? কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া রহিল সে। তাহার পর মনে হইল সম্পর্ক আছে বই কি। কিন্তু যুগের প্রভাবে মানুষ বদলাইয়া গিয়াছে, তাহার নিজের ঠাকুরদাদার কথা মনে পড়িল। তিনি প্রত্যহ সাত আট ক্রোশ হাঁটিয়া বেড়াইতেন, এক চুমুকে দুই সের দুগ্ধ পান করিতে পারিতেন, স্বপাক রাঁধিয়া একবেলা খাইতেন, জুতা পরিতেন না, ছাতা মাথায় দিতেন না, জামাও পরিতেন না। তিনি আমারই পূর্বপুরুষ ছিলেন, অথচ তাঁহার সহিত আমার কিছুমাত্র মিল নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া গোপালদেবের কথাটাই তাহার বারবার মনে হইতে লাগিল। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন? বুদ্ধদেবের কোন বিশেষ বিভূতি তাঁহার চরিত্রে প্রতিভাত হইয়াছিল কি? হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' কবিতাটা মনে পড়িল। তাহাতে একটা কথা আছে 'করুণাঘন'। এই 'করুণা' গভীর ভালবাসারই নামান্তর। মহৎ লোকেরা সকলকেই করুণা করেন। এ করুণা ইংরেজি 'পিটি' (pity) নহে, ইহা উচ্চ বেদীতে দাঁড়াইয়া অনুগ্রহবর্ষণ নহে, ইহা সহানুভূতি, সহমর্মিতা, দুঃখীর বেদনা নিজের হৃদয়ে অনুভব করিয়া তাহার জন্য অশ্রুবিসর্জন করা। শুধু তাহাই নহে, কি করিলে সে কষ্ট দূর হইবে তাহার উপায় উদ্ভাবন করা। বুদ্ধদেব তাহাই করিয়াছিলেন। হয়তো গোপালদেবও ওই পথের পথিক হইয়াই জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। বুদ্ধত্বের ওই মহৎ গুণটিই হয়তো তাঁহার চরিত্রকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। তিনি সকলকেই ভালোবাসিয়াছিলেন। অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত উভয়ের জন্যই বেদনাবোধ করিয়াছিলেন তিনি। তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন নাই, সকলেরই মঙ্গল চিন্তা করিয়া নিঃস্বার্থভাবে সকলেরই সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন। আমি কি তাহা পারিব না? সঙ্গে সঙ্গেই দুইটা মুখ তাহার মনে পড়িল—তাহার শালা কালীকিঙ্করের এবং মিস্টার ভড়ের। মিস্টার ভড়ের পক্ষপাতিত্বের জন্যই সে কেরানীগিরি চাকুরিটি পায় নাই। ভড় মহাশয় তাঁহার আই-এ পাশ পুত্রটিকে আপিসে বাহাল করিয়া বলিয়াছিলেন—ও সব বি-এ অনার্স-ফনার্সের মুরোদ কতদূর তা আমার জানা আছে। ওরা আপিসে নাক উঁচু করে থাকবে খালি, আর অন্য কোথাও একটু বেশী মাইনে পেলেই ফুড়ুৎ করে পালিয়ে যাবে। চাকরিতে অবশ্য মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন চাওয়া হইয়াছিল ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। কার্তিকের খুব আশা ছিল সে যখন বি-এ অনার্স তখন নিশ্চয়ই চাকরিটা পাইবে। মিস্টার ভড়ের বাটির মতো মুখটা মনে পড়িল, মাথায় টাক, ঘন ভুরু, নাকের নীচে 'টুথ ব্রাশ' গোঁফ। চক্ষুর দৃষ্টি ব্যঙ্গব্যঞ্জক। তাহার শালা (বৈমাত্র শালা, তাহার শ্বশুরের প্রথম পক্ষের পুত্র) কালীকিঙ্করের মুখটাও মনোরম নহে। অনেকটা কোদালের মতো, চতুষ্কোণ এবং নিষ্ঠুর। নামটা গাঁইতির মতো। ইহাদের কি সে ভালবাসিতে পারিবে? ইহাদের জন্য কি তাহার মনে করুণা জাগিতে পারে? যে সুদখোর মহাজনটা তাহার পিতাকে চক্রবৃদ্ধি সুদের বেড়া-আগুনে পোড়াইয়া মারিয়াছিল তাহাকে ক্ষমার চক্ষে দেখার মতো উদারতা কি তাহার আছে? স্বীকার করিতে হইল, নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন বলিল—এসব লোক কি ক্ষমার যোগ্য? ইহাদের ক্ষমা করা তো কাপুরুষতার নামান্তর মাত্র। নিজের বীর্যবলে ইহাদের যদি স্ববশে আনিয়া তাহার পর ক্ষমা করিতে

পারি তাহা হইলেই সে ক্ষমা ক্ষমা নামের যোগ্য। গোপালদেব যদি আমার মতো অবস্থায় পড়িতেন তাহা হইলে ওই কালীকিংকরকে, ওই মিস্টার ভড়কে, ওই সুদখোর রাহুল মিত্রকে কি ক্ষমা করিতেন? কখনই না। তিনি নিশ্চয়ই প্রথমে উহাদের শক্তিবলে জয় করিয়া তাহার পর তাহাদের ক্ষমা করিতেন।

"চল হে এবার ওঠা যাক। তালুকপুরে একটা মেলা বসেছে শুনেছি। সেইখানে যাই চল। কিছু রোজকার তো করতে হবে।"

"কে রোজকার করবে? তুমি?"

"হিঁ। তুমিও করবে। চল বাজার থেকে কিছু আবির আর কিছু কালো রং কিনে নিই। তোমার মুখে মাখিয়ে দিলে খাশা দেখাবে। আমি আমার কাপড়টা খুলে ঘাগরার মতো করে পরব। গামছাটা মাথায় দিয়ে ঘোমটার মতোও করে নেব একটু। তারপর কোমরে হাত দিয়ে লাচব। আর তুমি মুখে রং মেখে আমার সংগে ফষ্টিনষ্টি করবে। খুব জমে যাবে। লোকে লাচ দেখতে বড় ভালোবাসে। হিন্দী সিনেমাগুলো চলছে খালি লাচের জোরে। আমি অনেক হিন্দী সিনেমা দেখেছি, প্রায় সবগুলোতেই ডবকা ছুঁড়িদের লাচ। সার্কাস তো একটা কাটখোট্টা ব্যাপার, সেখানেও লাচ দিতে হয়। সার্কাসে আমি আর মোহিনী লাচতাম। মোহিনী লাচত আর আমি মুখে কালি ভুষো আর আবির মেখে তার সংগে ইয়ার্কি করতাম। খুব জমে যেত—কি হাততালির ধুম। আমার পার্টটা আজ তোমাকে করতে হবে। চল আর দেরি করা নয়। মেলায় একটা দালাল জোগাড় করতে হবে—পাব কি না জানি না, পেলে ভালো হয়—"

"দালাল? দালাল কি করবে!"

"আমাদের হ'য়ে দালালি করবে। কিছু পয়সা নেবে অবশ্য, কিন্তু তাতে বেশী পয়সা রোজকার হবে।"

"তাই না কি।"

"হিঁ। চলই না দেখা যাক কি হয়--। ওই! কুকুরটা আবার মাটি খুঁড়ছে কেন—!"

"ছুঁচোর সন্ধান করছে—"

"যদি আজ ভাল রোজকার হয়, ওকে একটু দুধ খাওয়াব। কি বল?"

কার্তিক একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। মুখে লাল কালো রং মাখিয়া কি ধরনের ফষ্টিনষ্টি করিলে লোকেরা খুশী হইয়া পয়সা দিবে তাহাই সে ভাবিতেছিল বোধহয়।

"চল ওঠা যাক। সন্ধে তো হয়ে গেল। হাঁটতেও হবে খানিকটা—"

"তালুকপুরের খবর কে দিলে তোমায়—

"বাজারে যেখানে আমি খেলা দেখাচ্ছিলাম তারাই বললে তালুকপুরে প্রতি পূর্ণিমায় মেলা বসে। খুব লোকজন আসে। সেখানে রোজকার বেশী হবে। চল যাওয়া যাক—কুকুরটাকে ডাক, ও যে খুঁড়েই চলেছে —"

"লর্ড—লর্ড—"

লর্ডের ভ্রূক্ষেপ নাই। সে একবার ঘাড় ফিরাইয়া কান খাড়া করিয়া তাকাইল মাত্র আবার খুঁড়িতে লাগিল।

"ভারি অবাধ্য কুকুরটা। চল আমরা এগিয়ে যাই। ও আপনিই আসবে—"

আন্‌টা একবার কোমর বাঁকাইয়া নাচিয়া লইল। তাহার পর বার দুই লাফ খাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—হুই, হুই, হুই। পরিশেষে মুখে আঙুল ঢুকাইয়া সিটি দিল বার দুই।

"আমার মনে জোয়ার এসে গেছে, চল।"

জিনিসপত্র দুইটি থলিতে পুরিয়া বাহির হইয়া পড়িল তাহারা। যখন কিছুদূর গিয়াছে লর্ড তখন মুখ তুলিয়া দেখিল তাহারা চলিয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঁই বাঁই করিয়া ছুটিল সে তাহাদের পিছনে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহাদের পার হইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর আবার ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া লাফালাফি করিতে লাগিল। মুখে একটা দুষ্টু-দুষ্টু হাসি-হাসি ভাব। একটা কান উল্টাইয়া গিয়াছে!

তালুকপুরের মেলায় একজন দালাল পাওয়া গেল। একটা তাঁবুর সামনে দাঁড়াইয়াছিল লোকটা। মুখময় বসন্তর দাগ। আন্‌টার কাছে সমস্ত শুনিয়া সে বলিল, "ঠিক আছে। তোমরা আমার এই তাঁবুটায় ঢোক। ঢুকে সাজগোজ করে নাও। আমি ততক্ষণ ক্যানেস্তারা পিটে লোক জোগাড় করে ফেলছি। রাত্রি দশটার পর কিন্তু তাঁবু ছেড়ে দিতে হবে।"

"কেন?"

"আর একজন আসবে, খেজুরি বিবি। তার কারবার রাত দশটার পর।"

তাহার হতে একটা রিস্ট-ওয়াচ ছিল, সেটার দিকে এক নজর চাহিয়া বলিল—"প্রায় সাতটা বাজে, তোমরা যদি দশটা পর্যন্ত থাকো, তাঁবুর ভাড়া ঘণ্টা পিছু চার আনা লাগবে। তিন ঘণ্টায় বারো আনা। আর আমি যে ক্যানেস্তারা পিটে লোক জড় করব তার জন্যে এক টাকা চাই।"

আন্‌টা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"অত পারব না ভাই। বখরা কর। টাকায় দু'আনা নিও। যত পয়সা পড়বে তা আমি কুড়ুব। তারপর সঙ্গে সঙ্গে তোমার বখরা দিয়ে দেব। এতে রাজি?"

লোকটা কানে আঙুল ঢুকাইয়া কানটা একবার চুলকাইয়া লইল। তাহার পর বলিল—"তুমি বামন অবতার, তোমার নাচ দেখতে লোক জুটবে। ইনি কি করবেন?" আমাকে দেখাইয়া প্রশ্ন করিল।

"ইনি হবেন আমার লাগর। আমি লাচব আর ওঁকে লাচাব—"

"তাই না কি—"

"হিঁ গো। দেখো না কেমন জমাই—। রাজি তো?"

"বেশ। ঢুকে পড় তাহলে তাঁবুর ভিতর—আমি ক্যানেস্তারা পিটি—আর এ কুকুরটাও তোমাদের না কি।"

"হিঁ। ওটাও লাচবে—"

তিনজনে তাঁবুর ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। বাহিরে ক্যানেস্তারা পিটাইয়া লোকটা তারস্বরে বলিতে লাগিল—আসুন, আসুন। এখনি বামন অবতার মাগী সেজে নাচ দেখাবে তার নাগরের সঙ্গে। আর তাদের সঙ্গে নাচবে একটা কুকুরও। দশ নয়া করে দর্শনী লাগবে। দয়া করে কেউ ফাঁকি দেবেন না। ফাঁকি দিলে বামন অবতারের শাপ লাগবে—ঢং ঢং ঢং ঢং।"

ক্যানেস্তারার বাজনা উদ্দাম হইয়া উঠিল।

তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়া আনটা কার্তিককে চুপি চুপি বলিল, "তুমি গানের এই লাইনটা মনে রেখো। আমাদের সার্কাসের সাঁওতালী সহিসের কাছে শিখেছিলাম এটা। 'ওরে আমার মুংলি সোনা, লাচ দেখারে। গা দুলিয়ে পা খেলিয়ে লাচ দেখা রে—'। এইটেই সুর করে গাইবে আর আমি লাচব। আর কুকুরটা আমাদের ঘিরে হুটোপুটি করবে—"

"লর্ড পিছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে হাঁটতেও পারে—"

"বাঃ, তাহলে তো খাশা হবে। ওর সামনের পা দুটো ধরে ওকে লাচিও, তাহলে আরও জমে যাবে—। বস, তোমার মুখে রং মাখাই, বাজারে খুব ভালো রং পেয়েছি। নাকটা আর চোখের পাশগুলো লাল করব। থুতনিটাও। আর বাকীটা কালো। তুমি হাত পা তুলে যেমন খুশি লেচো তবে ওই গানটা গাইতে হবে—ওরে আমার মুংলি সোনা, লাচ দেখা রে। গা দুলিয়ে পা খেলিয়ে লাচ দেখা রে। লাচ দেখা রে লাচ দেখা রে লাচ দেখা রে। মনে থাকবে তো ?"

"থাকবে—"

কার্তিকের মুখে হাতে রং মাখাইয়া আনটা নিজের কাপড়টা খুলিয়া ফেলিল। কার্তিকের সামনেই উলঙ্গ হইয়া পড়িল সে। এতটুকু লজ্জা করিল না তাহার। কাপড়টা কোঁচ দিয়া শাড়ির মতো করিয়া পরিল। তাহার পর তাঁবুর কোণের দিকে তাকাইয়া সে সোল্লাসে বলিয়া উঠিল—"এ লাগ লাগ, এ লাগ লাগ, লেগে গেছে, মিলে গেছে !"

তাঁবুর কোণের দিকে ছোট ছোট দুইটা ইঁটের টুকরো আর একটু শণের দড়ি পড়িয়াছিল। আনটা ছুটিয়া গিয়া সেগুলি লইয়া আসিল।

"এই ইঁট দুটো দড়ি দিয়ে আমার বুকের দু'পাশে বেঁধে দাও তার উপর আমার রাঙা গামছাখানা। বুকের কাছটা একটু উঁচু না হলে মুংলিকে মানাবে কেন !—"

ভাগ্যিস্ দড়ি একটু বেশী ছিল—যে মজুররা তাঁবু খাটাইয়াছিল তাহারাই ফেলিয়া গিয়াছিল বোধহয়। বেশী দড়ি না থাকিলে ওই ইঁটের টুকরা দুইটা বুকে বাঁধা যাইত না। কার্তিক ইঁটের টুকরা দুইটাকে বুকের দুই পাশে রাখিয়া দড়ির বহু পাক দিয়া সেগুলিকে মজবুত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। একটা ছেঁড়া খবরের কাগজও পড়িয়াছিল তাঁবুর ভিতর। আনটা আদেশ করিল, "ওটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ইঁটের ফাঁকে ফাঁকে গুজে দাও। নিটোল হবে তাহলে।" নিজের বুকের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া সে বলিতে লাগিল—"বাঃ ই তো খাশা হয়েছে। মোহিনীর মতো আমার মুখটা যদি হ'ত, তাহলে দেখিয়ে দিতাম লাচ কাকে বলে—!"

ভীড় প্রচুর হইয়াছিল। সমস্ত মেলাটাই ভাঙিয়া পড়িয়াছিল যেন। আনটার নৃত্য-শিল্প হয়তো উচ্চাঙ্গের ছিল না, কিন্তু তাহার প্রাণপ্রাচুর্য এত প্রচুর, তাহার উচ্ছ্বসিত আনন্দের প্রকাশ এত সাবলীল যে তাহাতেই জমিয়া গেল। কার্তিকও মুখে রং মাখিয়া 'লাগরের' পার্টে মন্দ অভিনয় করিল না। সে বিশেষ কিছু করে নাই।—হাত পা নাড়িয়া ওই গানের কলিটা মুখভঙ্গী করিয়া গাহিতে লাগিল কেবল—ওরে আমার মুংলি সোনা লাচ দেখা রে। আনটাও নাচিতে নাচিতে ইহার

উত্তরে আরও খানিকটা গাহিল—লাচব ক্যানে? বাউটি দিবি? প‍ঁইছা দিবি? কাঁকন দিবি? ও মুখ পোড়া, মাকড়ি দিবি? লত দিবি? গোট দিবি? না দিস তো—লাচব ক্যানে, লাচব ক্যানে—? এই বলিয়া সে থুত্‌নিতে আঙুল দিয়া কোমর বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া যে নাচ নাচিল তাহাতে হৈ হৈ পড়িয়া গেল চতুর্দিকে। লর্ডও ইহাদের ঘিরিয়া ঘিরিয়া আনন্দে উদ্দাম নৃত্য জুড়িয়া দিল। পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া কার্তিকের সঙ্গেও খানিকক্ষণ নাচিল সে। মনে হইতে লাগিল তাহার স্ফূর্তিই যেন সবচেয়ে বেশী।

পয়সা অনেক পড়িয়াছিল। তাঁবুর সামনেই একটা পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। লণ্ঠনটা না কি খেজুরি বিবির। তাহারই একজন চাকর সন্ধ্যা হইতে সেটা জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল, সম্ভবত খেজুরি বিবির আগমনবার্তা বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য। সেই লণ্ঠনের আলোতেই আন্‌টার নাচেরও সুবিধা হইয়া গেল। সেই আলোতেই সে পয়সাও কুড়াইল। সব সমেত আট টাকা কুড়াইয়া পাইল সে। অনেকে আধুলিও দিয়াছিল। তাঁবুর মালিককে সে একটাকা দিল, খেজুরি বিবির চাকরকেও আট আনা দিয়া সে বলিল—"ভাগ্যিস আলোটা এনেছিলে ভাই, তাই আমাদের সুবিধে হয়ে গেল। তোমার নাম কি—?"

চাকরটা হাঁ করিয়া একটা অস্ফুট শব্দ করিল, তাহার পর বুড়ো আঙুল নাড়িতে লাগিল। বোঝা গেল, সে বোবা। আন্‌টা মুখ সুচালো করিয়া বলিল—'হুই, কি কাণ্ড।' কার্তিক তাঁবুর ও পাশটায় অন্ধকারে গিয়া বসিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল গোপালদেব কি এরকম পরিস্থিতিতে পড়িয়াছিলেন কখনও?

"হুই কার্তিক কোথা গেলে হে—"

আন্‌টার ডাক শুনিয়া কার্তিক বাহির হইয়া আসিল।

"চল ওদিকে একটা পুকুর আছে শুনেছি। চান করে আসি।"

"আমি পায়জামা ভিজুব না। দ্বিতীয় কাপড় আমার নেই—"

"দ্বিতীয় কাপড়ের কি দরকার। দিগম্বর হয়ে চানটা করে লাও—পুকুর পাড়ে গাছগাছালি আছে নিশ্চয়—তারই আড়ালে দাঁড়িয়ে।"

"না সে আমি পারব না। তোমার কাপড় আছে?"

আন্‌টার হাসিও আকর্ণবিস্তৃত হইয়া উঠিল। বলিল—"হ্যাংলা বলে ন্যাংটাকে, মাণিক আমায় কাপড় দে—। আমার কাপড় কোথা? একটা ছেঁড়া হাফপ্যাণ্ট আছে খালি,—আর এই গামছাখানা, যেটা বুকে বেঁধেছি। ইটা খোলো তো ইঁট দুটোও খোল, খোঁচা মারছে বুকে। গামছাটা পরে চান করতে পার—তাই চল—চল পুকুরটা বার করি আগে—"

কিছু দূরেই একটি রিক্‌শা দাঁড়াইয়াছিল। সেই রিকশা হইতে একটি ডগমগে-লাল-শাড়ি-পরা মেয়ে নামিল। তাহার পায়ে হাই-হিল জুতা, চোখে চশমা, গালে ঠোঁটে রং, পিছনে সর্পাকৃতি একটি বেণীর অগ্রভাগে জরির ফুল। তাহার উপর পেট্রোম্যাক্সের আলোটা পড়িতেই মনে হইল যেন একটা আবির্ভাব। মেয়েটি সোজা কার্তিকের দিকে আগাইয়া আসিল এবং বিস্মিত কার্তিক কিছু বলিবার পূর্বেই বলিল—"সুরং আমাকে চিনতে পারছ?"

সুরং পারিল না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল কেবল।

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া বলিল—"আমি চপলা—"

চপলা! চপলাদি! একটা তীক্ষ্ণ ছুরিকা যেন বিস্মৃতির পরদাটাকে চিরিয়া ফেলিল। সেই ছিন্ন পরদার ভিতর দিয়া সে সহসা ভৈরব-কিংকর প্রাইমারি গার্লস্ স্কুলের শিক্ষিকা মিস চপলা চক্রবর্তীকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। বহুকাল আগে কালীকিংকরের প্রপিতামহ ভৈরবকিংকরের নামে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ে কালীকিংকর যাহাকে শিক্ষিকা পদে বাহাল করেন তিনি কালীকিংকরেরই দূরসম্পর্কীয়া শালী ম্যাট্রিকুলেশন-পাশ চপলা চক্রবর্তী—সুরংয়ের চপলাদি। চপলা কালীকিংকরের বাড়িতেই থাকিত, নিমুকে এবং জ্যোৎস্না বউদিকে (কালীকিংকরের স্ত্রী) ইংরেজি, বাংলা এবং অংক পড়াইত, ইতিহাসেও প্রচুর দখল ছিল তাহার। নাটক নভেল পড়িত না, ইতিহাসের বই পড়িত। তাহার পর হঠাৎ একদিন সে অন্তর্ধান করিল। নিমু বলিল-কুলে কালী দিয়া গিয়াছে। কালীকিংকর কপাল চাপড়াইয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—যাকে ফুলের মালা মনে হয়েছিল সে যে আসলে কালভুজঙ্গিনী তা কে জানত। ইহার পর ভৈরবকিংকর বালিকা বিদ্যালয় (ইংরেজিতে নাম ছিল বি. কে গার্লস স্কুল) উঠিয়া গেল। ইহার পর আর কোনও শিক্ষিকাই পাওয়া গেল না। জ্যোৎস্না বউদি কোনও শিক্ষিকাকে বাড়িতে স্থান দিতে রাজি হইলেন না। গ্রামের কোনও সম্পন্ন গৃহস্থই হইল না। উপরে সিমেন্ট-অক্ষরে চিহ্নিত বি· কে· গার্লস স্কুলটির পাকা একতালা ভবনটি এখনও আছে। তাহা কালীকিংকর ধান-চালের গুদাম-রূপে ব্যবহার করেন। কতদিন আগেকার কথা? বছর পাঁচেক হইবে। ইহার মধ্যেই চপলা—তাহার চপলাদি—বিস্মৃতির আড়ালে হারাইয়া গিয়াছিল। আশ্চর্য তো। সত্যই আশ্চর্য মানুষের মন। অনেকদিন আগে এক বিজ্ঞানের শিক্ষকের কাছে সে আকাশের নক্ষত্র চিনিতে শিখিয়াছিল! সপ্তর্ষিমণ্ডলীর 'কর কারোলি' (Cor Caroli) নামক ছোট একটা নক্ষত্র সে অনেক কষ্টে চিনিয়াছিল। সে নক্ষত্রটা এখন কোথায় আছে? চিনিয়া বাহির করিতে পারিবে কি? সে হঠাৎ যদি তারার ভীড় ঠেলিয়া আগাইয়া আসিয়া বলে—সুরং আমাকে চিনতে পারছ? সে পারিত না। চপলার আবির্ভাবও যেন অনেকটা সেই ধরনের।

"চপলাদি! তুমি এখানে—?"

"এসে পড়লুম। তুমি মুখে রং মেখে সং সেজেছ, কিন্তু তবু তোমাকে চিনেছি আমি। চল, সব বলছি—"

যে বোবা চাকরটা পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠনের কাছে বসিয়াছিল চপলা তাহাকে প্রশ্ন করিল—"তাঁবুর ভিতর বিছানাটিছানা পেতেছিস?"

সে ঘাড় নাড়িয়া উদ্ভাসিত চক্ষে জানাইল পাতিয়াছে। কার্তিক বলিল—তাঁবুটা শুনেছি খেজুরি বিবি ভাড়া করেছেন।"

"আমিই খেজুরি বিবি। ভিতরে এস—"

আরও বিস্মিত হইল কার্তিক। আরও ঘাবড়াইয়া গেল সে।

আনটা বলিল—"আমি তাহলে চানটা সেরে আসি। ঘেমে একেবারে আচার হয়ে গেছি। তুমি আলাপ কর ওনার সঙ্গে। লর্ড আয়, তোকে একটু খাবার খাওয়াই, অনেক নেচেছিস—আঃ, আঃ—হুই হুই—হুই—"

লর্ডকে লইয়া আনটা চলিয়া গেল।

তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়া আরও আশ্চর্য হইয়া গেল কার্তিক। সেখানে একটা বড় চাদরের উপর রং-ওঠা পুরোনো একটা কার্পেট পাতা, গোটা দুই তাকিয়া, একটু দূরে পাশে একটা দড়ির খাটিয়া, এক বালতি জল আর চকচকে কাঁসার ঘটি। আর এক কোণে একটি কুঁজোর মুখে ঢাকাদেওয়া একটি কাচের গ্লাস। তাহার পাশে তিন চারটি বোতল—বোধহয় মদের বোতল।

"তুমি খেজুরি বিবি! চপলাদি, আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না—"

"চপলাদি অনেকদিন আগে মরে গেছে। তোমার শালা কালীকিংকরই মেরে ফেলেছে তাকে। যাক সে কথা। তুমি এখানে রং মেখে সং সেজে কি করছ। আমি এতক্ষণ বসে বসে অবাক হয়ে তোমার কাণ্ড দেখছিলাম—! মদ খেয়েছ না কি।"

"না—"

"মদ না খেয়েই মাতালের অভিনয় করছিলে?"

"পেটের দায়ে করছিলাম—"

"কি রকম।"

"কালীকিংকর আমাকেও জুতো মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে—"

"তাই না কি। নিমুকেও?"

"নিমুকে এখনও তাড়ায়নি। ওকে সহজে তাড়াবে না, কারণ ও যে বিনা মাইনের রাঁধুনী—চাকরানী।"

খেজুরি বিবি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শুনিতেছিল।

"তারপর?"

"তারপর আর কি। রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি একটা ঝুলি নিয়ে, জুতোটা বিক্রি করে দিন দুই চলেছে। তারপর জুটেছে ওই আনটা—সার্কাস-পালানো ওই বামনটা—ওরই সাহায্যে চলছে এখন—ও নানারকম খেলা জানে—ও যা বলছে তাই করছি—কোন রকমে কিছু রোজকার করতে হবে তো।"

"কি রকম রোজকার করছ?"

"কোন রকমে খাওয়া চলছে। আজ গোটা ছয়েক টাকা হয়েছে—"

"ও কুকুরটা কি তোমার?"

"হ্যাঁ। ওটাকে নিয়ে বিপদে পড়েছি। কিছুদূর এসে দেখি পিছু পিছু আসছে। নবীন দিয়েছিল আমাকে বাচ্চাটা। বড় ভালো কুকুর—রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি, ওটাকে নিয়ে বিপদে পড়েছি—"

"তুমি কি করবে ঠিক করেছ কিছু? সারাজীবন রাস্তাতেই ঘুরে বেড়াবে?"

"সিংরা বলে একটা গ্রামে আমাদের পূর্বপুরুষদের ভিটে পড়ে আছে, সেইখানে যাব ঠিক করেছি—"

"জায়গাটা কোথা—"

"হুগলী জেলায় শুনেছি।"

"হুগলী জেলায় সিঙুর বলে একটা জায়গা আছে জানি। সিংরায় তুমি গেছ কখনও?"

"না—"

"তোমার ভিটে কোনটা তাহলে চিনবে কি করে? কোনও কাগজপত্তর আছে?"

"না—"

খেজুরি বিবি হাসিয়া ফেলিল।

"কোন ভরসায় যাচ্ছ তাহলে!"

কার্তিকেরও মনে হইল সত্যই তো নির্ভরযোগ্য কিছুই নাই। গ্রামের নামটাও হয়তো সে ঠিক জানে না। হয়তো সিঙুরকেই সিংরা ভাবিয়াছে সে।

খেজুরি বিবি বলিল—"তুমি এখনও ঠিক তেমনি আছ—"

"তেমনি মানে?"

"সরল। সংসারের ঘোরপ্যাঁচ কিচ্ছু বোঝ না।"

খেজুরি বিবি মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

কার্তিকের রাগ হইল হঠাৎ। নাকটা ফুলিয়া উঠিল।

"তার মানে ভদ্রভাবে বোকা বলছ আমাকে। আমি অবশ্য বোকাই। তার উপর অদৃষ্ট খারাপ, পূর্বজন্মের অনেক পাপ ছিল, তা না হলে কেউ ঘরজামাই হয়—"

খেজুরি বিবি ভ্রূলতা উত্তোলন করিয়া বলিল—"কথার অমন বেঁকিয়ে মানে করছ কেন! সরল মানে বোকা নয়। সরল মানে যার মন শুদ্ধ, নিষ্পাপ. যে সবাইকে সহজে বিশ্বাস করতে পারে, যার মহৎ আদর্শে আস্থা আছে—সেই সরল। সরলতায় পৃথিবী জয় করা যায়। সরল লোক বিরল। রাগ করছ কেন তুমি—! আচ্ছা, সুরং তোমার মনে কোনও স্বপ্ন নেই?"

সুরং খেজুরি বিবির মুখের দিকে বিস্ফারিত চক্ষে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিল—"আছে বই কি। আমার মন স্বপ্নের বাগান। নানারকম স্বপ্ন ছেলেবেলা থেকে ফুলের মতো ফুটেছে আর ঝরে গেছে। ছেলেবেলায় স্বপ্ন ছিল বড় স্কলার হব একজন. আশু মুখুজ্যের মতো। ম্যাট্রিকুলেশন আই-এ-তে ভালো রেজাল্টও করেছিলাম। বাবা ছেলেবেলা থেকে আমাকে কলকাতার ভালো স্কুলে ভালো কলেজে পড়িয়েছিলেন, ভালো লাইব্রেরি থেকে অনেক বই পড়েছিলুম, অনেক বই কিনেওছিলুম—বাবা সব টাকা জোগাতেন ধার করে করে। সেই ধারের আগুনেই শেষে সব পুড়ে গেল। বাবার পক্ষাঘাত হল, মা আগেই মারা গিয়েছিলেন, আমাকেই বাবার সব সেবা করতে হত। সেবার আমার বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার বছর, পরীক্ষা দিলুম, কিন্তু থার্ড ক্লাস অনার্স পেলুম। বাবাও মারা গেলেন। আমাদের যাকিছু ছিল তা সুদখোর মহাজন দখল করে নিলে। স্বপ্নটা ঝরে গেল।"

কার্তিক চুপ করিল।

"তারপর—?"

ম্লান হাসিয়া কার্তিক উত্তর দিল - "কি হবে আমার মতো হতভাগার কথা শুনে—"

"নিজেকে অত ছোট ভেবো না সুরং। ছোট ভাবতে ভাবতে আরও ছোট হয়ে যাবে। বল, আর কি কি স্বপ্ন জেগেছিল তোমার মনে—"

কার্তিক চুপ করিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত, তাহার পর তাহার চোখে মুখে সলজ্জ হাসি ফুটিয়া উঠিল একটা।

"পরের স্বপ্নটা অবশ্য নিমুকে ঘিরে। সেটা এখনও একেবারে নিঃশেষ হয়নি। তারপরেও আর একটা স্বপ্ন জেগেছিল—"

একটু ইতস্তত করিয়া আবার থামিয়া গেল কার্তিক।

"কি সেটা শুনি—"

"সেটা তোমাকে ঘিরে। তখন আমি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলো আর একবার করে পড়ছিলাম। তখন তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল তুমি শ্রী। যদিও কিছু মিল ছিল না, তবু মনে হয়েছিল। স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের অনেক অমিল থাকে, কিন্তু মিলও থাকে আবার। তোমার সঙ্গে সেই মিলটা ছিল—সেটা কি অবশ্য তা বলতে পারব না। আমার কেবলই মনে হত কোনও অদৃশ্য সীতারামের জন্য তুমি যেন প্রস্তুত করছ নিজেকে।......"

খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল খেজুরি বিবি।

"তোমার কল্পনার দৌড় তো কম নয়! আসল কথাটা কি বলব? আমাকে তোমার ভালো লেগেছিল। যাকে ভালো লাগে তাকে নিয়ে অনেক কবিত্ব জাগে মনে। তার মুখকে মনে হয় চাঁদ, চোখকে মনে হয় চকোর, হাতকে মনে হয় বাহুলতা। এ স্বপ্ন কি এখনও বেঁচে আছে তোমার মনে?"

"না—। তোমাকে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। মনের উপর একটা যবনিকা পড়ে গিয়েছিল। সেই যবনিকার সামনে বসে আমি এতদিন জগু ভট্চাজের সঙ্গে দাবা খেলেছি, কোনান্ ডয়েলের উপন্যাস পড়েছি, ঘোষেদের পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরবার চেষ্টা করেছি, চণ্ডীমণ্ডপে বসে পর-চর্চায় যোগ দিয়েছি—অর্থাৎ টিপিকাল ঘরজামাইয়ের যা যা করা উচিত তাই করেছি, তোমার কথা একবারও ভাবিনি। রাস্তায় বেরিয়ে আবার নতুন স্বপ্নের একটা কুঁড়ি দেখা দিয়েছে আমার মনের বাগানে। তার আবির্ভাব দেখে আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি।"

"কি রকম সেটা— ?"

"শুনলে তুমি হয়তো হাসবে। আমার মুখের রং-টং দেখে এমনিতেই তোমার সন্দেহ হয়েছে যে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এ কথা শুনলে আর সন্দেহ থাকবে না।"

"বলই না শুনি—"

"রাস্তায় বেরিয়ে প্রথমেই জুতো জোড়া বেচে দিলাম একটা মুচিকে। তাতে দিন দুই চলল। তৃতীয় দিনে কি করি ভাবছি—এমন সময় একটা বড় ডাস্টবিন্ চোখে পড়ল। ডাস্টবিনে অনেক সময় খাবারের টুকরো পাওয়া যায়। হাঁটরাতে লাগলাম ডাস্টবিনটা। খাবার তেমন পেলাম না। পেলাম একটা জাবদা পাণ্ডুলিপি। রাজা গোপালদেবকে নিয়ে লেখা—"

"যিনি অষ্টম শতাব্দীতে গণতন্ত্র স্থাপন করেছিলেন?"

"হ্যাঁ। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে মাৎস্যন্যায়ের যুগে সেটা তিনি করেছিলেন, যে যুগে সবাই খেয়ো-খেয়ি করছে, সেই যুগে সবাই তাঁকে নেতা বলে মেনেছিল। কেন মেনেছিল? শুধু যে সাময়িকভাবে মেনেছিল তা নয়, গোপালদেব পাল বংশ স্থাপন করেছিলেন, যে পাল বংশ বাংলার ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায়—"

খেজুরি বিবির চোখে আলো চকচক করিয়া উঠিল। কিন্তু সে কোনও কথা বলিল না, হাসি মুখে চাহিয়া রহিল।

কার্তিক বলিতে লাগিল—"এটাও তো মাৎস্যন্যায়ের যুগ। এ যুগে কোনও গোপালদেব হওয়া কি সম্ভব নয়?"

"তোমার স্বপ্নটা কি তাই শুনি না—"

কার্তিক একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। সে-ই যে গোপালদেব হইতে চায় এত বড় হাস্যকর কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে ইতস্তত করিতে লাগিল সে।

"ধর আমিই যদি গোপালদেব হবার চেষ্টা করি। সেটা কি হাস্যকর হবে খুব?"

কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল খেজুরি বিবি। তাহার পর বলিল—"হাস্যকর কেন হবে। ইতিহাসে এ রকম ঘটনা তো ঘটেছে। সামান্য একটা ক্রীতদাস স্লেভ ডাইনাস্টি স্থাপন করেছিল। স্বয়ং গোপালদেবও তো সাধারণ লোক ছিলেন। তাছাড়া আজকাল কি হচ্ছে—যত সব হোমরাচোমরা মিনিস্টার, প্রেসিডেণ্ট, এরা সবাই তো সাধারণ পর্যায়ের লোক। পৃথিবীর বৃহত্তম যে বিদ্রোহ ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশনে মূর্ত হয়েছিল তা করেছিল তোমার আমার মতো সাধারণ মানুষ। রাশিয়াতেও তাই—"

কার্তিক অবাক হইয়া গেল।

"তুমি এখনও ইতিহাসের বই পড় চপলাদি?"

"ওই তো আমার একটি মাত্র নেশা। আমার লাইব্রেরিটা তোমাকে দেখাতে পারলে তুমি খুশি হ'তে—"

"কোথায় সেটা?"

"পাশের গাঁয়ে খেজুরেতে। ওইখানেই খান দুই ঘর নিয়ে থাকি আমি—"

"সেই জন্যেই বুঝি তোমায় খেজুরি বিবি বলে সবাই?"

চপলা মুচকি হাসিল। হঠাৎ কার্তিক সেই জিনিসটা দেখিতে পাইল যাহা এতক্ষণ তাহার দেখিতে পাওয়া উচিত ছিল এবং যাহা পূর্বে সে বহুবার দেখিয়াছে। পুনরাবিষ্কার করিল যেন ওটাকে। চপলার গালে টোল পড়ে।

"তাহলে তোমার মতে আমার গোপালদেব হওয়ার স্বপ্নটা হাস্যকর নয়?"

"মোটেই না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে তোমাকে। যদি নিখুঁত হতে চাও তাহলে গোপালদেব হতে চেও না। কারণ গোপালদেব হতে হলে জনতার কৃপা-ভিক্ষা করতে হবে, নিখুঁত লোকেরা কারও কাছে কখনও ভিক্ষা করে না কিছু। এই জন্যে তারা প্রায় অজ্ঞাত অখ্যাত থেকে যায়। জনতার হাতে পুরস্কার পেতে হলে তোষামোদ করতে হয়, তোষামোদ করতে হয়, অনেক সময় ঘুষ দিতে হয়, মুখোশ পরতে হয়—নিখুঁত লোকেরা তা পারে না। পৃথিবীর বড় বড় জননায়কদের ইতিহাস যদি পড় তাহলে তুমিও সেটা বুঝতে পারবে। তা বলে জননায়কেরা যে খেলো লোক তা বলছি না—রঙ্গমঞ্চের প্রতিভাবান অভিনেতাদের মতো ওঁরা মানুষের মনে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করে যুগকে যুগান্তরে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু আমার কাছে নিখুঁত লোকেরা নমস্য। ম্যারাট (Marat), ড্যান্টন (Danton), নেপোলিয়ন, হিটলারের চেয়ে নির্দোষ নিখুঁত মানুষ স্বরং আমার কাছে ঢের বড়। এখন বল তুমি কি হবে?"

এমনভাবে খেজুরি কথাগুলি বলিল যেন কার্তিকের ভবিষ্যৎ তাহার হাতের মুঠোর মধ্যে। সে যাহা চাহিবে তাহাই দিবে তাহাকে।

কার্তিক বলিল—"আমি নিখুঁতও থাকতে চাই গোপালদেবও হতে চাই।"

এমন সময় দ্বারপ্রান্তে সেই বোবা চাকরটা উঁকি দিয়া হাততালি দিল।

"স্বরং, তুমি ওঠ এবার। আমার খদ্দের এসেছে—"

"কিসের খদ্দের!"

"ব্যবসার, আবার কিসের?"

"কি ব্যবসা কর তুমি—"

যদিও সে ইহা আন্দাজ করিয়াছিল তবু প্রশ্নটা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু খেজুরি বিবি ইহার উত্তর দিল না। বলিল, "কাছেই আমি একটা বাড়ি ভাড়া করেছি সেখানেই তুমি যাও এই পিছনের দরজাটা দিয়ে। এদিকেও একটা দরজা আছে। সেখানে স্নানের ব্যবস্থা আছে, শোওয়ার ব্যবস্থাও আছে। রাখাল—"

একটি বিরাটকায় লোক পিছনের পর্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

"রাখাল এই বাবুকে আমার বাসায় নিয়ে যাও। ইঁনি আর ওঁর এক বন্ধু ওখানে থাকবেন রাত্রে। সব ব্যবস্থা করে দিও। ওঁদের একটা কুকুরও আছে—"

"আসুন।"

রাখাল কার্তিকের রং-মাখা মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। কার্তিক কিন্তু নড়িল না। রাখালকে বলিল, "তুমি বাইরে দাঁড়াও একটু, যাচ্ছি—"

রাখাল চলিয়া যাইতেই কার্তিক প্রশ্ন করিল আবার।

"তুমি কিন্তু আমার কথার জবাব দাওনি। কিসের ব্যবসা কর তুমি—"

"দেহ বিক্রি করি—"

স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল কার্তিক।

খেজুরি বিবি মুখ টিপিয়া হাসিল আবার। আবার তাহার গালে টোল পড়িল।

"ঘেন্না হচ্ছে?—"

নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল কার্তিক।

"ঘেন্না হওয়া স্বাভাবিক। কারণ ক'টা লোক সংস্কারমুক্ত। যারা প্রতিভা বিক্রি করে, যারা কর্মদক্ষতা বিক্রি করে, যারা অভিনয়-কৌশল বিক্রি করে, যারা গলার গান বিক্রি করে তাদের তোমরা সম্মান কর। কিন্তু যারা দেহ বিক্রি করে, এমন কি ওই শ্রমিকরা যারা নিজেদের দেহের পেশী নিংড়ে দিয়ে তোমাদের বাসনার খোরাক সরবরাহ করে তাদের তোমরা ঘৃণা কর। এইটেই রেওয়াজ। সংসারে সবাই কামোন্মত্ত, অথচ যারা কামের উপকরণ—তারা তোমাদের কাছে অস্পৃশ্য। এটা আশ্চর্য ব্যাপার, কিন্তু এই রেওয়াজ। তোমাকে দোষ দিচ্ছি না—আমাকে যদি ঘৃণা মনে কর, জোর করে তোমাকে কাছে টানতে চাই না—"

গোবাটা দ্বারপ্রান্তে ঘন ঘন আবার হাততালি দিতে লাগিল। কার্তিক পিছনের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল। বাহির হইয়া ভাবিল খেজুরি বিবির বাসায় আর যাইবে না। রূঢ় সত্যটা শুনিয়া তাহার কেমন যেন গা-ঘিন-ঘিন করিতেছিল। কেনা-বেচা লইয়াই সংসারের হাটে নানা ব্যবসায় নানারূপে জমিয়া উঠিয়াছে তাহা ঠিক, কসাইয়ের দোকান বা মেছুনীর দোকান আমাদের জীবনযাত্রার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহাও ঠিক—তবু একটা কসাই বা মেছুনীর সহিত ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করিতে মন কেন বিমুখ হইয়া ওঠে এই চুলচেরা তর্ক করিতেও তাহার যেন প্রবৃত্তি হইতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল—কেবলই মনে হইতেছিল—মস্ত বড় একটা ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। যেন একটা বহুমূল্য রত্ন পাঁকের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে—যেন

একটা চমৎকার ছবির গায়ে কে কালি ছিটাইয়া দিয়াছে—যেন একটা চমৎকার ফুলকে— ।

"ওদিকে নয়, বাবু এদিকে—"

রাখালের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে কার্তিক অবাস্তব স্বপ্নলোক হইতে রূঢ় বাস্তব লোকে নামিয়া আসিল।

"আমি ওখানে আর যাব না ভাবছি। আমাকে অন্য কোনও একটা জায়গা দেখিয়ে দিতে পার যেখানে রাতটা কাটাতে পারি ?"

"এখন তাতো আর হয় না বাবু। মাকে সে কথা বললেই পারতেন। এখন আপনি ওই বাসাতেই চলুন। তিনি যে হুকুম আমাকে দিলেন তা আমাকে তামিল করতেই হবে। আসুন, আমার সঙ্গে – "

"আমি যদি না যাই কি করবে তুমি—"

"পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যাব। একটা চীৎকার চেঁচামেচি হাঙ্গামা হবে। তা হোক, রাখাল তাতে ভয় পাবে না—"

রাখালের বিরাট বলিষ্ঠ চেহারার দিকে চাহিয়া এবং তাহার স্থির গম্ভীর উত্তেজনা-হীন কথাগুলি শুনিয়া কার্তিক অনুভব করিল তাহাকে যাইতেই হইবে। এই মেলার মাঝখানে এই অসুরের সহিত ধস্তাধস্তি করাটা নিষ্ফল। অশোভনও বটে।

"বেশ চল তাহলে— । কিন্তু আমার ওখানে যেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি যখন জেদ করছ, চল।"

রাখাল এ কথার কোনও উত্তর দিল না। কার্তিক তাহার অনুসরণ করিল, কিন্তু লজ্জায় মাথা কাটা যাইতে লাগিল তাহার। ক্ষোভে ধিক্কারে সমস্ত অন্তঃকরণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। দ্বিতল বাসাটিতে রাখাল যে ঘরে তাহাকে লইয়া গেল সেটি সুসজ্জিত। খাট বিছানা কাপড়ের আলনা আয়না গামছা তোয়ালে সব আছে।

"পাশেই চানের ঘর। টবে জল ভরা আছে।"

"আমার বন্ধু আনটো পুকুরে স্নান করতে গেছে, তার সঙ্গে আমার কুকুরটাও আছে—"

"দেখছি তাদের। আপনি চান টান সেরে পরিষ্কার হয়ে নিন। খাবারও আনছি।"

রাখাল চলিয়া গেল।

কার্তিক স্নানাহারের পর বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আনটো এবং লর্ডও নীচের একটা ঘরে ঘুমাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে কার্তিকের ঘুম ভাঙিয়া গেল হঠাৎ। বিছানায় উঠিয়া বসিল সে। দেখিল মাথার শিয়রে টেবিলের উপর একটা বাতি কমানো আছে। চপলা ফিরিয়াছে কি ? কাহারও সাড়াশব্দ তো পাওয়া যাইতেছে না। হঠাৎ একটা হাওয়া উঠিল। একটা জানলার পরদা সেই স্বল্পান্ধকারে ধীরে ধীরে নড়িতে লাগিল—মনে হইতে লাগিল একটা প্রেত যেন। তাহারই অতীত জীবনের প্রেত। অনেকক্ষণ বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিল সেদিকে। তাহার পর টেবিলের আলোটা বাড়াইয়া দিল। প্রেত একটা রঙীন ছিটে রূপান্তরিত হইল। আবার একবার শুইয়া পড়িল সে। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিল। ঘুম কিন্তু আর

আসিল না। চোখের সম্মুখে চপলার মুখটাই বারবার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। চপলাদি মেছুনীদের দলে ? হঠাৎ ডিকেন্সের 'এ টেল অব্ টু সিটিজ্' (A tale of Two Cities) পুস্তকের মাদাম ডিফারজ্ (Madam Defarge) চরিত্রটি তাহার মনে পড়িল। সে-ও মেছুনী ছিল। তাহার পর তাহার মনে পড়িল ডাস্টবিন হইতে কুড়াইয়া পাওয়া সেই উপন্যাসটার কথা। উঠিয়া ঝুলি হইতে সেটা বাহির করিয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

॥ ২ ॥

"পাগলা-গারদে বন্দী গোপালদেব দিবা-স্বপ্নে মগ্ন হইয়াছিলেন। বস্তুত এই বপ্নলোকেই যেন মুক্তি পাইয়াছিলেন তিনি।

সূত্রধার পুনরায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"ওই দেখুন সেই পাহাড়টি, ওই দেখুন সই বাণীমন্দির যার উদ্দেশ্যে অনলস আর অরূপ যাত্রা করেছিলেন, যার উদ্দেশ্যে নত্যকালের অনলস আর অরূপেরা যাত্রা করেছেন যুগ যুগ ধরে, যেখান থেকে ারংবার নানারূপে রূপান্তরিত হয়ে তাঁরা সত্য-শিব-সুন্দরের মহিমাকে উজ্জ্বলতর করেছেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায়—।"

সূত্রধার অন্তর্হিত হইলেন।

গোপালদেব জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ই আকাশপটেই তাঁহার স্বপ্ন মূর্ত হইয়া ওঠে। ইতিহাসের স্বপ্ন, তাঁহার বিক্ষত র্মের স্বপ্ন।

সেই পাহাড়টি আবার দেখা গেল। সেই শুভ্র বাণীমন্দিরটিও। দেখিলেন সেই ন্দির হইতে একজন দিব্যকান্তি পুরুষ বাহির হইলেন, আর তাঁহার পিছু পিছু কটি তন্বী সুন্দরী যুবতী নারী। যুবতীর মুখে সলজ্জ স্নিগ্ধ হাসি। তাহাতে যন একটু অপ্রতিভ ভাবও ফুটিয়াছে, একটু কৌতুকও।

পুরুষটির দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া তিনি বলিলেন—"মহারাণীর ইচ্ছায় অরূপ 'য়ে গেল মোহিনী নারী, আর তুমি অনলস হ'য়ে গেলে অমিতবীর্য ক্ষত্রিয় রাজকুমার। য়তো স্বপ্নের সঙ্গে কর্মের মিলন এবার অনিবার্য হ'য়ে উঠল। তুমি যদি ঝড়ের তো ছুটে যেতে চাও আমি হব সে ঝড়ের বেগ।"

পুরুষ-বেশী অনলস হাসিয়া উত্তর দিলেন—"তাই তো আমার কামনা। তবে কটা ভয় জাগছে মনে। তোমার মতো রূপসী মোহের মোহন শৃঙ্খলেও আমাকে বঁধে ফেলতে পারে। অনুরোধ করছি, তা যেন কখনও কোরো না।"

"মোহ সব সময়ে শৃঙ্খল হয় না। মোহও মানুষকে উদ্দীপ্ত করে। যশের মোহ, াফল্যের মোহ, অসম্ভবকে সম্ভব করবার মোহ—এ সবও মোহ, কিন্তু এসব মোহ নেক সময় কল্যাণকর। যে মোহ কল্যাণকর নয় তা দগ্ধ করবার ক্ষমতা মহারাণী ামাকে দিয়েছেন।..."

সহসা সেই তন্বী রূপসী অগ্নিশিখাবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দূরে বাজিয়া িঠল কাড়া-নাকাড়া-দামামা-ঢোল। পাহাড় এবং মন্দির অন্তর্হিত হইল। দেখা গেল

একটা বিরাট পথ বিসর্পিত রেখায় প্রান্তর ভেদ করিয়া দূরবর্তী একটা অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পথ ধরিয়া শোভাযাত্রা চলিয়াছে একটা। নানাবর্ণের পতাকায় সে শোভাযাত্রা সুশোভিত। প্রতি পতাকায় ফুলের মালা দুলিতেছে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে একজন বিরাটকায় ব্যক্তি একটি বিশাল তাম্রকলস মস্তকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন। তাম্রকলসের মুখে আম্রপল্লব। পাশাপাশি দুইটি তুরঙ্গম-পৃষ্ঠে সেই দিব্যকান্তি পুরুষ ও সেই তন্বী সুন্দরী মন্থরগতিতে চলিয়াছেন। দিব্যকান্তি পুরুষের মস্তকে গৈরিক উষ্ণীষ, পরিধানে রাঙ্গোচিত বসন ভূষণ। কোমর হইতে কোষানবন্ধ তরবারি ঝুলিতেছে, বাম স্কন্ধ হইতে বিলম্বিত হইয়া রহিয়াছে একটি তুরী। তিনি বাম হস্তে অশ্বের বল্গা ধরিয়া আছেন, দক্ষিণ হস্তে শোভা পাইতেছে গণ্ডার-চর্মনির্মিত পিত্তল-কারুকার্যময় একটি ঢাল। তাঁহার দৃষ্টি দূরে অরণ্যে নিবদ্ধ। তাঁহার সঙ্গিনীও রণসজ্জায় সজ্জিতা। তাঁহারও কোমর হইতে একটি কোষনিবদ্ধ তরবারি ঝুলিতেছে, পৃষ্ঠে বাঁধা রহিয়াছে শরপূর্ণ তূণ ও ধনু। মুখে অবগুণ্ঠন নাই। অঙ্গবস্ত্রেও কোন শিথিলতা নাই, রক্তবর্ণ অঙ্গচ্ছদ যেন অগ্নিশিখার মতো জ্বলিতেছে। তাঁহারও দৃষ্টি দূরে অরণ্যে নিবদ্ধ। কিন্তু সে দৃষ্টি স্বপ্নময়।

সূত্রধার প্রবেশ করিলেন।

নমস্কারান্তে বলিলেন—"সৃষ্টির চিরন্তন প্রেরণা বুকে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন অনলস আর অরূপ যুগল মূর্তির অনবদ্য মহিমা বিকিরণ করে। ওই অরণ্য তাঁদের কর্মভূমি। ওই অরণ্য কেটে আদর্শ নগর বসাবেন তাঁরা। অরণ্যের প্রান্তভূমিতে যজ্ঞ হবে। মহাকাল স্বয়ং ওই তাম্রকলসে যজ্ঞের হবিঃ বহন করছেন। ওই অরণ্যে নর-রাক্ষসেরা বাস করে, আর বাস করে তাদের বাধ্য হিংস্র পশুর দল। ওদের অত্যাচারে সন্নিহিত সভ্য জনপদবাসীরা সন্ত্রস্ত, জর্জরিত। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন কর্মঠ বীরপুরুষ অনলস আর তাঁকে প্রেরণা যোগাচ্ছেন নারী-রূপিণী অরূপ। তিনিই অনলসের শক্তির উৎস। ইতিহাসে কি তাঁদের নাম আছে? জানি না। ইতিহাসের কথা ইতিহাসের কাছেই শুনুন।"

সূত্রধার অন্তর্হিত হইলেন। অরণ্যও দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল। শোভাযাত্রাও নিশ্চিহ্ন হইল। দেখা গেল এক প্রস্তর মঞ্চের উপর একজন সৌম্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বসিয়া আছেন। তাঁহার হস্তে এক গোছা ভূর্জপত্র। ভূর্জপত্র হইতে তিনি পড়িতে লাগিলেন—

"সব দেশের অতীত ইতিহাসের মতো বাংলা দেশের অতীত ইতিহাসও অন্ধকারাচ্ছন্ন। অরণ্যের সহিত ইহার তুলনা করা চলে, হয়তো প্রাগৈতিহাসিক যুগে অরণ্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না, কিন্তু মানুষের ইতিহাসও অতি প্রাচীন। অতি প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগেও বাংলাদেশে মনুষ্যদেরই বসবাস ছিল। তখন এদেশে যে মনুষ্যরা বাস করিত তাহাদের মধ্যে হয়তো পশু-প্রকৃতির অত্যাচারী লোকের অসম্ভাব ছিল না, কিন্তু অতি প্রাচীন যুগের ইতিহাসে আমরা প্রমাণ পাই সে যুগে সভ্য মানুষও বাস করিত। সম্ভবত নানা দেশের সভ্যতার সংঘর্ষে নানাদেশের মানুষের সংস্পর্শে অতি প্রাচীন বাংলা দেশেও একটা সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে সভ্যতার যাহারা ধারক ও বাহক ছিল তাহারা অবশ্য আর্য নহে। আর্যরা বহুদিন পরে বহু কষ্টে বাংলা দেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণের বিশ্বাস এখন

হাদের আমরা অন্ত্যজ জাতি বলি—কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, বাগদী, ়ার, চন্ডাল প্রভৃতি—ইহাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন বাংলা দেশের আদিবাসী। জ্ঞানিকগণ এই মানবগোষ্ঠিকে অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা অষ্ট্রিক আখ্যা দিয়াছেন। কেহ হ ইহাদের নিষাদ জাতিও বলিয়াছেন। এই নিষাদরা প্রধানত কৃষিজীবী ছিল। হারা নব্যপ্রস্তর যুগের লোক। কিন্তু তাহারা তাম্র ও লৌহের ব্যবহার জানিত। তল ভূমিতে এবং পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে তাহারা ধান চাষ করিত। পান পারির ব্যবহার জানিত তাহারা। অনেকের মতে কলার চাষও তাহারা করিত। ধু কলা নয়, তাহারা নানারকম সবজিও ফলাইত। তাহারা গরু চরাইত না, ুর দুধও পান করিত না। কিন্তু মুরগী পুষিত, হাতীকে পোষ মানাইতে রিত। কুড়ি হিসাবে হিসাব করিতেও তাহারা জানিত। তাহারাই সম্ভবত চন্দ্রের দবৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া তিথি মাস এদেশে প্রচলিত করে। ইহাদের সহিত পরে দ্রাবিড় ষা-ভাষী ও আলপাইন শ্রেণীভুক্ত এক জাতি আসিয়া মিলিত হয়। কেহ কেহ বলেন ্কৃতি নিগ্রোবটু জাতিও আসিয়া এদেশের আদিবাসীদের সহিত মিশিয়াছিল। মোট া বহু জাতির সম্মেলনেই বাঙালী জাতির সৃষ্টি। পৃথিবীর প্রায় সব জাতিরই তহাস এই। অবিমিশ্র কোন 'বিশুদ্ধ' জাতি ধরাপৃষ্ঠে নাই। এ কথা স্মরণযোগ্য এই বাঙালী জাতি অসভ্য ছিল না। আর্যধর্মের সহিত তাহাদের ধর্মের মিল ছিল , কিন্তু তবু তাহাদের অধার্মিক বলিব না। তাহাদের একটা নিজস্ব ধর্ম ছিল। হারা শিব, শক্তি ও বিষ্ণুর আরাধনা করিত। বৃক্ষ প্রস্তর পর্বত অরণ্যও তাহাদের রাধ্য ছিল। অনেক পশু-পক্ষীকেও তাহারা দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিত। তাহাদের রাণ ছিল, ব্রত-আচার ছিল। বিবাহ ক্রিয়ায় তাহারা হলুদ এবং সিন্দুর ব্যবহার রত। শিল্প-প্রতিভাও ছিল তাহাদের। নৌকা-নির্মাণে নিপুণ ছিল তাহারা। হারাই যে ধুতি শাড়ি এবং অন্যান্য পরিচ্ছদের উদ্ভাবক একথাও অনেক ঐতিহাসিক ীকার করিয়াছেন। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে আর্যরা বাংলা দেশে আসেন। বাংলা শ জয় করিয়া আর্য সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। আর্যদের সহিত ানীন্তন বঙ্গদেশবাসীর যে সব সংঘর্ষ হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ ়থাও নাই। আর্যদের লিখিত পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ যাহা মরা পাঠ করি তাহা হইতে এইটুকু শুধু অনুমান করা যায় যে আর্যগণ আদিম াবাসীদের সুচক্ষে দেখিতেন না। তাঁহারা তাঁহাদের কাব্যে পুরাণে বঙ্গবাসীদের ়র, পাপাশয়, রাক্ষস, পক্ষী প্রভৃতি নিন্দাসূচক নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ়তপক্ষে তাঁহারা সভ্য ছিলেন, বর্বর বা রাক্ষস ছিলেন না। অবশ্য ইহাও সত্য ়ারা আত্মরক্ষার জন্য এবং নিজেদের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আর্যদের নানা-ব বিরতও করিতেন। আর্যগণ বঙ্গদেশে অবশেষে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন বটে, ন্তু মনে হয় যাহাদের তাঁহারা অনার্য বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন তাহারা সম্পূর্ণ পক্ষিত হয় নাই। তাহাদের বৈশিষ্ট্য বারম্বার আর্যসভ্যতার উপর নিজেদের ছাপ ধয়া গিযাছে। বৌদ্ধধর্মের যে পরিণতি সহজিয়া ধর্মে মূর্ত হইয়াছিল তাহা মনে এইরূপ একটি ছাপ। বাগদী রাজা, লুইপাদ, ডোম্বিনী প্রভৃতির প্রভাব সাহিত্যে : স্পষ্ট দেখা যায়। হিন্দু দেবদেবী প্রতিমার ভিতর বাহন রূপে পশু-পক্ষীর দাও সম্ভবত 'অনার্য' প্রভাব। বিল্ব, বট, তমাল, অশোক, কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষও

আর্য হিন্দুদের নিকট পবিত্র। তুলসী গাছ হিন্দুদের ঘরে ঘরে। 'মানত' কর মাদুলী পরা, তুকতাকে বিশ্বাস করা—এ সবই সম্ভবত সেই আদিবাসীদের ধর্মে অঙ্গ। বাঙালীর ইতিহাসের আদিপর্বে গোপালদেব বিখ্যাত নাম। তিনি পা বংশের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি মাৎস্যন্যায়ের যুগে সর্বসম্মতিক্রমে গণতন্ত্র স্থাপ করিয়াছিলেন। তিনি কি আর্য ছিলেন? তাঁহার পিতার নাম ছিল বপ্যট, স্ত্রী নাম ছিল দেদ্দা। এই নাম দুইটি কিন্তু বিশুদ্ধ আর্য নাম বলিয়া মনে হয় না গোপালদেব বৌদ্ধ ছিলেন। সে যুগে যাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদে অধিকাংশই অনার্য ছিলেন। এই বৌদ্ধ ধর্মের যে রূপটা জনপ্রিয় হইয়াছিল তা তাহার 'সহজিয়া' রূপ। কেহ কেহ বলেন গোপালদেব ক্ষত্রিয় সৈনিক ছিলেন। বৌ ছিলেন অথচ ক্ষত্রিয় সৈনিক ছিলেন—কথাটা কেমন যেন গোলমেলে শোনায়। অথ তিনি আবার এতটা জনপ্রিয় হইয়াছিলেন যে সর্বসম্মতিক্রমে সকলে তাঁহাকে গণতন্ত্রে নেতারূপেও নির্বাচিত করিয়াছিল। এই বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ কি? যদি ম করা যায় যে যোদ্ধা হইলেও তিনি আদি বঙ্গবাসীদেরই বংশধর ছিলেন এবং সহজি মতের বৌদ্ধ ছিলেন তাহা হইলে কিছুটা বোধগম্য হয়। ইহা হওয়া অসম্ভব নয় ইতিহাসে ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই। গোপালদেবের গোপাল নামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বা রাখালের কোনও সম্পর্ক ছিল কি? ইতিহাসে বলে, আদি বঙ্গদেশ-বাসী গরু চরাইত না, গরুর দুধ খাইত না। হয়তো অতি প্রাচীনকালে ইহা সত্য ছিল, কি গরুর মতো একটি উপকারী জীবকে কৃষিজীবী বাঙালী আদিবাসীরা যে বেশী দি উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিল এ কথা অবিশ্বাস্য। সুতরাং, অনার্য হওয়া সত্ত্বে গোপালদেবের 'গোপাল' নাম হয়তো অস্বাভাবিক নহে। অনার্যেরা বিষ্ণুর পূ করিত (বিষ্ণু কৃষ্ণেরই নামান্তর) তাহা ইতিহাসে লেখা আছে। গোপালদেবে পিতামহের নাম ছিল 'দয়িতবিষ্ণু' তিনি সর্ববিদ্যা-বিশুদ্ধ ছিলেন। বরেন্দ্রভূমি তাঁহাদের আদিনিবাস ছিল, কিন্তু তাঁহারা আর্য ছিলেন, না, অনার্য ছিলেন এ বিষ ইতিহাস স্পষ্ট ভাষায় কিছু বলে না। আর একটা প্রশ্ন মনে জাগে। গোপালদেবে কৌলিক উপাধি কি? দেব? তাঁহার পিতা বা পিতামহের নামের শেষে দেব উপ দেখা যায় না। গোপালদেব যে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে পা সাম্রাজ্য নামে খ্যাত। 'পাল' উপাধি দেখিয়াও সন্দেহ হয় গোপালদেব সম্ভ অনার্যই ছিলেন। এ সমস্তই অবশ্য অনুমান। গোপালদেবের সম্বন্ধে বিশেষ বি নিঃসংশয়ে জানা যায় না, ইহাই সত্য কথা। আমি যে কথা বলিবার জন্য এই ভূমি করিলাম তাহা এই যে আদিম বঙ্গবাসীরা—যাহাদের আর্যগণ অনার্য বর্বর প রাক্ষস প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছিলেন—তাহারা কখনই সম্পূর্ণ অবলুপ্ত নাই। নানাভাবে তাহারা ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। হয়তো গোপালদেব পাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা রূপান্তরিত অনার্যদেরই সাম্রাজ্য। এ ঘটনা ইতিহাসে বারংবার ঘটিয়াছে। অতি আধুনিক যুগের ইতিহাসেও ইহার উদাহ আছে। 'আউল' 'বাউল' সম্প্রদায়, সুফীগণ, দাদু-কবীর-নানকপন্থীরা কেহই ত ধর্ম অনুসরণ করে না—তাহারা যে ধর্ম অনুসরণ করে তাহা নিতান্তই ব্যক্তি 'মরমিয়ার' পথ, যে পথে গুরুই পথপ্রদর্শক—হয়তো তাহা সেই পথ যে পথে আ বঙ্গবাসীরা একদা চলিত—যাহা তন্ত্রে শাক্তপূজায়, বৈষ্ণব লীলায় নানাপ্র

পান্তরিত হইয়া সমাজে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, জাতিভেদের মূলে
হারা এখনও কুঠারাঘাত করিয়া চলিয়াছে, যাহার বাহিরের চেহারা হয়তো আধুনিক,
ন্তু আসলে যাহারা আদিম। ইংরেজের আমলেও এ ঘটনা ঘটিয়াছে। সাধারণ
হ্মসমাজ, নববিধান সমাজ, আর্যসমাজ প্রভৃতি ধর্ম-প্রতিষ্ঠানে জাতিভেদকে চূর্ণ-
চূর্ণ করিবার যে উদ্যম দেখা গিয়াছিল তাহার মধ্যেও অবহেলিত ঘৃণিত 'একঘরে'
নার্যদের পুনরভ্যুদয়ের আভাস পাওয়া যায়। অসবর্ণ বিবাহ আইনত স্বীকৃত হইবার
র এবং ইংরেজী আমলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অর্থকৌলিন্যই সমাজে প্রাধান্য লাভ করিলে
াচীন সমাজ ব্যবস্থা শিথিল হইয়া গেল। তথাকথিত নীচুবংশীয়া কন্যারা উচ্চ
লীন বংশের কুলবধূরূপে স্বীকৃত হইতে লাগিলেন। অর্থাৎ তথাকথিত অনার্যদের
ন্যায় আবার চতুর্দিক ভাসিয়া গেল এবং অনেকের ঘরেই সে বানের জল ঢুকিল। এখনও
কতেছে। ইহা রোধ করিবার উপায় নাই। সম্ভবত রোধ করিবার চেষ্টা নিরর্থকও।
রণ হিন্দুধর্মের আদর্শ অতি উচ্চ। তাহা ক্ষুদ্র ভেদাভেদ লইয়া মাথা ঘামায়
। তাহার সাধনা প্রেমের সাধনা, যে প্রেম মৃন্ময়ীর মধ্যেও চিন্ময়ীকে প্রত্যক্ষ করে,
সাধনার সিদ্ধি ভগবান লাভে। ভগবান লাভই মানব জীবনের উদ্দেশ্য, যে কোনও
র্মমত অনুসরণ করিয়া ভগবান লাভ করা যায়। কেহই ছোট নয়, কারণ সকলেই
গবানের অংশ, সকলেরই অন্তরনিবাসী আত্মা নিষ্কলুষ—এই যদি হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠ
দর্শ হয় তাহা হইলে আর্য অনার্য, নীচ উচ্চ এসব বিচার নিরর্থক। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে
র এ যুগের অবতার বলিয়া গণ্য করা হয় তাহা হইলে মানিতে হইবে যে তিনি পূর্ণ
নুষ্যত্বকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়াছেন, কোন বিশেষ জাতি বা ধর্মমতকে নহে। আমি
রণ্যের কথা লইয়া প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছিলাম, অরণ্যের কথা দিয়াই শেষ করি।
রণ্য আমাদের চতুর্দিকে এখনও আছে। সে অরণ্য তামসিকতার অরণ্য। সে
রণ্যের বিবরণ আপনারা কবির নিকট শুনিবেন। কবি আসিতেছেন। আমি
লাম—"

ইতিহাস অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার প্রস্তর-আসনও মেঘের মতো মিলাইয়া গেল।
োপালদেব দেখিলেন শুভ্র একটি মেঘের নৌকায় কবি আসিতেছেন। গোপালদেবের
ন হইল অসম্ভব সম্ভব হইতেছে, স্বপ্ন বাস্তবের রূপ ধরিতেছে। আভিজাত্যের
র্বতশিখরে যে গজদন্ত-নির্মিত প্রাসাদে তিনি বাস করিয়াছেন সেই পর্বত এবং
সাদও মেঘের মতো উড়িয়া যাইতেছে যেন।

আপাতদৃষ্টিতে কবি তরুণ নহেন, বৃদ্ধ। তাঁহার শুভ্র দাড়ি, শুভ্র চুল। মুখে
ন্তু জরার চিহ্ন নাই। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ ও স্বপ্নময়। মুখ-ভাবে তারুণ্যের দীপ্তির
ত বার্ধক্যের অভিজ্ঞতার একটা অপূর্ব মণি-কাঞ্চন সমন্বয় হইয়াছে। দেখিতে
খতে কবির চারিদিকে মহীরুহ-সমাকীর্ণ এক বিশাল অরণ্য মূর্ত হইয়া উঠিল।
রুহ একরকম নহে। কোনটা শ্যামপত্রাচ্ছাদিত, কোনটা ফুল-ফল সমন্বিত, কোনটা
মৃত, কোনটা একেবারে মরিয়া গিয়াছে, কঙ্কালটা দাঁড়াইয়া আছে কেবল। মৃত
ালের সংখ্যাও কম নহে। ছোটবড় নানা আকারের প্রস্তরও রহিয়াছে নানা রকম।
ন্ত প্রকম্পিত করিয়া শ্বাপদ পশুরা চীৎকার করিতেছে। তৃণভোজী ভীরু মেষ-
গরা দলে দলে প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু কীট পতঙ্গ,
ানারূপ বিচিত্র-পক্ষ পক্ষীরও অভাব নাই সে অরণ্যে। তাহারাও পরস্পরকে শিকার

করিতে ব্যগ্র। সকলেই সকলের শত্রু। অরণ্যে মনুষ্য নাই। সেই মনুষ্যশূন্য অরণে একটা শঙ্কা যেন সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে। একটা অন্ধকার যেন চতুর্দিক আচ্ছ করিয়া রাখিয়াছে।

কবি কথা কহিলেন। মনে হইল বাঁশী বাজিয়া উঠিল।

"আমি যা দেখছি, আমি যা অনুভব করছি, যে সম্ভাবনার স্বপ্নে আমি আকু হয়ে আছি তাই আমি শুধু বলব। চারিদিকে এই যে অরণ্য দেখছেন, আপাতদৃষ্টিতে এরা অরণ্য মনে হলেও আসলে এটা অরণ্য নয়। এ বিরাট একটা মনুষ্যসমাজ রূপকথায় শুনেছিলাম যক্ষিণীর প্রভাবে মানুষেরা নাকি পাথরে গাছে পশুতে রূপান্তরিত হয়ে ছিল। এখানেও তেমনি এক যক্ষিণীর প্রভাব অনুভব করছি আমি এক যক্ষিণীই বিরাট মনুষ্যসমাজকে বিরাট অরণ্যে পরিণত করেছে। অরণ্যে স্বাভাবিক সৌন্দর্যও এই অরণ্যে নেই, কারণ এ অরণ্য স্বাভাবিক অরণ্য নয়। যক্ষিণী মায়া-কৌশলে এর রূপ স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে নি। যক্ষিণীর নাম তামসিকতা। তার প্রভাবে জীবন্ত মনুষ্যসমাজ ম্রিয়মাণ অরণ্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু একথা ভুলে চলবে না যে একদা এর অতীত উজ্জ্বল ছিল। সমস্ত জগৎ যখন অন্ধকাবাচ্ছন্ন তখ এইখানেই জ্ঞানের দীপ জ্বলেছিল একদিন। আবার সমস্ত জগতে অন্ধকার নামে আবার জ্ঞানের দীপ জ্বলবে এখানে। আমি জানি এর ভবিষ্যতও সমুজ্জ্বল কিন্তু ভবিষ্যতকে সমুজ্জ্বল করবেন কে? যিনি করবেন তিনি আসবেন উর্ধ্বলোক থেকে তিনি আবির্ভূত হবেন। পৃথিবীর বহু ঊর্ধ্বে যে স্বচ্ছ নির্মল আকাশ আছে, যে আকাশে নক্ষত্রের আলো স্পন্দিত হয়, নীহারিকারা স্বপ্ন দেখে, সেই আকাশেই তিনি আছেন সেখান থেকেই তিনি আসবেন। সৃষ্টির প্রথম পুরুষ হিরণ্যগর্ভই যুগে যুগে অবতর করেন সেখান থেকে নানা রূপে, সেই চিরন্তন স্বপ্নের বাস্তব মূর্তি ধারণ করে নিজেকে বিকশিত করেন মানবসমাজে, যে স্বপ্নের বাঙ্ময়রূপ 'সত্যমেব জয়তে'। সত্য-শিব-সুন্দরকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যেই তিনি আসেন। নানা চিত্র আছে তাঁর পুরাণে ইতিহাসে। কখনও শ্রীরামচন্দ্ররূপে তিনি রাক্ষসনিধন করছেন, কখনও শ্রীকৃষ্ণরূপে উৎসাহিত করছেন অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধে অগ্রসর হবার জন্য, কখনও তিনি আচণ্ডা ব্রাহ্মণকে প্রেমালিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করেছেন শ্রীচৈতন্যরূপে, তিনিই শঙ্কররূপে অদ্বৈতবাদের শাণিত তরবারি হস্তে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন অধঃপতিত বৌদ্ধদে সঙ্গে। কাব্যে ও ইতিহাসে তাঁর অনেক রূপ, অনেক ছবি। বাইরের দিক থেকে দেখলে সে ছবিগুলি বিভিন্ন, একটার সঙ্গে আর একটার মিল নেই। রাজা গোপালদেবে জীবন-চরিতের সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রর জীবনচরিতের ঘটনাগত মিল নেই অগ্নিযুগের যে বীরেরা স্বাধীনতার জন্য কারাগারে ফাঁসিকাঠে, দ্বীপান্তরে প্রা বিসর্জন করেছিলেন তাদেরও বাইরের চরিত্র-চেহারা সব আলাদা আলাদা। কিন্ত তাদের অন্তরের দিকে কান পেতে শুনুন—সকলেই সেই এক মন্ত্র জপ করছে, সত্য শিব-সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমি জানি এই মহাঅরণ্যেও সত্য-শিব-সুন্দ আবার প্রতিষ্ঠিত হবেন। যে দেশের অতীত এত মহান যে দেশের মাটিতে যুগে যুগে মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেছেন—এই সেদিনও যে দেশের মাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগরের উদ্ভব হয়েছিল, যে দেশে রবীন্দ্রনাথ গান গেয়েছেন শহীদরা প্রাণ দিয়েছেন সে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়। আলো আসবে। এই অর

তখন সভ্য মানবসমাজে রূপান্তরিত হবে। এই অরণ্যের অন্তরালে মনুষ্যত্ব চাপা আছে, সে আচ্ছাদন একদিন সরে যাবে। এই যে পুষ্পসমন্বিত বিরাট মহীরুহ দেখছ, এ গাছ নয়, এ মানুষ। তামসিকতা-যক্ষিণীর প্রভাবে ওর এই দশা হয়েছে। কিছু ফুল ফোটাচ্ছে, কিছু ফলও ফলাচ্ছে, কিন্তু চিরকালই একরকম ফলাচ্ছে। বৈচিত্র্য নেই। বৈচিত্র্যহীনতা মৃত্যুর নামান্তর। তাছাড়া এরা এক স্থানেই প্রোথিত হয়ে আছে, নড়ছে না। তা-ও একরকম মৃত্যু। এদের শেষ পরিণতি ওই দেখ। অতীতের কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কোনও গাছে আর প্রাণ নেই, আর ফুল ফুটছে না, ফল ফলছে না, পাতাও শুকিয়ে গেছে, ওদের ডালে ডালে নব কিশলয়ের উৎসব আর জাগে না। আলো যখন আসবে, যক্ষিণী যখন অপসারিত হবে তখন এরাও নবজীবন লাভ করবে। পূর্ণ মানুষ সৃষ্টিকর্তা, সে নিত্যনূতন সৃষ্টি করে, সে প্রগতিশীল, এক জায়গায় অনড় হয়ে থাকে না, সে চলে, এগিয়ে যায়। এরাও মানুষ হবে, এদের নব নব কীর্তি নিত্যনূতন বৈচিত্র্যে জগতকে আবার মুগ্ধ করবে। ওই যে ক্ষুদ্র বৃহৎ পাথরগুলি দেখছ, ওরাও পাথর নয়, ওরাও মানুষ, তামসিকতার চরম প্রভাব ওদের প্রস্তরে পরিণত করেছে। ওরা অনড়, অচল, মূক, বধির হয়ে গেছে। ওরা রৌদ্রে উত্তপ্ত হয়, হিমানীপাতে শীতল হয়, ঝঞ্ঝার তাণ্ডব ওদের উপর দিয়ে ব'য়ে যায়, ওদের উপর ধুলো জমে, মরা পাতার শবস্তূপে ওরা ঢাকা পড়ে যায়, কিন্তু তবু ওরা বিচলিত হয় না, প্রতিবাদ করে না। ওরা নির্বিকার মহাপুরুষ নয়, ওরা সমাধিস্থ যোগীও নয়, ওরা মৃত, প্রাণস্পন্দনহীন। ওরা স্থাণু কিন্তু শিব নয়। ওরাও মানুষ হবে একদিন, ওরাও জাগবে। কল্পনা কর, এতগুলি প্রস্তর যদি মানুষ হয়, আর তাদের দৃঢ়তা যদি প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠে, সে কি অপরূপ রূপান্তর হবে। ভবিষ্যতে অসত্য, অশিব এবং অসুন্দরের সঙ্গে সত্য শিব ও সুন্দরের যখন যুদ্ধ হবে—হবেই, যুগে যুগে হয়েছে,—তখন এরাই হবে সে যুদ্ধের দৃঢ়চিত্ত সৈনিক। আর ওই যে শ্বাপদেরা গর্জন করছে ওরা পাথরের চেয়ে উন্নত বটে, কিন্তু ওরাও তামসিকতার আর এক প্রকাশ। ওদের মধ্যে কেবল সামান্য কিছু রাজসিকতা জেগেছে, যে রাজসিকতার লক্ষ্য আত্মসুখভোগ। নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ, নিজের ক্ষুধা-পিপাসাই এখন ওদের জীবনের নিয়ামক। তার বাইরে ওরা আর সব কিছুকে নিরর্থক বলে মনে করে। ওরাও মানুষ হবে, ওরা মানুষ হলে ভোগী বীর হবে, বীর্যবলে বসুন্ধরাকে ভোগ করবে ওরা, আর ওরাই হবে সেই আদর্শ ক্ষেত্র যেখানে আধ্যাত্মিকতার বীজ পড়লে ভালো ফসল ফলবে। ওদের মধ্যেই জন্মাবে রাজা জনক। সবই হবে যক্ষিণী তামসিকতার প্রভাবমুক্ত হলে। যে মহাপুরুষের আবির্ভাবের ফলে এই অনিবার্য ঘটনা ঘটবে তাঁর স্বরূপ কেমন হবে তা কি আমরা কল্পনা করতে পারি? কল্পনার ভাণ্ডারে অনেক রং, সে রং দিয়ে আমি অনেক রকম ছবি আঁকতে পারি, কিন্তু সে ছবি যে ভবিষ্যৎ-যুগের ত্রাতার ছবি হবেই এমন ভরসা দিতে পারি না। নিখিল বিশ্বের কবি মহাস্রষ্টার চিত্রশালায় সে ছবি আঁকা হচ্ছে। তিনি নিজেকেই প্রকাশ করবেন একদিন অভিনব শিল্পশৈলীর মাধ্যমে। অবতীর্ণ হবেন যথাসময়ে। পুরাণে পড়েছি, দশ যুগে দশ অবতার হয়েছিলেন। কূর্ম বা বরাহ অবতারের সঙ্গে বুদ্ধ অবতারের কিছুমাত্র মিল নেই। কোনও অবতারের সঙ্গে কোনও অবতারের সাদৃশ্য থাকলেই সেটা বিস্ময়ের কারণ হ'ত, মহাকবি পরমেশ্বরের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের

নিপুণতায় সন্দেহের ছায়া পড়ত। তাঁর বিশাল চিত্রশালায় প্রত্যেকটি ছবিই অনন্য, তাঁর বিরাট কাব্যে একরকম সুর দুবার বাজে নি। তাই এটা আশা করা অসংগত নয়, ভবিষ্যতে যিনি অবতাররূপে অবতীর্ণ হবেন তিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের মতো হবেন না। আলাদা কিছু হবেন। তুমি গোপালদেবের কথা ভাবছিলে, কিন্তু এটা ঠিক, তিনি গোপালদেবের দ্বিতীয় সংস্করণ হবেন না। ভগবানের সৃষ্টিতে পুনরাবৃত্তি নেই। দুটি যমজের মধ্যেও সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকে। তবে একটা কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, তিনি প্রাণবন্ত প্রেমিক হবেন। প্রেম দিয়েই অধঃপতিতকে উদ্ধার করা যায়। অবতাররা যুগে যুগে তাই করেছেন, ভবিষ্যতে যিনি আসবেন তাঁকেও তাই করতে হবে। তিনিও কোনও পাপকে ঘৃণা করবেন না, কোনও অন্যায়ের সঙ্গেও আপোষ করবেন না। কিন্তু তিনি বুঝতে পারবেন সব কার্যেরই কারণ আছে, সব অন্যায়েরও কারণ আছে, সব পাপের জন্য পাপীরা দায়ী নয়, দায়ী পারিপার্শ্বিক সমাজ এবং পরিবেশ। তাঁর স্বচ্ছ উদার দৃষ্টিতে এসবই প্রতিভাত হবে, তাঁর বিচারের নিকষে আসল সোনা চেনা যাবে, তাঁর প্রেমের স্পর্শমণির স্পর্শে অনেক লোহা সোনা হয়ে যাবে। সর্বযুগের নেতাদের চরিত্রে এসব গুণ ছিল ভবিষ্যৎ নেতার চরিত্রেও এসব গুণ থাকবে, কিন্তু তার প্রকাশ ঘটবে অভিনব উপায়ে, সেইখানেই দেখা যাবে সৃষ্টিকর্তার অনন্যতা। আরও কয়েকটা গুণ থাকবে সে নেতার। তিনি তেজস্বী হবেন, বীর্যবান হবেন, বলবান হবেন, ওজস্বী হবেন, অন্যায়দ্রোহী হবেন, সহনশীল হবেন। বাজসনেয় সংহিতার প্রার্থনার আকাঙ্ক্ষা ভগবান পূর্ণ করবেন সেই অনাগত নেতার চরিত্রে, বিগত নেতাদের চরিত্রে যেমন করেছিলেন। বলাবাহুল্য এসবেতেই অনন্যতা থাকবে। একটি কথা কিন্তু বিশেষভাবে বলতে চাই। বাজসনেয় সংহিতার ঋষি যে প্রার্থনাটি ভগবানকে জানিয়েছিলেন তার শেষ কথা হচ্ছে, 'সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি'। তুমি সহ্যশক্তি-স্বরূপ আমাকেও সেই সহ্যশক্তির উপর স্থাপন কর। অবতারদের বা নেতাদের এই সহ্যশক্তি অফুরন্ত থাকা চাই। তরুর মতো সহিষ্ণু হ'তে হবে তাঁকে, তবেই সিদ্ধির পুষ্প ফুটবে তাঁর জীবনে। সে পুষ্পও হয়তো লোকে ছিঁড়ে নেবে, তবু স্থির হয়ে থাকতে হবে তবে আর একটি পুষ্প ফুটবে। স্থির হয়ে অপেক্ষা করলেই ফুল ফোটে। আমি কল্পনানেত্রে দেখতে পাচ্ছি, অবর্ণনীয় বর্ণসমারোহে আকাশগঙ্গার জ্যোতির্ময় সম্ভাবনা-স্রোতে আগামী যুগের নায়ককে রূপায়িত করছেন মহাশিল্পী সৃষ্টিকর্তা তাঁর উপাদান সনাতন, কিন্তু প্রকাশ হবে অভিনব। চিরন্তন স্বপ্নই নূতন নায়কের চক্ষে লাগাবে নূতন অঞ্জন, নূতন সুর তাঁর কণ্ঠে বাজবে যা অতীতের দুঃখীর দুঃখে কেঁদেছে আর উদাত্ত সুরে বলেছে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত।...

দ্বারপ্রান্তে শব্দ হইল।

কবি অন্তর্হিত হইলেন।

সিভিল সার্জন আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

"কেমন আছ গোপাল ?"

"ভালোই আছি। স্বপ্ন দেখছি নানারকম—"

"কিসের স্বপ্ন ?"

"নানারকম স্বপ্ন। আমার বিদ্যা বুদ্ধি কল্পনা স্বপ্নরূপে দেখা দিচ্ছে এসে

সারাজীবন ধরে যে ছবিটা এঁকেছিলাম বর্তমান যুগের ঝোড়ো হাওয়ায় সেটা ছিঁড়ে গেল। নূতন আর একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করছি মনে মনে—"

তাহার পর সহসা থামিয়া প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা, আমাকে তুমি কি পাগল মনে কর—"

স্নরেশবাবু হাসিয়া বলিলেন—"মানুষমাত্রেই একটু আধটু পাগল। কম বেশী ছিট সকলেরই আছে। আর আছে বলেই মানুষ এত সুন্দর। যাদের মধ্যে কোন পাগলামি নেই তাদের স্বাদগন্ধ বৈচিত্র্য কিছুই নেই, তারা পশুর মতো। তোমার পাগলামির জন্যেই তোমাকে ভালোবাসি।"

"প্রমাণ তো পাচ্ছি না। পাগলা গারদে এনে আটকে রেখেছ।"

"তুমি রেগে মেগে যা কান্ড করেছিলে। আমি টেম্পরারী ইনস্যানিটি বলে একটা ভালো ঘরে এখানে তোমাকে রেখেছি, তা নাহলে তোমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরে রাখত। মকোর্দমা হত, নানা কান্ড হত। তোমার স্ত্রী নালিশ করলে জটিল মকোর্দমা হ'তে পারত, কিন্তু তিনি নালিশ করবেন না। তুমি তাঁকে চিনতে পেরেছ কি না জানি না, কিন্তু আমি চিনেছি। খুব উঁচুদরের স্ত্রীলোক তিনি। তোমার উদ্যত তলোয়ারের মুখে ঘাড় পেতে দিয়ে ছেলেকে বাঁচিয়েছিলেন। অথচ তোমার প্রতিও তাঁর অগাধ ভক্তি দেখলাম, তোমাকে দেবতা মনে করেন—"

"কি করে বুঝলে সেটা—"

"খবর পেয়ে হাসপাতালে পুলিশ এসেছিল। উনি বললেন, আমার স্বামী দেবতা। ওর কোনও দোষ নেই। দোষ আমারই। নিজের দোষেই আমি আঘাত পেয়েছি। আমার কোন নালিশ নেই। এ শুনে পুলিশ চলে গেল।"

গোপালদেব নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর প্রশ্ন করিলেন—"কেমন আছে সে।"

"ভালো আছে। হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ (discharge) করে দিয়েছে। স্কিন-ডীপ (skin-deep) উন্ড (wound) হয়েছিল। সেরে গেছে একেবারে। ঘাড়ে একটা দাগ থাকবে অবশ্য। তোমার বীরত্বের কীর্তি—"

"বাড়িতেই আছে এখন?"

"তোমার বাড়িতে উনি যান নি। মগনলাল সস্তায় একটা ভালো বাড়ি দেখে দিয়েছে, সেইখানেই উনি প্রবাল, নীলা আর আলতাকে নিয়ে আছেন।"

"খরচ চলছে কি করে? আমি তো অনেকদিন চেক দিই নি।"

"প্রবাল আলতা দুজনেই রোজগার করে। নীলাও বোধহয় কিছু দেয়, নীলার সঙ্গে মগনলালের বিয়ে হয়ে গেছে। মগনলাল ধনী লোক। শুধু ধনী নয়, বিদ্বানও। সেদিন আলাপ হল, চমৎকার ছেলে।"

"আমার বাড়িতে কে আছে তাহলে—"

"মহান।"

"আমাকে আর কতদিন আটকে রাখবে এখানে—"

"আরও সাত দিন।"

"সাত দিন! সাত দিন কেন?"

"তাহলে সব খুলে বলি। তোমার প্রপিতামহরা একান্নবর্তী ছিলেন তো?"

"হ্যাঁ—"

"তাঁদেরই এক বংশধর তোমার নামে মোকদ্দমা করেছেন। তাঁর দাবী, তোমার ওই তিনতলা বাড়িতে তাঁরও অধিকার আছে। তিনি এতদিন পূর্ববঙ্গে ছিলেন। সম্প্রতি রেফিউজি হয়ে ফিরে এসে এই করেছেন। বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত ও বাড়ি এখন কোর্টের তত্ত্বাবধানে থাকবে। তোমাকে ও বাড়িতে থাকতে দেবে কি না সন্দেহ। তাই তোমার জন্যে একটা বাড়ি খুঁজছিলাম। গঙ্গার ঠিক উপরে কম্পাউন্ড-ওলা চমৎকার একটা বাংলো বাড়ি সাতদিন পরে খালি হবে। সেটা আমি তোমার জন্য 'বুক' করে রেখেছি। খালি হলেই সেখানে নিয়ে যাব তোমাকে। এই নাও আদালতের কাগজপত্র—"

সিভিল সার্জন পকেট হইতে কয়েকটি পত্র বাহির করিয়া দিলেন।

"মহানের কাছে তোমার অনেক চিঠি জমে আছে দেখলাম। তার ভিতর থেকে আদালতের চিঠিগুলো বেছে নিয়ে এসেছি আমি—"

"বাকি চিঠিগুলো?"

"সেগুলো পরে দেখো। আমিই চিঠিগুলো আনতে মানা করেছি। কোনও চিঠি দেখে হয়তো আবার তুমি উত্তেজিত হ'য়ে কি কাণ্ড করে বসবে তা তো বলা যায় না। এখন দিনকতক ঠাণ্ডা হ'য়ে বিশ্রাম নাও। সাতদিন পরে যখন গঙ্গার ধারের বাড়িটাতে যাবে তখন দেখো সব। ওষুধটা খাচ্ছ তো? ঘুম কেমন হয়?"

গোপালদেব অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। এসব কথার জবাব না দিয়া বলিলেন—"ওই গঙ্গার ধারের বাড়িতে আমি একা বাস করব?"

"তোমার মহান থাকবে। তোমার তেতলার ঘরে তুমি মহানকে নিয়ে একাই তো থাকতে। মহানই তোমার সব দেখাশোনা করত। এখানেও করবে—"

"কিন্তু তেতলার ঘরে ছিল আমার লাইব্রেরি—"

"সেটা এখানেও থাকবে। তোমার লাইব্রেরির আলমারিগুলো আনা অসম্ভব হবে না। তোমার ফার্নিচারগুলোও আনা যাবে। এ জন্যে আদালতের পারমিশন নিতে হবে হয়তো। জজ সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ আছে—সে হয়ে যাবে।"

"আমি এখানে কতদিন আছি বল তো?"

"তা প্রায় মাস দুই হবে। অবশ্য অধিকাংশ সময়েই তোমাকে ঘুমের ওষুধ বা ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে রাখা হ'ত, তাই কতদিন এখানে আছ তা ঠাহর করতে পাচ্ছ না। কাল থেকে ঘুমের ওষুধ বন্ধ আছে—"

গোপালদেব আদালতের চিঠিগুলি দেখিতেছিলেন। হঠাৎ তাহার ভিতর হইতে একটি কার্ড বাহির হইয়া পড়িল। নিমন্ত্রণপত্র।

"এটা কি?"

"ওটা তোমার চিঠিপত্রের মধ্যে ছিল। ভুলে চলে এসেছে সম্ভবত। কই দেখি? ও, ওটা প্রবালের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র। হোটেলে সেদিন বেশ ভালো খাইয়েছিল, আমি গিয়েছিলাম—"

"ভোজ হয়েছিল তাহলে? টাকা জুটল কোথা থেকে—"

সিভিল সার্জন হাসি মুখে চাহিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

"মগনলাল দিয়েছে নিশ্চয়! ছি, ছি, ছি, ছি—"

"মগনলাল দেয় নি। ও নিয়ে তুমি উত্তেজিত কোরো না নিজেকে, টাকাটা অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়েছিল প্রবাল।"

"কি রকম ?"

"তা এখন না-ই শুনলে। তবে এটা জেনে রাখ প্রবাল এমন কিছু করেনি যা আত্মসম্মানহানিকর। প্রবাল বেশ ভালো ছেলে—। হ্যাঁ আর একটা কথা, তোমার ওই বাড়িতে তোমাকে দেখাশোনা করবার জন্যে একটি প্রাইভেট নার্স বাহাল করেছি। সে সকালে খানিকক্ষণ আর বিকেলে খানিকক্ষণ এসে থাকবে তোমার কাছে। দুপুরে সে একটা ক্লিনিকে চাকরি করে। ভালো নার্স—"

"আমার জন্যে আবার নার্স কেন।"

তোমাকে কিছুদিন চোখে চোখে রাখা দরকার। তোমার 'পালস্' কাউণ্ট (count) করা, তোমার টেম্পারেচার দেখা, তোমার ব্লাডপ্রেসার মাপা—এখানে যে সব রোজ হচ্ছে—সেখানেও তেমনি করতে হবে। মহান তো ওসব করতে পারবে না, তাছাড়া একজন কেউ কাছে-পিঠে থাকলে তোমার মনটাও ভালো থাকবে। ভালো মেয়েটি—"

"মাইনে কত লাগবে—"

"তার সঙ্গে কথা কই নি এখনও। তবে যতই লাগুক তোমার নাগালের বাইরে যাবে না তা—"

গোপালদেব হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। সহসা তাঁহার আবুহোসেনের গল্পটা মনে পড়িল। মনে হইল কোন অদৃশ্য হারুণ-অল-রশিদের খেয়ালের খেলনা হইয়াছেন তিনি !

"ভাবছ কি—"

সিভিল সার্জন হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন।

"কিছুই ভাবছি না। ভাবছি, তাসের ঘরটা ভেঙে গেল। এখন অপরের করুণা-ভাজন হ'য়ে আধ-পাগলের মতো কাটাতে হবে বাকি জীবনটা।"

"ওসব কথা ভাবছ কেন। তোমার ঘর তাসের ঘর কি পাথরের ঘর, কুটির না তাজমহল, তার বিচার করবে তোমার পরবর্তী কাল। তোমার মতো লোকও যদি বর্তমানের স্তুতি-নিন্দার দোলায় বিচলিত হও তাহলে আমাদের মতো সাধারণ লোক কোথায় দাঁড়াবে ? তোমাদের উপর ভর করেই তো আমরা দাঁড়িয়ে আছি। তোমার ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলো—ভালো কথা, গোপালদেব নিয়ে তুমি যে একটা গবেষণা করবে ভেবেছিলে তার কি হল—"

"কিছুই হয় নি। ভাবছি। মুশকিল হয়েছে—"

গোপালদেব থামিয়া গেলেন।

"কি মুশকিল—"

"আমার যে সব কথা মনে হয় তার কোন পাথুরে প্রমাণ নেই। আর পাথুরে প্রমাণ দাখিল না করতে পারলে সুধীসমাজে তা ইতিহাস বলে গ্রাহ্য হয় না। লোকে বলবে কাব্য করেছি, ইতিহাস হয় নি।"

"কাব্যই কর না। ইতিহাস আর কটা লোকে পড়ে ? ভালো ঐতিহাসিক-কাব্যই লিখে ফেল না একটা।"

"কাব্য লেখবার প্রতিভা আমার নেই। মাঝে মাঝে কেবল মেঘের মতো উদ্ভট কল্পনা ভেসে আসে মনে। একটা কথা মাঝে মাঝে মনে হয়, গোপালদেব বাংলার গৌরবময় যুগের তৃতীয় শিখর, ইংরেজিতে বললে বলতে হয়—থার্ড পিক (third peak)। প্রথম 'পিক' গঙ্গারিডই নন্দরাজা, দ্বিতীয় 'পিক' শশাঙ্ক, তৃতীয় 'পিক' গোপালদেব। বাংলার প্রথম সার্বভৌম রাজা শশাঙ্কের মহিমা-ভগ্নস্তূপের উপর গোপালদেবের কীর্তি-সৌধ স্থাপিত হয়েছিল—"

একটু থামিয়া হাসিয়া আবার বলিলেন—"সব মহিমার সৌধ ভগ্নস্তুপ হয়ে যায় শেষকালে। এইটেই ইতিহাসের শিক্ষা। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট শশাঙ্কর নামে অনেক মিথ্যা কথা লিখেছেন তাঁর হর্ষচরিত কাব্যে, হর্ষবর্ধনের মিতে হুয়েনসাংও অনেক কলঙ্ক লেপন করেছেন শশাঙ্কের নামে। শশাঙ্কের এরকম সভাকবি বা বন্ধু ছিল না—মনে হয় তিনি চাটুকার পারিষদ পরিবৃত হয়ে থাকতে ভালোবাসতেন না। খাঁটি মানুষ ছিলেন। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন—বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্ক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তিনিই প্রথম আর্যাবর্তে বাঙালীর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। তাঁর সে স্বপ্ন কিছুটা সফলও হয়েছিল। পরাক্রান্ত মৌখরি রাজশক্তিকে তিনি ধ্বংস করেছিলেন। উত্তরাপথের অধীশ্বর হর্ষবর্ধন তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন নি। তিনি তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে আমরণ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন। বাণভট্টের মতো চরিত-লেখক অথবা হুয়েনসাংয়ের মতো বন্ধু থাকলে হর্ষবর্ধনের মতো তাঁরও খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে তিনি স্বদেশে অখ্যাত, অজ্ঞাত, কোনও বাঙালী তার সম্বন্ধে কোন ইতিহাস লেখে নি, শত্রুর কলঙ্ককালিমাই জগতে তাঁর একমাত্র পরিচয়। তাঁর মৃত্যুর পরই সব শেষ হ'য়ে গেল, তারপর মাৎস্যন্যায়ের যুগ—"

ইতিহাসের এই লম্বা বক্তৃতায় সিভিল সার্জন একটু বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন। অনেকগুলি রোগী দেখিতে বাকী ছিল তখনও। তাঁহাকে উসখুস করিতে দেখিয়া গোপালদেব থামিয়া গেলেন।

"তোমার তাড়া আছে না কি—"

"হ্যা কয়েক জায়গায় যেতে হবে।"

"তাহলে তোমাকে আর আটকে রাখব না। শশাঙ্ক সম্বন্ধে আমার একটা রোম্যান্টিক থিওরি আছে। সেটা পরে শুনো না হয়—"

"হ্যাঁ পরে শুনব। আজ উঠি তাহলে. কোনও অসুবিধা হচ্ছে না-তো।"

"তুমি স্বয়ং সিভিল সার্জন যখন আমার সহায় তখন আর অসুবিধা কি—"

সিভিল সার্জন চলিয়া গেলেন।

গোপালদেবের মনে কিন্তু সেই রোম্যান্টিক থিওরিটি মেঘের মতো সঞ্চারিত হইতে লাগিল, বিসর্পিত হইতে লাগিল নানাভাবে, অবশেষে বহুবর্ণে মণ্ডিত হইয়া অপরূপ শোভার সৃষ্টি করিল।

সূত্রধার আবির্ভূত হইলেন।

বলিলেন—"কল্পনা মিথ্যা নয়। ইতিহাসের সত্য তর্ক-কণ্টকিত। মানুষের বুদ্ধিই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি সীমাবদ্ধ। ইতিহাসের সত্যও

তাই সীমিত। নিত্য নূতন আবিষ্কারের ফলে সে সত্যের চেহারা বারবার বদলে যায়। তথাকথিত বিজ্ঞানেরও এই দশা। কোনও সত্যকে সে স্থায়ী রূপ দিতে পারে না। বিজ্ঞানীরা যেন টর্চ ফেলে ফেলে অন্ধকারে সত্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাঁদেরও সম্বল কল্পনা। কল্পনাই তাঁদের পথ দেখাচ্ছে। সেই পথে চলেই তাঁরা অনেক সময় সত্যের খণ্ডরূপ দেখতে পাচ্ছেন। আপনার কল্পনাও হয়তো মিথ্যা নয়। হয়তো সত্যিই শশাঙ্ক আর মালবরাজ দেবগুপ্ত একই বংশোদ্ভূত ছিলেন বলেই বন্ধুত্ব ছিল দুজনের মধ্যে। হয়তো এ কথাও সত্য শশাঙ্ক যখন মহাসেনগুপ্তের অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন তখন প্রভাকরবর্ধনের কন্যা এবং রাজ্যবর্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে ভালবেসেছিলেন। হয়তো তার পাণিপ্রার্থনা করে অপমানিতও হয়েছিলেন। হয়তো রাজ্যশ্রীই অপমান করেছিল, হয়তো বলেছিল—"তোমার স্পর্ধা তো কম নয়, বামন হ'যে চাঁদে হাত দিতে চাও, সামান্য সামন্ত হ'যে বিয়ে করতে চাও স্থানীশ্বরের রাজকন্যাকে। মৌখরী-রাজ গ্রহবর্মার সঙ্গে রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়। হয়তো এই জন্যই গ্রহবর্মার উপর শশাঙ্কের আক্রোশ, এই জন্যই হয়তো তিনি তাঁর বন্ধু মালবরাজ দেবগুপ্তের সাহায্য নিয়ে গ্রহবর্মাকে আক্রমণ করেছিলেন। গ্রহবর্মা পরাজিত ও নিহত হন, রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন। শেষে তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়ে বিন্ধ্যাচলের অরণ্যে চিতায় আত্ম-বিসর্জন করতে উদ্যত হন, এমন সময় রাজ্যবর্ধন গিয়ে তাঁকে রক্ষা করে। কেউ আবার বলেছেন শশাঙ্কের আদেশেই রাজ্যশ্রী কারামুক্ত হয়েছিলেন। এই সব ঐতিহাসিক ঘটনা বা কিম্বদন্তী আপনার কল্পনায় যে রং লাগিয়েছে তা মিথ্যা নয়। ওই দেখুন আকাশ রঙ্গমঞ্চে তার মহোৎসব।"

গোপালদেব দেখিতে লাগিলেন সমস্ত আকাশটা যেন এক বিরাট রণাঙ্গনে রূপান্তরিত হইয়াছে। বহু রক্তাক্ত সৈন্য পড়িয়া রহিয়াছে চতুর্দিকে। সমস্ত আকাশটাই যেন রক্তাক্ত। দূর দিগন্তরেখায় আগুন জ্বলিতেছে। আর একটা স্থান ধূম্রাকীর্ণ। একটা হাহাকার যেন মূর্ত হইয়াছে সেখানে। আর এই রণাঙ্গনের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন একটি তন্বী রক্তাম্বরা যুবতী। মাথার চুল হাওয়ায় উড়িতেছে, দুই বাহু ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত, চোখের আকুল দৃষ্টি সেই রক্তাক্ত রণাঙ্গনে কাহাকে যেন অন্বেষণ করিতেছে। গোপালদেবের মনে হইল—রাজ্যশ্রী শশাঙ্ককেই যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। রাজকন্যার গর্ব চূর্ণ হইয়াছে, সে এখন সেই সামন্তেরই পদপ্রান্তে নিজেকে সমর্পণ করতে চায়। কিন্তু সে কোথায়, সে কোথায়···। ধীরে ধীরে ধূসর মেঘমালা আসিয়া সেই রক্তাক্ত রণাঙ্গনকে ঢাকিয়া দিল। দিগন্তরেখার অগ্নি নিবিয়া গেল। রাজ্যশ্রী অন্তর্হিত হইলেন। ধূসর মেঘমালা ক্রমে ক্রমে যাহা রচনা করিল—তাহা বিরাট একটা ধ্বংসস্তূপ। গোপালদেবের সহসা মনে হইল শশাঙ্ক আর রাজ্যশ্রী কি এক জাতের ছিল ?"

এইখানে আমি—গল্পের লেখক ফকিরচাঁদ সামন্ত—নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। সেদিন আমার পথে-পাওয়া গুরু বুধ আমার সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া-ছিলেন তাহার কিছুটা ফলিয়াছে মনে হইতেছে। গোপালদেব সম্বন্ধে বই লিখিতে আরম্ভ করার পর হইতেই আমার মনে উৎসাহ এবং দেহে বল সঞ্চারিত হইয়াছে। আত্মবিশ্বাস বাড়িয়াছে, নিজেকে আর ক্ষুদ্র কেরানী বলিয়া মনে হইতেছে না। এমন কি মালিনী—আমার ছাত্রের বোন মালিনী, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া আমার মনে একটা

রোম্যান্টিক স্বপ্ন পুষ্পিত হইয়াছিল, যে মালিনী আমার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিত না, সেই মালিনীও আজকাল আমার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। সেদিন আমার ছাত্রকে পড়াইতেছিলাম হঠাৎ মালিনী ঘরে ঢুকিয়া বলিল—'মাস্টার-মশাই, আমি প্রাইভেটে এবার আই-এ দেব। বই কিনেছি, যেখানে বুঝতে পারব না, আপনার কাছে আসব ? বুঝিয়ে দেবেন তো ?'

বলা বাহুল্য, আপত্তি কার নাই, সানন্দে সম্মত হইয়াছিলাম। প্রায়ই তাহাকে পড়া বলিয়া দিতাম, অবশ্য তাহার দাদা রণধীরের ঘরেই সে আসিত। নির্জনে কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। আর একটা লাভও হইয়াছে। মালিনী প্রত্যহ আমাকে একথালা জলখাবার পাঠাইয়া দেয়। রাবড়ি, হালুয়া, নানারকম ফল, সন্দেশ—প্রচুর খাবার। উহা খাইয়া পেট ভরিয়া যায়, দ্বিপ্রহরে আর খাইবার প্রয়োজন হয় না। সত্যই আমার স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে, মনেও একটা প্রেরণা জাগিয়াছে, মনে হইতেছে জীবন বৃথায় যাইবে না, নেপথ্যে একটা বৃহৎ জীবন যেন আমার অপেক্ষায় রহিয়াছে। সে জীবন গোপালদেবের জীবনের অনুরূপ হইবে কি না জানি না, কিন্তু অনুভব করিতেছি আমার জীবনের আঁস্তাকুড়ে নন্দনকাননের আবির্ভাব ঘটিবে। অপ্রত্যাশিত-ভাবে আর একটি ঘটনাও ঘটিয়াছে। মালিনী ইতিহাসের বই পড়িতে খুব ভালোবাসে। হঠাৎ সেদিন আসিয়া বলিল, "মাস্টারমশাই, রাণী দুর্গাবতীর কাহিনী পড়ে খুব ভালো লাগল। আকবরের সৈন্য যখন সিংহগড় আক্রমণ করে তখন তিনি নিজে হাতীর পিঠে চড়ে মোগল সৈন্যের সম্মুখীন হন। প্রথম দিনের যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিন বিপক্ষদলের দুটো শর এসে তাঁর চোখে মুখে বিঁধে যায়। এ দেখে সৈন্যরা পালাতে আরম্ভ করে। তিনি আর তাদের ফেরাতে পারেন নি। মাহুতের হাত থেকে ছোরা নিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। এ যুগে কি ওরকম দুর্গাবতী হয় না ?"

"হয় বই কি। অগ্নিযুগের অনেক বীর রমণীই ওরকম করেছেন প্রীতি ওয়াদ্দেদারের কথাই ধর না—"

মালিনীর চোখে মুখে একটা অদ্ভুত উদ্দীপনা ঝলমল করিতে লাগিল। সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি ঘোড়ায় চড়া শিখব। আপনি ঘোড়ায় চড়তে পারেন ?"

"ছেলেবেলায় চড়েছি দু'একবার মাঝে মাঝে। গরীব মানুষ ঘোড়া কোথায় পাব ?"

"বেশ, আমি দাদাকে বলব। আমাদের সহিসটাকে নিয়ে মাঠে যাব দু'জনে—আমাদের সহিস ধনপৎ খুব ভালো ঘোড়সোয়ার।"

মনে হইল কপাট যেন ধীরে ধীরে খুলিতেছে।

কার্তিক তন্ময় হইয়া পড়িতেছিল।

হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল খেজুরি বিবি তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। গালে টোল পড়িয়াছে। কপাট খোলা ছিল, সে কখন নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়াছে কার্তিক টের পায় নাই।

"সুরৎ, তুমি এই পাপীয়সীর বাড়িতে এমন শান্তভাবে থাকবে তা প্রত্যাশা করি নি। আমার ভয় হচ্ছিল এসে হয়তো দেখব রাখাল তোমাকে বেঁধে রেখে দিয়েছে আর

তুমি মুখের বাঁধা কাপড়টা খুলতে চেষ্টা করছ কিন্তু পারছ না। তোমার চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু এসে দেখছি তুমি লক্ষ্মীটি হ'য়ে বসে আছ। ভারি আনন্দ হচ্ছে—"

খেজুরি বিবি আগাইয়া আসিল।

"বসব বিছানায় ? রাগ করবে না তো।"

"না রাগ করব কেন—"

কার্তিক উঠিয়া পড়িল। বেশ একটু দূরে প্রায় দেওয়াল ঘেঁসিয়া সরিয়া বসিল, যাহাতে খেজুরি বিবির গায়ে গা না ঠেকিয়া যায়। ইহা দেখিয়া খেজুরি বিবি আবার হাসিল, আবার তাহার গালে টোল পড়িল।

"তোমার যে এমন ছুঁচিবাই আছে তাতো জানতাম না। আমার একটা কথা বিশ্বাস করবে ?"

সোৎসুকে কার্তিকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল সে।

"বিশ্বাসযোগ্য হলেই করব।"

"তোমার এই ছুঁচিবাই দেখে তোমার উপর আমার শ্রদ্ধা শতগুণ বেড়ে গেল।"

"তার মানে ?"

"আমি দেহবিক্রি করি এ খবর জানবার পর সাধারণ যে কোনও পুরুষ একটু উস্-খুস্ করত, তার চোখের দৃষ্টিতে রিরংসা লোভ প্রভৃতি ফুটে উঠত, ঘৃণা ফুটে উঠত না। তোমার চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণা ফুটে উঠেছে দেখে খুশি হলাম।"

কার্তিকের গলার কাছটায় কেমন যেন ব্যথা ব্যথা করিতে লাগিল। তাহার চপলাদি—তাহার কল্পনার শ্রী—যাহার চোখে মুখে পবিত্রতার ছাপ এখনো সুস্পষ্ট —সে দেহ-বিক্রয় করে ? একি সত্য ?

"যদি ফুটে থাকে তাহলে আমি লজ্জিত সে জন্য। কাউকেই ঘৃণা করা উচিত নয়। কিন্তু মনের সংস্কার কাটতে চায় না : বরাবর সবাই যেটাকে ঘৃণা মনে করেছে, ঘৃণ্য মনে করতে শিখিয়েছে সেটার প্রতি ঘৃণাই আছে আমার, যদিও একথা স্বীকার করছি—যুক্তির নিকষে যাচাই করলে আমার এ সংস্কার অর্থহীন বা হাস্যকর বলে মনে হবে। রাসায়নিকের কাছে যেমন বিষ্ঠা আর চন্দন কতকগুলো রাসায়নিক উপাদানের সমষ্টি মাত্র, তাদের নিয়ে ঘৃণা বা উল্লাস প্রকাশ করা যেমন—"

"আর বলতে হবে না, বুঝেছি আমি। কিন্তু যদিও আমাদের দেশে মনুষ্যত্বের উচ্চতম আদর্শ নির্বিকার হওয়া কিন্তু আমার মনে হয় ভাগ্যে সবাই নির্বিকার হতে পারে না তাই জীবনে কিছু স্বাদ আছে—"

এই সময় বাহিরে কয়েকটা লোকের পদশব্দ শোনা গেল।

"এটা কোথায় রাখব মা —"

"এইখানেই নিয়ে এস আপাতত। নিবারণবাবু এলে সকালে যা হয় ব্যবস্থা করবেন তিনি—"

একটা প্রকাণ্ড বস্তা লইয়া চারজন লোক প্রবেশ করিল।

"ওই কোণের দিকে রাখ—"

ধপাস করিয়া বস্তাটা কোণের দিকে রাখিয়া লোকগুলি চলিয়া যাইতেছিল।

"তোমাদের মজুরি পেয়েছ ?"

"নিবারণবাবু আট আনা করে দিয়েছেন জন পিছু।"

"আচ্ছা, আরও কিছু নিয়ে যাও।"

খেজুরি বিবি একটি সুদৃশ্য ব্যাগ খুলিয়া আরও দুইটি টাকা তাহাদের দিল। তাহারা তাহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

"বস্তায় কি আছে?"—কার্তিক প্রশ্ন করিল।

"চাল।"

"কিছু কিনে রাখলে বুঝি। কিছু 'স্টক' করা ভালো, যা দাম বাড়ছে।"

"স্টক করবার জন্যে কিনি নি! বিতরণ করবার জন্যে যোগাড় করেছি!"

"বিতরণ করবে? কাদের?"

"ঠিক বিতরণ করব না। সামান্য কিছু দাম নেব। বিতরণ করতে পারলেই ভালো হ'ত, কিন্তু যাদের দেব তারা ভিক্ষা নেবে না। তারা ভদ্রলোক—অথচ খুব গরীব—"

"বুঝতে পারছি না ঠিক—"

"আমাদের দেশের নিম্নমধ্যবিত্ত লোকেরা খুব গরীব, তারা আধপেটা খেয়ে থাকে, কখনও উপবাস করে তবু ভিক্ষা করতে পারে না। তাদের কাছেই এই চাল চার আনা সের দরে বিক্রি করব—"

"চার আনা সের? কত করে কিনেছ তুমি—"

"আড়াই টাকা। আড়াই টাকারও বেশী। আজ দু'মণ চালের দাম দু'শো দশ টাকা নিয়েছে।"

"এ চাল তুমি পাচ্ছ কোথা থেকে?"

"চোরাবাজার থেকে।"

কার্তিক স্তম্ভিত হইয়া খেজুরি বিবির দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

"চোরাবাজার থেকে চড়া দামে চাল কিনে—"

খেজুরি বিবি তাহার কথা শেষ করিতে দিল না। হাসিয়া বলিল—"যারা দেহ বিক্রি করে তারা সব পারে!"

সত্যটা হঠাৎ যেন বিদ্যুতের মতো প্রতিভাত হইল কার্তিকের মনে, কিন্তু বিদ্যুতের মতো মিলাইয়া গেল না। সে নিঃসংশয়ে বুঝিল চপলাদি দেহ-বিক্রয় করে না। ওই কুৎসিত যবনিকাটার অন্তরালে যে চপলাদি আত্মগোপন করিয়া আছে সে পাপীয়সী নয় মহিয়সী।

"চপলাদি তুমি আমাকে মিছে কথা বলেছ; তুমি দেহ-বিক্রি কর না—"

খেজুর বিবি এবার কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

"আচ্ছা অবুঝ তুমি তো। মেলায় মেলায় ওই সব তাঁবু যারা ভাড়া নেয় তারা দেহ-বিক্রি করবার জন্যেই নেয়। গভর্ণমেণ্টের কাছে তাদের লাইসেন্স নিতে হয়। এ ব্যবসাকে গভর্ণমেণ্ট ন্যায়সঙ্গত মনে করে। আমারও লাইসেন্স আছে—"

"তা থাক। কিন্তু আমি বিশ্বাস করলাম না তুমি সাধারণ বারবনিতা। বাজে কথা বলেছ তুমি আমাকে—"

"বিশ্বাস না করবার কারণ?"

"তোমার চোখ-মুখ দেখে সেটা বুঝেছি। সাধারণ বেশ্যাদের চোখ-মুখে ওরকম

পবিত্রতার ছটা থাকে না। তারা গরীব মধ্যবিত্তদের জন্যে চাল সংগ্রহ করে বেড়ায় এ কথাও কখনও শুনিনি—"

খেজুরি বিবি আর কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল না, স্মিতমুখে কার্তিকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার গালে টোল দুইটি দেখিয়া কার্তিক সহসা যেন আর একটু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

"তুমি একটুও বদলাও নি চপলাদি। তুমি এখনও সীতারামের শ্রীই আছ। কেন আমার কাছে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইছ বল দিকি—"

খেজুরি বিবি একথারও উত্তর দিল না, নীরবে হাসিতেই লাগিল।

দৈত্যাকৃতি রাখাল দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল।

"আপনার স্নানের গরম জল তৈরি হ'য়ে গেছে মা। আপনি আসুন—"

"এঁর বন্ধু আর কুকুরকে কোথায় রেখেছ?"

"নীচের ঘরে রেখেছিলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়েও ছিলেন তিনি। কুকুরটাকেও খাইয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি ঘরের কপাট খোলা। ও'রা কেউ নেই। আমি তো তাঁবুতে পাহারা দিচ্ছিলাম—"

"কোথাও বেরিয়েছেন বোধহয়। চল—"

খেজুরি বিবি উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু যে সুদৃশ্য ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে সে কুলিদের টাকা বাহির করিয়া দিয়াছিল সেটি কার্তিকের বিছানাতেই পড়িয়া রহিল। ভ্যানিটি ব্যাগটি সত্যই মনোরম। দেখিলেই স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করে। কার্তিকের সহসা মনে হইল ওই ভ্যানিটি ব্যাগটি খুলিয়া দেখিলে হয়তো খেজুরি বিবির সত্য পরিচয়ের আভাস মিলিবে। কোনও চিঠি, কোনও কার্ড বা ওই রকম একটা কিছু হইতেই হয়তো বোঝা যাইবে সব। ব্যাগটা খুলিয়াই কিন্তু চমকাইয়া উঠিল কার্তিক। এক তাড়া নোট রহিয়াছে, প্রত্যেকটা হাজার টাকার! গণিয়া দেখিবার সাহস হইল না। তাছাড়া অনেক খুচরা নোট। সহসা একটা ছবি বাহির হইয়া পড়িল। অর্ধস্ফুট পদ্মকলির ছবি। চমৎকার ছবি। মনে হয় পদ্মকলিটি যেন জীবন্ত। চপলা পর-মুহূর্তেই ফিরিয়া আসিল।

"ব্যাগটা এখানে ফেলে গেছি। ও কি, তুমি খুলে দেখছ না কি—"

একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল কার্তিক।

"দেখছিলাম ওতে তোমার আসল পরিচয়ের কোন সন্ধান পাই কি না। অন্যায় হ'য়ে গেছে আমার—"

ব্যাগটি বন্ধ করিয়া সে চপলার হাতে দিল। ব্যাগটি হাতে করিয়া চপলা দাঁড়াইয়া রহিল। মুখে মৃদু হাসি, গালে টোল।

"রাগ করলে আমার উপর চপলাদি?"

"অবাক হয়েছি, রাগ করিনি। হয়তো আমিই নিজেই তোমাকে সব খুলে বলতাম। পদ্মকলি এখনই হয়তো আসবে। তবে এর ভিতর যা দেখেছ তা যেন প্রকাশ কোরো না কারও কাছে। যদি কর তাহলেই রাগ করব—বিপদেও পড়ব—"

তাহার পর হঠাৎ সুমিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমার উপর রাগ করা যাবে না জানি। যাবে? তুমি স্বয়ং, এতদিন পরে ফিরে এসেছ, তোমার উপর রাগ করতে পারব না কিছুতে। একটা কথা শুধু জেনে রাখ একথা যদি প্রকাশ পায়, আমার

কঠিন শাস্তি হবে হয়তো যাবজ্জীবন জেলে পুরে রেখে দেবে আমাকে। শুধু আমি নয়, পদ্মকলি বেচারাও বিপদে পড়ে যাবে। এইটে মনে রেখো—"

"না, একথা প্রকাশ পাবে না আমার কাছ থেকে। কিন্তু চপলাদি, তোমার সম্বন্ধে বিস্ময় যে ক্রমেই অন্তহীন হয়ে উঠছে। কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়ছি।"

"কবিরা নারীদের বলেছেন প্রহেলিকা, ধার্মিকরা বলেছেন শয়তান। সাধারণ পুরুষরা তাদের দেখে দিশাহারা হবে এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু তোমাকে আমি অসাধারণ মনে করি সুরং, তুমি দিশাহারা হবে একথা ভাবতেই পারি না। অনেকদিন তো তোমার শালার বাড়িতে একসঙ্গে ছিলাম, তখন তো দিশাহারা হওনি। তোমার শালা বরং হয়েছিল, সে সাধারণ পশু একটা—"

"মা জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—"

রাখাল আবার দ্বারপ্রান্তে দর্শন দিল।

"আমি স্নান করে এখন ঘুমুব। তুমিও ঘুমিয়ে নাও না একটু। সকাল হ'তে এখনও অনেক দেরি - এখন তিনটে বেজেছে—"

খেজুরি বিবি চলিয়া গেল। কার্তিক বসিয়া রহিল আরও খানিকক্ষণ। তাহার পর উপন্যাসটাই খুলিল।

"গোপালদেব অস্থির চিত্তে কেবলি ভাবিতে লাগিল শশাঙ্ক আর রাজ্যশ্রী কি এক জাতের ছিল? সহসা সেই সৌম্য প্রাজ্ঞ গম্ভীর ইতিহাস প্রত্নবেদী 'পরে আবার নৃত্য হইলেন। বলিলেন—"সামাজিক নিয়মে গণ্ডীবদ্ধ কোন জাতেরই শাশ্বত মূল্য নাই। পূর্বেই বলিয়াছি বহুজাতির সংমিশ্রণ সর্বত্র ঘটিয়াছে। কোনও একটা জাতি নিজের বৈশিষ্ট্যকে বেশীদিন স্থায়ী করিতে পারে নাই। আর একটা জাতি আসিয়া মিশিয়াছে, তাহার পর আর একটা। নিত্য নূতন জাতি, নূতন ধর্ম, নূতন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছে। বহু নদীর ধারায় বাহিত হইয়া বহু ঘাটের জল এক জলাশয়ের ভিতর জমা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আছে কত উদ্ভিদের খণ্ডাংশ, কত জন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কত বিভিন্ন মাটির বৈচিত্র্য-বৈভব। কিন্তু এখন সব একাকার, এখন সব পঙ্ক। সকলের বৈশিষ্ট্য লোপ পাইয়াছে ওই বিরাট পঙ্ককুণ্ডে। তবে একটা কথা বলিব। ওই পঙ্ককুণ্ডেই আবার নূতন রকম জাতিভেদের নিদর্শন পাওয়া যায়। ওই পঙ্ককুণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া গুগলি, শামুক, ব্যাং, সাপ, শ্যাওলা প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটে, ওই পঙ্ককুণ্ডে পদ্মও ফোটে। পদ্ম এবং শামুক এক জাতের নহে। তাদের বিশেষ গুণাবলীর সমষ্টিই তাহাদের পদ্ম বা শামুক করিয়াছে। ভ্রমর যখন পদ্মের নিকট আসিয়া মুগ্ধ গুঞ্জন তোলে তখন সে পদ্মের জন্ম-ঐতিহ্য লইয়া মাথা ঘামায় না, সে পদ্মের রূপ-গুণেই মুগ্ধ। পদ্ম নিজের রূপ-গুণ লইয়া নিজেরই ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। সব জাতিরই মূল কথা ইহাই। গুণ ও কর্ম একটি জাতিকে অপর জাতি হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ব্রাহ্মণের বংশে যদি চণ্ডালের জন্ম হয় সে ব্রাহ্মণের সম্মান ও মর্যাদা পায় না। নীচ বংশে মহাপুরুষদের জন্ম হইয়াছে এরূপ উদাহরণও ইতিহাসে বিরল নহে। তাঁহারা সমাজে সম্মানিতও হইয়াছেন। একই পঙ্ক হইতে কি করিয়া পদ্ম ও শামুকের উদ্ভব হয় এ রহস্য চিরকাল রহস্যই থাকিয়া

যাইবে। তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে পদ্ম নিজগুণেই, নিজের মহিমার জোরেই চিরকাল আধিপত্য বিস্তার করিবে গুণী ও রসিকদের কাছে। সরস্বতী চিরকাল আসিয়া তাহার উপরই নিজের আসন পাতিবেন। রাজ্যশ্রী ও শশাঙ্ক এক জাতের ছিল কি না এ চিন্তা সুতরাং নিরর্থক। তোমার কল্পনা যদি শশাঙ্ককে রাজ্যশ্রীর প্রণয়ীরূপে কল্পনা করিয়া তৃপ্ত হয় তাহা হইলে তোমাকে একথা মানিতেই হইবে উহারা একজাতের পক্ষীই ছিল। কারণ ভিন্নজাতীয় পক্ষী কখনও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। দেহের দিক দিয়া বিচার করিলে সব মানুষবেই একজাতের মনে হয় বটে, জড়বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে বর্বর ও সভ্য, নির্বোধ ও প্রতিভাবান সকলেই হোমোস্যাপিয়েনস্ (Homosapiens)—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা একজাতের নহে। যে কুলেই তাহারা জন্মগ্রহণ করুক, বিভিন্ন প্রবৃত্তি, কর্ম ও গুণ অনুসারে তাহারা বিভিন্ন জাতীয় হয়। আর্যগণ গুণ কর্ম অনুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের চিহ্নিত করিয়াছিলেন। এ কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যে-কোন কুলেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উদ্ভব হইতে পারে। সুতরাং শশাঙ্ক ও রাজ্যশ্রী যে একই জাতের নরনারী ইহা কল্পনা করিলে অসঙ্গত হইবে না—"

পড়িতে পড়িতে কার্তিকের চোখের পাতা ভারি হইয়া আসিল। ঘুমাইয়া পড়িল সে।

যখন তাহার ঘুম ভাঙিল, দেখিল অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। ঘরে কেহ নাই। চারিদিক স্বর্ণকিরণে ঝলমল করিতেছে। তাহার হঠাৎ মনে হইল আলোর দেশে তাহার ঘুম ভাঙিয়াছে। আর অন্ধকার আসিবে না। যদিও বা আসে তাহা হইলে তাহা সন্ধ্যার বর্ণসমুদ্রে অবগাহন করিয়া নক্ষত্রমালায় সাজিয়া জ্যোৎস্নার উত্তরীয় গায়ে দিয়া আসিবে। যে শোভাহীন কুৎসিৎ অন্ধকার সে এতদিন ভোগ করিয়াছে এ অন্ধকার সে রকম হইবে না। বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িল। তাহার পর চোখে পড়িল পাশেই তে-পায়ার উপর একটি চিঠি রহিয়াছে। খামের চিঠি। খামের উপরে লেখা—সুবং। চিঠিটা খুলিয়া পড়িল।

সুবং,

তুমি অগাধে ঘুমোচ্ছ দেখে তোমাকে আর ওঠালাম না। আমি একটু বেরিয়ে যাচ্ছি, বারোটা নাগাদ ফিরব। রাখাল এখানে রইল সে তোমার দেখাশোনা করবে। তোমার বন্ধু আনটো আর কুকুর লর্ডের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। খুব ভালো লেগেছে ওদের। আনটার নূতন নামকরণ করেছি অবতার। স্বয়ং ভগবানই তো একদিন বামন অবতার হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কশ্যপের সন্তানরূপে। চূর্ণ করে-ছিলেন বলির দর্প। আনটো অনির্বাণ প্রাণস্ফুলিঙ্গ। ওকে আমি কাজে লাগাব। ওকে আর তোমার কুকুরকে খেজুরিতে পাঠিয়ে দিলাম। সেইখানেই ওরা আরামে থাকবে। আমি ফিরে এসে তোমাকেও খেজুরিতে নিয়ে যাব। সেখানেই ভালো লাগবে তোমার। ইতি চ

চিঠি হইতে চোখ তুলিয়া কার্তিক দেখিল নিস্পন্দ প্রস্তরমূর্তিবৎ বলিষ্ঠকায় বিশালদেহ রাখাল দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। চোখাচোখি হইতেই সে আগাইয়া আসিল।

"আপনি কি আগে স্নান করবেন, না জলখাবার খাবেন ?"

"স্নানটা করলেই ভালো হ'ত। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আমার সঙ্গে কাপড় নেই—"

"সেজন্যে ভাববেন না। মা সে সব ব্যবস্থা করে গেছেন।"

"তবে চল স্নানটাই সেরে ফেলি আগে।"

স্নানের ঘরে গিয়া কার্তিক দেখিল তেল, সাবান, গরম জল, ঠাণ্ডা জল এ সব তো আছেই তাছাড়া আছে একটি ভালো শান্তিপুরে কাপড়, একটি তোয়ালে এবং একটি সিল্কের চাদর। সিল্কের চাদরে একটি কাগজের টুকরা 'পিন' দিয়া আটকানো আছে। তাহাতে লেখা রহিয়াছে—'সুরং, তোমার গায়ের মাপ জানি না, তাই তোমার পাঞ্জাবি গেঞ্জি কিনতে পারলাম না। আপাতত এই সিল্কের চাদরটা গায়ে দিয়ে থাকো খানিকক্ষণ। ফিরে এসে তোমার পাঞ্জাবি আর গেঞ্জির ব্যবস্থা করব। ইতি চ—

কার্তিক বাহিরে আসিয়া রাখালকে প্রশ্ন করিল—"আমার থলিটা কোথা ?"

"সেটা মা ভাঁড়ার ঘরে বন্ধ ক'রে রেখে গেছেন। আপনার কাপড় জামা কিছু আছে কি না দেখবার জন্যেই থলিটা দেখছিলেন উনি। কিন্তু একটা কড়াই আর খুন্তি আর একটা মোটা খাতা ছাড়া আর তো কিছু ছিল না তাতে।"

"না, আর কিছুই ছিল না। আচ্ছা, স্নানটা সেরে ফেলি—"

স্নানান্তে জলযোগ করিতে বসিয়া কার্তিক অবাক হইয়া গেল। দেখিল, সে একদা যাহা ভালোবাসিত তাহাই যেন আজ সংগৃহীত হইয়াছে। ওভালটিন, মাখন-দেওয়া গরম টোস্ট, ডিম-ভাজা আর সন্দেশ। আপেলও রহিয়াছে একটি। প্রথম প্রথম সে যখন ঘরজামাই হইয়া আসিয়াছিল তখন এসব খাদ্য সে নিয়মিত পাইত। কিন্তু কালীকিংকরের আমলে মুড়িও জুটিত না তাহার। মনে পড়িল চপলাদিকে মনের দুঃখে এ সব সে বলিয়াছিল একদিন। দেখিল চপলা তাহা মনে করিয়া রাখিয়াছে। হঠাৎ চপলার টোল-খাওয়া গালের মৃদু হাসিটা তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। আর একবার সে মনে মনে বলিল 'হতেই পারে না। চপলা দেহ-বিক্রয় করে টাকা রোজগার করে না। কিছুতেই না।'—বলিয়া ভারি তৃপ্তি পাইল।

ঠিক বেলা বারোটার সময় ঘর্মাক্তকলেবরে খেজুরি বিবি ফিরিল। বাহিরে প্রখর রোদ্র এবং উত্তপ্ত হাওয়া। খেজুরি বিবির মুখটা লাল হইয়া উঠিয়াছিল। চুল শাড়ি ধূলি-ধূসরিত। কিন্তু তবু তাহার মুখের হাসি নিবিয়া যায় নাই, চোখের দীপ্তিও ম্লান হয় নাই।

"আমি প্রায় ছুটতে ছুটতে এসেছি। জানি আমি না ফিরলে তুমি খাবে না। আর একজনও আমাদের সঙ্গে খাবে।"

"সে কে—"

"আমার প্রণয়ী !"

"তোমার প্রণয়ী !"

"হ্যাঁ। সে পাশের ঘরে অপেক্ষা করছে। রাখাল, ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে এস আর আমাদের খাবার দাও—"

একটি মোটাসোটা ভালোমানুষ গোছের ভদ্রলোক মুচকি হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিলেন।

"আসুন এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এ আমার আত্মীয় সুরং, অনেকদিন পরে কাল মেলায় দেখা হল এর সঙ্গে। আর সুরং ইনি আমার একজন বন্ধু। খুব ভালো লোক, চমৎকার গান করেন, চমৎকার বাঁশী বাজান। এঁর পরিচয় পেলে তুমি খুশি হবে—"

রাখাল দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল আবার।

"খাবার দেওয়া হচ্ছে।"

'চলুন খাওয়াটা শেষ করে ফেলা যাক—"

কার্তিক ক্রমশই যেন একটা জটিল ধাঁধার জালে জড়িত হইয়া পড়িতেছিল। এই মোটা লোকটা চপলাদির প্রণয়ী? বিশ্বাস হয় না। প্রণয়ীটি কিন্তু একটি কথাও বলিল না। নীরবে খাইয়া যাইতে লাগিল। মাছ, মাংস, পায়েস সবই প্রচুর খাইল। কিন্তু নীরবে।

"দারোগা সাহেব এসেছেন—" রাখাল আসিয়া খবর দিল।

"ও। তাঁকে এইখানেই নিয়ে এস। চেয়ার দাও একটা।"

ইউনিফর্ম-পরা দারোগা সাহেব প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিলেন।

"আমি একটা অপ্রীতিকর কাজ করতে এসেছি কিন্তু। আপনার বাড়িটা সার্চ করতে হবে। ওপর থেকে হুকুম এসেছে—"

"বেশ করুন। আমরা তো বেওয়ারিশ মাল, যে কেউ যখন তখন আমাদের নেড়েচেড়ে দেখতে পারে। আপনারা পুলিশের লোক, আপনারা তো পারেনই, এর জন্যে আপনাদের কোন খরচও নেই কিন্তু যারা পুলিশ নয় তারাও আমাদের ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারে অবশ্য তার জন্যে তাদের অর্থমূল্য দিতে হয়—এই ইনি যেমন দিয়েছেন—"

খেজুরি বিবি তাহার প্রণয়ীটির দিকে চাহিয়া হাসিল। প্রণয়ীটিও হাসিলেন। দেখা গেল তাঁহার সামনের দাঁত দুইটি স্বর্ণমণ্ডিত।

দারোগা সাহেব বলিলেন "আমি নীচের ঘরগুলো দেখেছি। সবই তো খালি দেখলাম। উপরে যে ঘরটায় তালাবন্ধ আছে সেইটে একবার দেখব। আর দেখব আপনার বাক্স—"

খেজুরি বিবি চাবির গোছাটা কোমর হইতে খুলিয়া তাঁহার হাতে দিলেন এবং বলিলেন—"আমার বাক্স নেই-—একটি কিন্তু অনুরোধ আছে—। খাওয়ার সময় এসেছেন কিছু খেয়ে যেতে হবে। গরম গরম কাটলেট আর—"

"না, আর কিছু নয়। কাটলেটই দিন তাহলে খান দুই—"

টেবিলের একধারে খেজুরি বিবির সুদৃশ্য ভ্যানিটি ব্যাগটি রাখা ছিল। সেটি দারোগা সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

"ওটা কি—"

"ওটা আমার ব্যাগ। যা রোজগার করি ওতেই থাকে—"

"দিন তো দেখি ওটা। কাল কত রোজগার করেছেন—"

"তা আমার প্রণয়ীটিকে জিজ্ঞাসা করুন। উনি যা দিয়েছেন তাই আছে ওতে—"

"কত দিয়েছেন আপনি—"

প্রণয়ীটির দিকে চাহিয়া দারোগাবাবু প্রশ্ন করিলেন।

"বেশী নয়। মাত্র প'চিশ টাকা—" কুণ্ঠিতকণ্ঠে বাললেন প্রণয়ীটি।

দারোগা সাহেব ব্যাগ খুলিয়া দেখিলেন প'চিশ টাকাই রহিয়াছে।

কার্তিক সবিস্ময়ে দেখিল হাজার টাকার নোট একটিও নাই। পদ্মকলির ছবিটাও দেখা গেল না।

"আমি ওই ঘরটা দেখে আসি তাহলে—"

"রাখাল ঘরটা খুলে দাও আর উনি যা যা দেখতে চান দেখাও—"

একটু পরেই দারোগা সাহেব ফিরিয়া আসিলেন।

"ও ঘরেও তো কিছু নেই। অথচ ও'রা খবর দিয়েছেন, কিছু চোরাই চাল এখানে এসেছে—"

"চোরাই চাল নিয়ে আমি কি করব? যা কিনি খোলা বাজার থেকে কিনি—"

"আচ্ছা চলি—"

দারোগা সাহেব চলিয়া গেলেন।

হতভম্ব কার্তিক বলিল—'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না চপলাদি—"

"পৃথিবীতে অধিকাংশ জিনিসই দুর্বোধ্য। আমরা ভান করি যেন বুঝতে পেরেছি। তুমিও তাই কর।"

হঠাৎ আর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। ছুটিতে ছুটিতে লর্ড আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার গলায় একটা দড়ি বাঁধা। সে আসিয়াই পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া কার্তিককে জড়াইয়া ধরিল।

"পাছে এদিকে ওদিকে চলে যায় তাই একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলাম ওকে। শিকল তো নেই—"রাখাল অপ্রস্তুত মুখে জবাবদিহি করিতেই লর্ড ঘেউ ঘেউ করিয়া তাহাকে বকিয়া দিল।

"চমৎকার কুকুরটি তোমার সুরং—একে ভালো করে যত্ন করতে হবে। আমরা এবার খেজুরিতে যাব। সেইখানেই বিশ্রাম করা যাবে। রাখাল আমাদের যাওয়ার কি ব্যবস্থা করেছ—"

"দুটো পালকি আনিয়েছি—"

প্রণয়ীটি বলিল—"আমি এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি। পরে আবার দেখা করব।"

প্রণয়ী চলিয়া গেল। তাহার পরই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এ দুটো এখন থাক আপনার কাছে" তাহার পর হাসিল। কার্তিক দেখিল তাহার সামনের দাঁত দুইটি ফাঁক ফাঁক, সে দুইটিতে আর সোনা নাই। খেজুরি বিবি তাহার নিকট হইতে সোনার টুকরাগুলি লইয়া ব্যাগে পুরিল। সে চলিয়া গেলে হাসিয়া বলিল—"ওর ওই ফাঁক ফাঁক দাঁত দুটিতে মাঝে মাঝে সোনার টোপর পরিয়ে রাখতে ভালোবাসে ও। কলকাতায় গিয়ে করিয়ে এনেছে এ দুটি—"

সোনার টুকরা দুইটি ভ্যানিটি ব্যাগে পুরিয়া খেজুরি বিবি তাহার সেই টোল খাওয়া হাসিটি হাসিয়া কার্তিকের দিকে চাহিয়া রহিল।

কার্তিক চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল সহসা।

"চপলাদি আমি চললুম। খেজুরিতে আর যাব না—"

"কোথায় যাবে?"

"যেদিকে দু'চক্ষু যায়। এত রকম রহস্যের জট ছাড়ানো আমার কর্ম নয়। আমি

সহজ সরল জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত, এত রকম ঘোর-প্যাঁচের মধ্যে আমি শান্তি পাব না। চললুম। একটা কথা কিন্তু বলে যাচ্ছি—তুমি আমার কাছে এখনও সীতারামের শ্রীই আছ। তোমার বাইরের ছদ্মবেশ আমাকে একটুও ভোলাতে পারেনি।"

"বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও সৃষ্টির সঙ্গে আমার তুলনা না দিলে তোমার যদি তৃপ্তি না হয় তাহলে আমাকে বরং দেবীচৌধুরাণী বলতে পার। অবশ্য দেবীচৌধুরাণীর পায়ের নখের সঙ্গেও আমার তুলনা চলে না। আমি সত্যিই অতি সাধারণ মেয়েমানুষ—"

"আচ্ছা আমি চললুম—"

"তোমাকে যেতে আমি দেব না সুরং। তুমি কাল আমাকে বলেছিলে, তুমি এ যুগের গোপালদেব হ'তে চাও। সে সুযোগ তোমাকে আমি করে দেব। শুধু একটা কথা মনে রাখতে হবে, এ যুগের গোপালদেব রাজা হবে না। সে সিংহাসনে আরোহণ করবে না, নিজের খ্যাতির ঢাক পেটাবে না, অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করবে না, সে কেবল সেবা করবে। আমাদের দেশ, বিশেষত নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, নানা দুঃখে কাতর। যারা রাস্তায় হাত পেতে ভিক্ষা করতে পারে তারা দুঃখী নয়, যারা গুণ্ডা জোর জবরদস্তি করে লুটপাট করে তারাও দুঃখী নয়, যারা গণতন্ত্রের কল্যাণে দেশের শাসনকর্তা তারা দুঃখী নয়, যারা ধনী তারা তো নয়ই—দুঃখী শুধু ওই ভদ্র নিম্নমধ্যবিত্তের দল যারা ভিক্ষে করতে পারে না, লুটপাট করতে পারে না, ভোট সংগ্রহ করে মন্ত্রী হতে পারে না, যারা সমাজের সব রকম দায়িত্ব বহন করে, অথচ যারা খেতে পায় না, পরতে পায় না, শিক্ষা পায় না, দারিদ্র্যের জন্যই যাদের বারবার পদস্খলন হচ্ছে। ওদেরই বাঁচাতে হবে, ওদেরই সেবা করতে হবে। বর্তমান যুগের গোপালদেব ওদেরই সেবা করবে, ওদেরই বাঁচাবে, দরকার হ'লে ওদের জন্যে প্রাণবিসর্জন দেবে। কিন্তু সে রকম লোক কোথাও পাচ্ছি না। তোমাকে দেখে আমার আশা হয়েছে—"

"দেশসেবকের তো অভাব নেই, কাগজে দেখি—"

"কাগজের দেশসেবক অনেক আছে। তাঁদের ছবি ছাপা হয়, তাঁরা রেডিওতে 'টক' দেন, মন্ত্রীদের সঙ্গে প্লেনে উড়ে উড়ে বেড়ান, কিন্তু আমি যে ধরনের সেবক চাইছি ওঁরা ঠিক সে জাতের নন। কাগজের দেশসেবকদের সেবা করার চেয়ে আত্মপ্রচারের দিকেই লক্ষ্য বেশী। সেবা করা বড় শক্ত কাজ। যার সেবা করবে তার আত্মসম্মানে আঘাত না করে তার আপন জন না হ'য়ে যেতে পারলে তাকে সেবা করা যায় না। সেবা করতে হলে ভালোবাসতে হবে। একসঙ্গে অনেক লোকের কাছে পাইকারি রীতিতে ভালো ভালো বক্তৃতা করা সহজ কিন্তু পাইকারি হিসাবে ভালোবাসা সহজ নয়। তোমাকে একটি পরিবারের ভার দিতে চাই প্রথমে। তাদের ভালোবেসে সেবা করে আগে আপন কর, তারপর দ্বিতীয় পরিবারের সঙ্গে আলাপ কোরো। আলাপ অবশ্য আপনিই হবে, প্রেমের আলো সূর্যের আলোর চেয়ে দ্রুতগামী। তোমাকে আমার চাই সুরং—"

লর্ড লুখ তুলিয়া নিবিষ্টচিত্তে খেজুরি বিবির কথাগুলি শুনিতেছিল। রাখাল বাহিরে গিয়াছিল পালকিতে বিছানা পাতিবার জন্য। কার্তিকও অবাক হইয়া চাহিয়া ছিল খেজুরি বিবির মুখের দিকে। 'তোমাকে আমার চাই সুরং'—এই কথাগুলি একটা দমকা হাওয়ার মতো আসিয়া রহস্যের কুয়াসাটাকে যেন উড়াইয়া লইয়া গেল।

সহসা সে যেন চপলাদির সত্য রূপটা দেখিতে পাইল। তবু তাহার মনের সংশয় ঘুচিল না। তবু সে বলিল, "চপলাদি, সব কথা পরিষ্কারভাবে না জেনে তোমার সঙ্গে নিজেকে জড়াতে পারব না। আমাকে অকপটে সব খুলে বল। আভাসে ইঙ্গিতে এতক্ষণ তোমার যে পরিচয় পেয়েছি তা আলো-আঁধারির মতো রহস্যময়। তাছাড়া আর একটা কথা আছে। নিমুকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। বুঝতে পারছি দেশে আমার বাস্তুভিটেতে আমি যেতে পারব না। কোথাও একটা চাকরি বাকরি জুটিয়ে নতুন বাসা করে সেখানেই নিমুকে নিয়ে আসতে হবে- আমি সেই চেষ্টাই করতে চাই—"

"আমিও সেই ব্যবস্থাই করতে চাইছি তোমার জন্যে। নিমুকে আমারও চাই। খেজুরিতে আমার অনেক ধানের জমি আছে। যদিও গভর্ণমেন্ট সে ধানের অনেক-খানি নিয়ে নেয়, তবু যা বাঁচে তাতে আমাদের খাওয়া-পরা স্বচ্ছন্দে চলবে। তরি-তরকারিও অনেক হয়, পুকুরে মাছ আছে, হাঁস মুর্গিও পুষেছি, গরু আছে। খাওয়ার অভাব হবে না তোমাদের। তোমাকে থাকার জন্যে আলাদা বাড়িও দিতে পারব একটা। তাছাড়া তুমি মাসে মাসে দুশো টাকা করে হাতখরচ যদি পাও—তাহলে তোমার কি চলবে না?"

"মাসে মাসে দু'শ টাকা আমাকে দেবে কে—"

"কে দেবে তা এখন নাই শুনলে। কিন্তু আমি যখন বলছি পাবে, তখন পাবেই।"

"কি কাজ করতে হবে আমাকে?"

"ওই তো বললুম। কাজটা বাইরে থেকে দেখতে সহজ। তোমাকে বিভিন্ন গ্রামের কতকগুলি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অভাব-অভিযোগের খবর নিতে হবে আর সেগুলি মোচন করতে হবে। সস্তায় চাল ডাল গম দিতে হবে তাদের। আর খেজুরির গ্রামের একটি দরিদ্র ভদ্রপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে হবে। তাদের ভালোবেসে তাদের শত দোষ ক্ষমা করে তাদের সেবা করতে হবে। তাদের মানুষ করে তুলতে হবে। পরিবার বড় নয়, একটি ছেলে দুটি মেয়ে, আর তাদের বাবা মা। বাবা সামান্য চাকরি করেন। কাজটা বাইরে থেকে দেখতে সহজ। কিন্তু আসলে খুব কঠিন কাজ। নিঃস্বার্থ, নির্লোভ, চরিত্রবান, প্রেমিক না হলে এ কাজ করতে পারবে না। দু'জন লোক রেখেছিলাম পর পর। তারা কেউ মনোমত হ'লো না। হঠাৎ তোমাকে পেয়ে গেছি সুতরাং, তোমাকে আমি ছাড়ব না, এ কাজের ভার তোমাকে নিতে হবে—"

"এসব কাজে তো অনেক টাকা দরকার। সে টাকা পাচ্ছ কোথায় তুমি।"

"সবই জানতে পারবে। তোমার কাছে কিছুই লুকোব না। কিন্তু তোমাকে একটি মাত্র অনুরোধ করব—কারো কাছে কিছু প্রকাশ কোরো না। করলে আমি মহাবিপদে পড়ব—'

"এতে এত লুকোছাপার কি থাকতে পারে তাতো আমার মাথায় ঢুকছে না।"

"ঢুকবে। খেজুরিতে চল সব বলব। যেতেই হবে তোমাকে।"

লর্ড হঠাৎ কার্তিকের কোলের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া উন্মুখ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর 'কুঁই' 'কুঁই' করিতে লাগিল।

"ওই দেখ তোমার কুকুরও তোমাকে অনুরোধ করছে।"

"অনুরোধ করছে, না মানা করছে কি করে বুঝলে—"

"ওর মুখ দেখে। শুনলাম রাখাল ওকে আজ মাংস খাইয়েছে "

"তাহলে পালিয়ে এল কেন ?"

"তোমাকে ডাকতে এসেছে।"

রাখাল প্রবেশ করিয়া বলিল—"মা, পালকি তৈরী হয়েছে। কুকুরটাকে কি হাঁটিয়ে নিয়ে যাব ?"

"না, ওটা আমার সঙ্গে পালকিতেই যাবে—"

লর্ড হঠাৎ মুখ তুলিয়া একটানা একটা ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ শব্দ করিল, মনে হইল যেন আবদার করিতেছে।

"হ্যা হ্যাঁ তোমাকে ফেলে যাব না, সঙ্গেই নিয়ে যাব, চল না—"

কার্তিক উঠিয়া দাঁড়াইল।

সহসা খেজুরি বিবি তাহার হাত দুইটি ধরিয়া একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড করিয়া বসিল।

"তুমি আমাকে কথা দাও স্মরং, তুমি আমাকে ফেলে পালাবে না। তুমি জান না, আমি সত্যিই বড় অসহায়।"

॥ ৫ ॥

"গঙ্গার ধারের বাংলোটি গোপালদেবের খুব পছন্দ হইয়াছিল। উত্তরদিকে গঙ্গা এবং দক্ষিণে বিস্তৃত 'লন'। ঘরে অনেক জানলা। প্রত্যেক জানলা দিয়াই আকাশ দেখা যায়। তাঁহার সমস্ত ঘরটাই যেন আকাশময়। বাহিরের ঘরটাতে দেওয়াল ঘেঁষিয়া তাঁহার লাইব্রেরির আলমারিগুলি দাঁড়াইয়া আছে। আলমারিগুলির মধ্যেও অনেক আকাশ, অনেক মনের অনেক কবির, অনেক মনীষীর, অনেক প্রতিভার আকাশ। এখানে গোপালদেব ভালোই ছিলেন। তাঁহার যে আত্মীয়টি বাড়ি এবং বিষয়ের উপর দাবী করিয়াছেন গোপালদেবের ব্যারিস্টার তাহার সহিত পাঞ্জা কষিতেছেন এবং গোপালদেবকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, যদিও কিছু সময় লাগিবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি জিতিবেন। গোপালদেব বৈষয়িক লোক নন, সুতরাং বৈষয়িক ব্যাপার তাঁহার মনকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই। তিনি এখন যে পরিবেশে আছেন তাহা তাঁহার অত্যন্ত ভালো লাগিয়াছে, ইহাতেই তিনি সন্তুষ্ট। তাঁহার পুরাতন বাড়ির দ্বিতলের ঘরটার কথা এখন স্বপ্নের মতো তাঁহার মনে পড়ে এবং স্বপ্নের মতোই ভালো লাগে। সেখান হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে কোনও ক্ষোভ নাই, স্বপ্নকে স্বপ্নের মাধুর্য দিয়াই তিনি মণ্ডিত করিয়াছেন, তাহাকে বাস্তবে পান নাই বলিয়া ক্ষুব্ধ হন নাই। তবে তাঁহার চিত্ত যে একেবারে ক্ষোভ-হীন তাহা নহে। গঙ্গার ধারে যে চমৎকার বাংলোটিতে তিনি আছেন তাহার মালিক রামগম্ভীর সিং। খুব বড়লোক। এককালে সে তাঁহার ছাত্র ছিল। তাঁহারই সাহায্যে সে এম-এ পাশ করিয়াছে, ইতিহাসে ডক্টরেটও হইয়াছে। সে যখন তাঁহার নিকট পড়িতে আসিত তখন তিনি বুঝিতে পারেন নাই সে অত বড়লোকের ছেলে। গোপালদেব টিউশনি করিতেন না। যখন যে ছাত্র আসিত এমনিই তাহাদের পড়াইয়া দিতেন। অনেক বাঙালী ছাত্রকেও তিনি পড়াইয়াছেন।

কিন্তু কার্যসিদ্ধি হওয়ার পর অর্থাৎ পাশ করিবার পর কোনও বাঙালী ছেলের টিকি তিনি আর দেখিতে পান নাই। বিহারী ছাত্র রামগম্ভীর কিন্তু মাঝে মাঝে আসিত এবং তাঁহার খবর লইয়া যাইত। তাঁহার বাত হইয়াছিল, সাধারণ ঔষধে কোনও ফল হইতেছিল না. একজন কবিরাজের সহিত পরামর্শ করিয়া সে এক হাঁড়ি শুশুকের তেল তাঁহাকে আনিয়া দিয়াছিল এবং তাহাতে তিনি উপকারও পাইয়াছিলেন। তিনি দাম দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু রামগম্ভীর দাম লয় নাই, বলিয়াছিল—আপনার সেবায় এই সামান্য জিনিস দিলাম এর দাম কি নেব। আমার দাম লাগে নি, আমার জেলে প্রজারা দিয়েছে। সেইদিনই গোপালদেব জানিতে পারেন রামগম্ভীর জমিদারের ছেলে। তখনও জমিদারিপ্রথা লোপ পায় নাই। একদিন আসিয়া বলিল সে নিজেদের গ্রামে একটা স্কুল করিয়াছে. সেই স্কুলের উদ্বোধন দিবসে গোপালদেব যদি যান সে কৃতার্থ হইবে। গোপালদেব বিশেষ কোথাও যান না। তাহার স্কুল উদ্বোধন করিতেও যান নাই। তাহার পর অনেকদিন কাটিয়াছে, আমরা স্বাধীন হইয়াছি, দেশে অনেক রকম রাজনৈতিক ওলটপালট হইয়াছে। হঠাৎ রামগম্ভীর একদিন আসিয়া বলিয়াছিল সার, আপনি এম-পি হইবার জন্য প্রার্থী হোন। যাহাতে আপনি জেতেন তাহার সব বন্দোবস্ত আমি করিয়া দিব। গোপালদেব রাজি হন নাই। কিন্তু তখনই তিনি শুনিয়াছিলেন, এ-অঞ্চলের ভোটদাতারা রামগম্ভীরের কথায় উঠ-বোস করে। রামগম্ভীর নিজে কখনও মিনিস্টার বা এম-পি হইবার চেষ্টা করে নাই। তাহার সাহায্যে অনেক লোক মিনিস্টার হইয়াছে। সে নিজে চাষী। দেহাতে তাহার অনেক জমি আছে। জমি লইয়াই সে থাকে। তাহার 'কামতে' একটি ভালো লাইব্রেরিও সে করিয়াছে। এজন্য গোপালদেবের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য একাধিকবার সে আসিয়াছে তাঁহার কাছে। তখনও গোপালদেব জানিতে পারেন নাই যে এই শহরেই গঙ্গার ধারে তাহার এমন সুন্দর একটি বাড়ি রহিয়াছে। জানিলে এইখানেই তাহাকে লাইব্রেরী করিবার পরামর্শ দিতেন। রামগম্ভীর বাড়িটি করিয়াছিল ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য লইয়াই। তাহার ইচ্ছা ছিল এখানে ঐতিহাসিক মিউজিয়ম করিবে এবং গোপালদেবের তত্ত্বাবধানে সেটি থাকিবে। কিন্তু সিভিল সার্জনের মুখে যখন সে গোপালদেবের মানসিক এবং বৈষয়িক বিপর্যয়ের কথা শুনিল এবং সিভিল সার্জন যখন বলিলেন যে কোনও নির্জন স্থানে কিছুদিন থাকা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত দরকার তখন সে ওই বাড়িটি গোপালদেবের সেবায় উৎসর্গ করিল। গোপালদেবকে সত্যই সে ভক্তি করিত। সুতরাং 'উৎসর্গ' কথাটা কেবল আলঙ্কারিক শোভা হিসাবেই ব্যবহার করিতেছি না. রামগম্ভীরের আন্তরিকতার প্রকাশ করিতে হইলে ওই কথাটাই ব্যবহার করিতে হয়। রামগম্ভীর সিভিল সার্জনকে বলিল. বাড়িটা যে আমার একথা মাস্টার মশাইকে বলিবেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথাটা গোপন রাখা গেল না। গোপালদেব প্রায়ই সিভিল সার্জনকে প্রশ্ন করিতেন, বাড়ির ভাড়া কত, বাড়ির মালিক কে, কোথায় ভাড়া পাঠাইব, এ রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে আমাকে রাখিয়াছ কেন। তখন সিভিল সার্জন একদিন বলিলেন—বাড়ির মালিককে তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব। দিন দুই পরে রামগম্ভীর সসংকোচে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

"কি খবর রাম। ভালো আছো তো। আমি মহা বিপদে পড়েছি। মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল দিন কয়েকের জন্য। সুরেশের চিকিৎসায় এখন অনেকটা

ভালো আছি। এর উপর আর এক মুশকিল হয়েছে, আমার এক আত্মীয় আমার সঙ্গে মকোর্দমা করে আমাকে আমার বাড়ি থেকে উৎখাত করেছে। এখন পরের বাড়িতে এসে থাকতে হচ্ছে—"

রামগম্ভীর সবিনয়ে বলিল—"এটাও পরের বাড়ি নয়। আপনারই বাড়ি—"

"না, না এটা—"

"আপনার ছেলের বাড়ি—"

"আরে না না আমার ছেলে তো "

"আমি কি আপনার ছেলে নই ?"

গোপালদেব বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে রামগম্ভীরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"এটা তোমার বাড়ি ?"

"আপনারই বাড়ি। যতদিন ইচ্ছে থাকুন—"

গোপালদেব নির্বাক হইয়া রহিলেন খানিকক্ষণ।

"কিন্তু তোমাকে এর ভাড়া নিতে হবে রাম।"

"এ কথা কেন বলছেন, কি অপরাধ করেছি আপনার কাছে !"

"অপরাধ কিছু কর নি। তুমি খুব ভালো ছেলে। কিন্তু আমারও একটা আত্মসম্মানবোধ আছে--ইংরেজিতে যাকে 'প্রেস্টিজ' বলে—আমি তোমার মহত্ত্বের সুযোগ নিয়ে তোমার বাড়িতে বিনা পয়সায় থাকব, এটা কি ভালো এটা ভাড়া দিলে তুমি মাসে অন্তত পাঁচশ টাকা পাবে--"

"এ বাড়ি ভাড়া দেবার জন্যে আমি করি নি মাস্টার মশাই। বিশ্বাস করুন, আপনার জন্যেই এটা করেছি আমি। ইচ্ছে আছে এখানে একটা হিস্টোরিক্যাল মিউজিয়াম (historical museum) করব—আপনিই সে মিউজিয়ামের কর্তা হবেন। আপনার আশীর্বাদে আমার সংসারে অসচ্ছলতা নেই, আপনার কাছ থেকে বাড়ি ভাড়া নিয়ে আমাকে সংসার চালাতে হবে না—আপনি আমার বাড়িতে আছেন এতেই আমি কৃতার্থ। আপনি মনে কোন দ্বিধা রাখবেন না। আপনার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি তা অমূল্য—তার দাম কখনও দিতে পারব না। আমার বাড়িতে কিছু দিন বাস করলে—"

গোপালদেব বজ্রকণ্ঠে তাহাকে থামাইয়া দিলেন—"তা হয় না রাম। আমি সেকেলে লোক—আই বিলিভ ইন ওলড্ ভ্যালুজ (I believe in old values). আমি ছাত্রের কাছে কখনও পয়সা নিইনি, কখনও নেব না। তুমি বাঁকা পথে আমাকে টাকা দেবার চেষ্টা কোরো না। যদি ভাড়া না নাও, আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব !"

রামগম্ভীর হেঁটমুখে কয়েক মুহূর্ত বসিয়া রহিল। তাহার পর উঠিয়া পড়িল। বলিল—"আচ্ছা ভেবে দেখি, পরে জানাব আপনাকে।" প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। দশ দিন কাটিয়া গিয়াছে এখনও রামগম্ভীরের কোনও খবর আসে নাই। গোপালদেবের মনে একটা ক্ষোভ জমিয়া উঠিতেছে, কেবলই মনে হইতেছে সকলেই আমাকে অনুগ্রহ করিতেছে। যে নার্সটি সুরেশ এখানে বাহাল করিয়াছে সে-ও বেতন সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করে না। গোপালদেব একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সে বলিল—সুরেশবাবু আমাকে মাইনের কথা কিছু বলেন নি। তিনি যা ঠিক করবেন তাই হবে। সুরেশকে (সিভিল সার্জন) একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন—"নার্সটির মাইনে কত ?

এতদিন কাজ করছে এখনও তো দিইনি কিছু। চায় না, কাল জিগ্যেস করাতে বললে তুমি যা ঠিক করবে তাই হবে।"

"কেমন লাগছে মেয়েটিকে—"

"চমৎকার!"

"কি হিসেবে চমৎকার ?"

"নিজেকে কখনও থ্রাস্ট (thrust) করে না। অকারণে কাছে-পিঠে ঘুরঘুর করতে দেখিনি কখনও। নেপথ্যেই থাকে, অথচ মনে হয় বাড়িটা পূর্ণ করে আছে। তুমি যা যা করতে বলেছ তা ভালোভাবে করে তো ?"

"হ্যাঁ। কোন খুঁত ধরতে পারি নি। ওর মাইনে একশ টাকা করে দেব ভেবে রেখেছি—"

"বেশ। টাকাটা নিয়ে যাও তাহলে আমার কাছ থেকে!"

"দাঁড়াও দাঁড়াও অত ব্যস্ত হ'য়ো না। একটা কথা আছে—"

"কি—"

"নার্সের মাইনে প্রবাল দেবে বলেছে। বলেছে বাবার সেবা করবার সুযোগ পাইনি জীবনে। আমাদের তিনি কাছে ঘেঁষতে দেবেন না। এই সুযোগটা অন্ততঃ আমাকে দিন। নার্সের মাইনেটা আমি দেব। আমি তাকে বলেছি, বেশ দিও। তাই তোমার কাছে চাইনি—"

সুরেশবাবু আড়চোখে একবার গোপালদেবের দিকে চাহিলেন। গোপালদেব খানিকক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া পা নাচাইলেন। তাহার পর বলিলেন—"দেখ, যে লোকটা নিজের গায়ের জোরে স্বচ্ছন্দে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে পারে তার প্রতি অনুগ্রহ করে কেউ যদি তাকে কাঁধে করে তুলে নিয়ে যেতে চায় তা যেমন হাস্যকর হয় তোমরা তেমনি করছ। কারো অনুগ্রহের কিছুমাত্র দরকার নেই আমার, অথচ তোমরা সবাই আমাকে অনুগ্রহ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছ। রামগম্ভীর বাড়ির ভাড়া নিতে চাইছে না, ভেবে দেখি বলে সেই যে চলে গেছে আর কোনও খবর দেয়নি। আমার উপর এতো অনুগ্রহ বর্ষণের মানে কি। আমি কারও অনুগ্রহভাজন হ'তে চাই না—"

"তুমি ভুল করছ গোপাল। প্রশ্নটা অনুগ্রহের নয়, কর্তব্যের। তোমার ছেলে, তোমার শিষ্য তাদের কর্তব্য পালন করছে তাতে তুমি বাধা দিচ্ছ কেন ?"

"আমার শিষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধটা আধ্যাত্মিক থাকুক এইটেই আমি বরাবর চেয়ে এসেছি, সেটাকে আর্থিক নোংরামির মধ্যে নামিয়ে আনতে চাই না। দরকার হলে হয়তো নামিয়ে আনতে হ'ত কিন্তু আমার সে দরকার নেই। আর ছেলের কথা বলছ ? যে ছেলে আমার আদর্শের মুখে লাথি মেরে চোং প্যান্ট পরে বেলেল্লাগিরি করে বেড়াচ্ছে, যে নীচ বংশের মেয়েকে বিয়ে করে আমাদের বংশে কালি দিয়েছে তার কাছ থেকে অর্থসাহায্য নেব একথা যদি তুমি ভেবে থাক তাহলে বলব এতদিনের বন্ধুত্ব সত্ত্বেও তুমি আমাকে চেনোনি। তার মা তাকে 'নাই' দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছে কারণ—"

সুরেশবাবু বাক্যটি সম্পূর্ণ করিয়া বলিলেন—"কারণ তিনি মা, সর্বংসহা বসুমতীর মতো মা-ও সর্বংসহা। যে ছেলে মাকে রোজ মারে সে ছেলেকেও মা ছেড়ে

যেতে পারে না। কিন্তু তোমার ছেলে অত খারাপ নয়। সে ভালো ছেলে। সে-ও আদর্শবাদী, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তার আদর্শের সঙ্গে তোমার আদর্শের মিল নেই। তুমি যদি চেষ্টা করতে হয়তে মিল হ'ত। কিন্তু তুমি চেষ্টা করনি—"

"তার মানে ?"

"তুমি নিজেকে নিয়েই সব সময় কাটিয়েছ। ওদের আদর্শ গঠন করবার দিকে মন দাওনি। ওরা পরিবেশ অনুসারে নিজেদের আদর্শ নিজেরাই গড়েছে—"

গোপালদেব কোন উত্তর দিলেন না। নির্বাক বিস্ময়ে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুরেশবাবু বলিয়া চলিলেন—"একথাটা ভুললে চলবে না যে আমাদের মধ্যে পশুত্ব এবং মনুষ্যত্ব দুটো জিনিসই পাশাপাশি স্ফুরিত হয়। এদের নিজের মনোমত করতে হ'লে অনেক খাটতে হয়, নিম্নস্তরের প্রাণীদের 'ট্রেন' করতে খুব বেশী খাটতে হয় না। একটা লতাকে অতি সহজে নিজের ইচ্ছামতো যে কোনও দেওয়ালে বা যে কোনও বেড়ায় ওঠানো যায়, কিন্তু কুকুরকে 'ট্রেন' করতে হলে আরও পরিশ্রম করতে হবে, কারণ তার মধ্যে স্বাধীন ব্যক্তিত্বটা যাকে ইংরাজিতে বলে individuality আরও প্রবল, তা সহজে কারো কাছে নতিস্বীকার করতে চায় না। মানুষকে 'ট্রেন' করা আরও কঠিন। কারণ তার মনুষ্যত্ব আরও স্বাধীন আরও পরিস্ফুট। তাকে নিজের আদর্শের অনুরূপ করতে হ'লে অহরহ তাকে নিজের কাছে রেখে সেই আদর্শের মন্ত্র তার কানের কাছে জপ করতে হবে, তাকে বাইরের প্রভাব থেকে বাঁচাতে হবে, নিজের চারিত্রিক আদর্শ তার কাছে অম্লান রাখতে হবে এবং সর্বোপরি তাকে ভালোবাসতে হবে। ভেবে দেখ, তুমি এর কতটুকু করেছ ?"

গোপালদেব মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু মুখে বলিলেন—"যতটা করা সম্ভব ততটা করেছি বইকি। ভালো ভালো মাস্টার রেখেছি ওদের জন্য, ভালো ভালো স্কুলে কলেজে ভরতি করে দিয়েছি, বাপের পক্ষে ছেলেমেয়েদের যতটা ভালোবাসা স্বাভাবিক এবং সম্ভব ততটা ভালোও বেসেছি। তার ফল যে এই হবে—"

"ফল কিছু খারাপ হয়নি। প্রবাল ভালো ছেলে। তবে সে তোমার আদর্শের অনুরূপ হয়নি। তার কারণ সেজন্য তোমার একাগ্র চেষ্টা ছিল না। ছেলে-মেয়ে মানুষ করা অনেকটা ছবি আঁকার মতো। তোমার ছবি তোমাকেই আঁকতে হবে, অপরের সাহায্য নিয়ে আঁকলে সে ছবি তোমার ছবি হবে না, তাদের ছবি হবে। তবে এটা জেনে রেখো প্রবাল খারাপ ছেলে নয়। তার পোষাক-পরিচ্ছদ হাব-ভাব মতামত হয়তো তোমার সঙ্গে মেলে না কিন্তু তবু বলব সে খারাপ ছেলে নয়। আর এটাও বলব তার সঙ্গে তোমার অমিলের চেয়ে মিলই বেশী আছে, যদিও বাইরেটা অন্য রকম। তুমিও কি তোমার পূর্বপুরুষদের হুবহু নকলমাত্র ? তাঁরা গোঁফ দাড়ি রাখতেন, তুমি ক্লীন শেভ্‌ড্‌। তারা বহুবিবাহে বিশ্বাসী ছিলেন, তুমি একটি মাত্র বিবাহ করেই হাঁপিয়ে পড়েছ, তাঁদের কেউ কেউ হয়তো তান্ত্রিক ছিলেন, মা কালীর সামনে নরবলি দেওয়া অন্যায় মনে করতেন না, তুমি নিশ্চয় সেটা সমর্থন কর না, তাঁদের পণপ্রথা, তাঁদের কৌলিক আচার-বিচার, তাঁদের দশবিধ সংস্কার—এর অধিকাংশই তুমি মান না। তাতে কিছু ক্ষতিও হয়নি, তুমি ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংরেজি আদর্শে নিজেকে গড়েছ। পূর্বপুরুষের নকল নও বলে মানুষ হিসাবে তুমি

খারাপ হওনি। তুমি চরিত্রবান, বিদ্বান, সত্যনিষ্ঠ, ভণ্ডামিকে ঘৃণা কর,—তোমার ছেলে প্রবালও তাই। সে যদি বাজে দুশ্চরিত্র ছেলে হ'ত তাহলে আলতাকে সে বিয়ে করত না, ফেলে পালাতো। সে-ও ভণ্ডামিকে ঘৃণা করে বলে তোমার কাছে বা তার মায়ের কাছে ছদ্মবেশের মুখোস পরে ঘুরে বেড়ায় নি। সে যা ভালো মনে করে তা প্রকাশ্যেই করেছে, প্রকাশ্যেই বলেছে। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে তার অমিলের চেয়ে মিলই বেশী। তোমার মতো সে-ও গোঁয়ার-গোবিন্দ। সে—"

গোপালদেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "সে কি তোমাকে উকিল নিযুক্ত করেছে না কি!"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন সুরেশ ডাক্তার।

"সে আমাকে কিছুই বলেনি।"

"তুমি বলেছিলে তার ভোজের খরচ সে অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে গেছে। লটারির টাকা পেয়েছে না কি!"

সুরেশবাবু স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "টাকাটা আমিই দিয়েছিলাম তাকে। আলতাকে একখানা বেনারসী শাড়ী আর আড়াই হাজার টাকার চেক দিয়েছিলাম আমি—"

"তুমি একাজ করতে গেলে কেন?"

"দেখ ভাই, আমি ব্যাচিলার মানুষ; তুমি আমার বাল্যবন্ধু। প্রবালকে আমিও ছেলের মতো ভালোবাসি। তাছাড়া তোমার উপর টেক্কা দেবার ইচ্ছা হল—ছেলেবেলায় তোমার ঘুড়ি কেটে দিতাম—সে প্রবৃত্তিটা আমার যায়নি এখনও।"

সুরেশবাবু আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"আমার এই গণ্ডমূর্খ অসভ্য ছেলেটাকে তোমার ভালো লাগে? তোমার সম্বন্ধে ধারণাই বদলে গেল আমার!"

"তোমার ছেলে গণ্ডমূর্খও নয়, অসভ্যও নয়। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ভালো করতে পারেনি, কিন্তু সে গণ্ডমূর্খ নয়। পরীক্ষায় পাশ করার দিকে বাঙালী ছেলের আর উৎসাহ নেই। তোমাদের সময় তোমরা জানতে যে পরীক্ষা পাশ করলেই তোমরা একটা কেষ্ট-বিষ্টু হতে পারবে, হ'তেও, কিন্তু এখন আর সে আশা নেই। এখন আমাদের দেশের অধিকাংশ ভালো ছেলেরা বেকারের দলে। কম্‌পিটিটিভ্ (competitive) পরীক্ষাতেও পক্ষপাতের বিষ ঢুকেছে। তাই পরীক্ষা পাশ করার দিকে বাঙালী ছেলের আর তেমন উৎসাহ নেই। উৎসাহ না থাকার আর একটা কারণ তোমাদের সময় স্কুল কলেজে যে রকম শিক্ষক ছিলেন আজকাল আর সে রকম নেই। আজকাল অধিকাংশ মাস্টার প্রফেসারই অর্থলোলুপ দোকানদার। হয়তো বাধ্য হয়েই তারা দোকানদার হয়েছে, কিন্তু হয়েছে বলে ছেলেমেয়েদের শ্রদ্ধা আর আকর্ষণ করতে পারছে না তারা। আগে আমরা আমাদের শিক্ষকদের নিয়ে আড়ালে আবডালে একটু আধটু ঠাট্টা মশকরা করতুম—যেমন হেরম্ব মৈত্র, মনমোহন ঘোষ, আমাদের মেডিকেল কলেজের গ্রীন আরমিটেজ, অ্যানাটমির শিক্ষক নগেন চাটুজ্যে, বসাক—কিন্তু এদের আমরা শ্রদ্ধাও করতুম খুব। আজকালকার ছেলেমেয়েরা কোনও শিক্ষককে শ্রদ্ধা করতে পারে না। সকলেরই উপর তাদের ঘৃণা আর অশ্রদ্ধা তাদের চরিত্রকে বিষময় করে তুলেছে। শুধু শিক্ষকদের উপর নয়, গভর্ণমেণ্টের উপর, নেতাদের উপর, লেখকদের

উপর, ব্যবসায়ীদের উপর—কারো উপরই এ যুগের ছাত্ররা সশ্রদ্ধ হ'তে পারছে না, তাদের মনে হচ্ছে সবাই চোর, সবাই মতলববাজ। এই অশ্রদ্ধারই নানাবিধ প্রকাশ দেখেছি ছাত্র-আন্দোলনে। ওরা খারাপ নয়, ওরা ডিস্অ্যাপয়েনটেড্ (disappointed)—দু'চারজন গুণ্ডাপ্রকৃতির খারাপ ছেলে যে ওদের মধ্যে নেই তা বলছি না, কিন্তু অধিকাংশ ছেলেই ভালো, তারা আরও ভালো হতে চায়—কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তাই বিদ্রোহ করছে। যা কিছু পুরাতন তাই ভেঙে ফেলবার জন্য তারা উদ্যত—যে মনোভাব হ'লে লোকে আত্মহত্যা করতেও দ্বিধা করে না, ওদের সেই রকম মনোভাব। লেখাপড়াতেও এ যুগের ছেলেরা যে সবই খারাপ তা নয়, ওদের মধ্যে অনেক ভালো ছেলে আছে। তোমার প্রবালও খুব ভালো ছেলে। সে মূর্খ নয়। তার সঙ্গে কথা কয়ে দেখেছি তার বিদ্যে 'রীডার্স ডাইজেস্ট' বা বিলিতী-বিজ্ঞাপন-গান্ধী-খবরের-কাগজ পড়া পল্লবগ্রাহিতা নয়। অনেক ভালো বই পড়েছে সে। শেকস্‌পীয়র শেলী রবীন্দ্রনাথ তার কণ্ঠস্থ, তোমার সব লেখাও তন্ন তন্ন করে পড়েছে, সেদিন দেখলাম শেল-উল-মুতাক্ষরিণের অনুবাদ পড়ছে। খুব পড়ে—"

"তার সঙ্গে তোমার এত আলাপ হল কি করে?"

"সে আমার বন্ধু যে। আমার বাড়িতে রোজ 'ব্রীজ' খেলতে আসে। ব্রীজও খুব ভালো খেলে—"

হঠাৎ গোপালদেব বলিলেন—"একটা কথা তুমি জেনে রাখ সুরেশ, তোমার চক্ষে প্রবাল যতই ভালোই হোক আমার আত্মসম্মানকে সে ক্ষুণ্ণ করেছে। তার সঙ্গে আপোস আমি করতে পারব না। করবার দরকারও নেই। নীলা আর মগনলাল শুনলাম বিলেত চলে গেছে। যাক। যে যেখানে গিয়ে সুখে থাকে থাকুক, কিন্তু আমি কারও সঙ্গে আপোস করব না। আমার মহান আছে, আর ওই নার্স মেয়েটিও খুব ভালো, ওরা যদি টিকে থাকে, আমার চলে যাবে—মহান—"

মহাদেব দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইতেই বলিলেন—"আমার চেক বুকটা দিয়ে যাও তো—"

মহাদেব চলিয়া গেলে সিভিল সার্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলারা বিলেত চলে গেছে এ খবর তোমাকে কে দিলে?"

"আমার পাবলিশার। যাবার আগে সে নাকি আমার এক সেট বই তাদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে গেছে। আমার নামে একটা চিঠিও লিখে রেখে গেছে। মগন আমারই ছাত্র। লিখেছে ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্যেই সে বিলেত যাচ্ছে। যে থীসিস সে লিখবে তাতে সে আমার লেখা থেকে কিছু কিছু 'কোটেশন' দিতে চায়, তাই আমার অনুমতি চেয়েছে।"

"তুমি অনুমতি দিয়েছ?"

"আমি নিজে কোনও চিঠি লিখি নি। আমার হ'য়ে আমার পাবলিশারই অনুমতি দিয়েছেন। আপত্তি করিনি। ছাপা বই থেকে যে কেউ কোটেশন' করতে পারে—"

মহাদেব 'চেক বুক' লইয়া হাজির হইল।

"সুরেশ তোমাকে ওই নার্সটির এক বছরের মাইনে এই চেকে দিয়ে দিচ্ছি। তুমি কে দিয়ে দিও—"

"আহা ওর জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন তুমি। পরে দিলেও চলবে—"

"যদি না নাও, তাহলে কাল থেকে ওর আসবার দরকার নেই—"

"বেশ দাও তাহলে। সত্যি কি জেদী তুমি! মেয়েটিকে তোমার ভালো লেগেছে তো?"

"খুব ভালো লেগেছে—"

গোপালদেব আড়াই হাজার টাকার একটা চেক লিখিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন—"একশ' টাকা মাসে খুব কম হয়। আমি দু'শো টাকা দিতে চাই। আর একশ' টাকা বেশী দিলাম. ওকে একখানা ভালো শাড়ি কিনে দিও—"

"হঠাৎ এরকম বদান্যতা!"

গোপালদেব কয়েক মুহূর্ত নীরব রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"মেয়েটি সত্যিই ভালো। এখানে বাথরুমে 'ফ্লাশ্' নেই, খারাপ হয়ে গেছে। আমি একটা আলাদা কমোড কিনে সেইটেই ব্যবহার করি, একটা মেথর এসে রোজ পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। দু'দিন মেথর আসেনি। মহানের কাছ থেকে শুনলাম ওই মেয়েটিই কমোড পরিষ্কার করেছে, অথচ আমাকে কিছুই জানতে দেয়নি। আমি ভেবেছিলাম মেথরই এসে বুঝি পরিষ্কার করে গেছে। তারপর ব্যাপারটা মহানের কাছে শুনলাম। ও আমাকে কিছু বলেনি কিন্তু। এইটেই আমার খুব ভালো লেগেছে। ওকে ভালো একটা শাড়ি কিনে দিও। যদি একশ' টাকার বেশীও লাগে তা-ও দেব আমি—"

"চেকটা যখন আমার নামে লিখেছ তখন আমার ব্যাংকেই জমা করব। আমিই ওকে মাসে মাসে মাইনে দেব। শাড়িটা এখন দেব না।"

"কেন?"

"হঠাৎ একটা দামী শাড়ি দিলে সেটা একটু দৃষ্টিকটু দেখাবে। কয়েক মাস পরেই তো পুজো, তখন দিলেই হবে। এখন হঠাৎ শাড়ি দিলে লোকে কানাঘুষো করবে। ভাববে, ওর সম্বন্ধে তোমার দুর্বলতা হয়েছে—"

"লোকের কানাঘুষোকে আমি গ্রাহ্য করি না। আর মেয়েটির সম্বন্ধে সত্যিই তো আমার দুর্বলতা হয়েছে। ওকে ভালো লেগেছে। ভাবছি ও যেন আমার নীলা—ছেলেবেলায় যে আমার 'পাঁসপট' পরিষ্কার করত—"

হঠাৎ থামিয়া গেলেন গোপালদেব।

তারপর বলিলেন—"কালই কিনে দিও ওকে শাড়টা—"

"দেব, দেব, ব্যস্ত হচ্ছ কেন?"

"না, কালই দিও।"

ছেলেমানুষের মতো জিদ করিতে লাগিলেন গোপালদেব।

"বেশ তাই দেব। তুমি এখনও বড্ড ছেলেমানুষ আছ গোপাল। ভালো কথা, এখনও তেমনি ভিশন (vision) টিশন দেখ—"

"দেখি বই কি। ওই নিয়েই তো আছি। আগে ইতিহাসের কথা কাগজে লিখতাম, বইয়ে পড়তাম, এখন তা চোখের সামনে আকাশে মূর্ত হ'য়ে ওঠে। ভারি ভালো লাগে। সত্যের সঙ্গে কল্পনা, কল্পনার সঙ্গে আশা-আকাঙ্ক্ষার নানা ছবি দেখি।"

"কি ছবি দেখছ আজকাল—"

"কেন জানি না, গোপালদেবই যেন আজকাল আমার উপর ভর করেছেন। তাঁ

সম্বন্ধে ইতিহাসে বিশেষ কিছু লেখা নেই, সেই জন্যে তাঁকে নিজের মতো করে গড়ছি। ভাবতে ভালো লাগছে যে সেই মাৎস্যন্যায়ের যুগে তিনি তাঁর চরিত্রবলে ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শকে—ওল্ড্ ইটারনাল ভ্যালুজকে (old eternal values) সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন বলেই সবাই তাঁকে নেতারূপে বরণ করেছিলেন। বিরাট আঁস্তাকুড়ের মাঝখানে মহীরুহের মতো উঠেছিলেন তিনি নিজের চরিত্রবলে এবং সেই চরিত্রবলের উৎস ওল্ড ইটারনাল ভ্যালুজ। বিশুদ্ধ এবং দৃঢ়চরিত্র মানুষই সূর্যের মতো সব অন্ধকার দূর করে। এ যুগে তার একটিমাত্র নমুনা স্বামী বিবেকানন্দ। খাঁটি সোনার মূল্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। গোপালদেব খাঁটি সোনা ছিলেন। শশাঙ্কও সোনা ছিলেন, কিন্তু খুব খাঁটি নয়। আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় রাজ্যশ্রীর সঙ্গে তাঁর একটা অবৈধ প্রণয় ছিল। সে প্রণয়কে তিনি সাবলিমেট (sublimate) করতে পারেননি। তিনি ওই নিয়ে রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে, মৌখরিদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। এই জন্যেই সম্ভবত অনেকে তাঁর শত্রু হয়েছিল। তিনি যদিও বাহুবলে আমরণ রাজত্ব করে গিয়েছিলেন, কিন্তু গোপালদেবের মতো কোন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হ'য়ে গেল সব। তার পরই অনৈক্য, আত্মকলহ, বহিঃশত্রুর পুনঃপুনঃ আক্রমণ এবং এর ফলে মাৎস্যন্যায়। এরপরে গোপালদেবের আবির্ভাব। আমার মনে হয়, এ আবির্ভাবের মূলে আছে 'ওল্ড্ ভ্যালুজ' (old values)—আর্য ঋষিরা একদিন যেমন দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন—শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ …গোপালদেবও তেমনি বলেছিলেন—"জাগো, ওঠ। পাঁকে ডুবে আর কতদিন থাকবে—পাঁক ধুয়ে ফেল, মানুষের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়াও আকাশের দিকে চেয়ে

সুরেশবাবু জানিতেন গোপালদেবের ইতিহাস ম্যানিয়া (mania) একবার মাথা চাগাড় দিলে সহজে থামিবে না। তিনি তাঁহার সামনে থাকিলে অনবরত বকবক করিবেন।

বলিলেন—"এখন চলি আমি। দু'একটা রোগী দেখতে হবে। বাকিটা পরে এসে একদিন শুনে যাব। তোমার এ বাড়িটা ভালো লাগছে তো ?"

"খুব। কিন্তু তুমি রামগম্ভীরকে একটা খবর দিও। তাকে ভাড়া নিতে হবে। তা না নিলে আমি এখানে থাকব না।"

"সে তো এখানে থাকে না। আমি সুখলালকে বলে যাচ্ছি।"

"সুখলাল কে—"

"তার এ অঞ্চলে যত বাড়ি আছে তার ম্যানেজার। খান দশেক বাড়ি আছে ওর এ শহরে।"

"ও যে এত বড়লোক তা তো জানতাম না।"

"শুধু টাকার দিক দিয়ে বড়লোক নয়, মনের দিক দিয়েও রাম বড়লোক। সুখলাল তো ওর প্রশংসায় গদগদ। বলে, দেওতা। আচ্ছা, আসি এখন। বলব সুখলালকে।"

সিভিল সার্জন চলিয়া গেলেন।

আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন গোপালদেব। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ত্রিধার ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করিলেন আবার। তাঁহার অঙ্গে রঙ্গন ফুলের

অলংকার, কণ্ঠে পলাশের মালা। মাথায় গৈরিক শিরস্ত্রাণ, তাহাতে কৃষ্ণচূড়ার একটি পুষ্পিত পল্লব অগ্নিশিখার মতো জ্বলিতেছে। পরিধানে গৈরিক বসন গৈরিক উত্তরীয়।

সূত্রধার বলিলেন—"সভ্য মানুষ শবদেহকে পুড়িয়ে ফেলে কিংবা পুঁতে ফেলে। কেউ কেউ তাদের শকুনিদের মুখে সমর্পণ করে দেয়। একটা সাধারণ মানুষের শবদেহ নিঃশেষ হ'তে সময় লাগে না। দেখতে দেখতে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু যাঁরা বৃহৎ, যাঁরা কীর্তি রেখে যান, তাঁদের বৃহত্ত্ব, তাঁদের কীর্তি লোপ পেতে কিছু সময় লাগে। বৃহৎ জন্তুও যখন মরে—যেমন হাতী বা গণ্ডার—তাদের শেষকৃত্য মানুষে যদি না করে তাহলে তাদের শবদেহও পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ চট্ করে শেষ করতে পারে না। বৃহৎ কীর্তি শেষ হতে অনেক সময় শতাধিক বৎসর লাগে। ওই দেখুন শশাঙ্কের কীর্তির ধ্বংসস্তূপের উপর শকুনি গৃধিনীর দল এসেছেন। ওই যে মঙ্গোলিয়ান মুখ দেখেছেন উনি তিব্বতের রাজা আর তাঁর পিছু পিছু আসছেন গুপ্তবংশের সম্রাটরা, ওই দেখুন আগুন জ্বলছে—ওঁরা টিকতে পারলেন না—জনমতের আগুনে আর ধোঁয়ায় সরে পড়ছেন সব। তারপর ধোঁয়া ধোঁয়া—ধোঁয়া—কেবল ধোঁয়া—"

গোপালদেব বিস্ফারিত নয়নে দেখিতে লাগিলেন আকাশপটে কৃষ্ণবর্ণ ধূম-কুণ্ডলী বিসর্পিত হইতেছে, তাহার মাঝে মাঝে ক্বচিৎ অগ্নিশিখা। দেখিতে দেখিতে এ ছবিও ক্রমশ অপসৃত হইল। শস্যশ্যামল একটি ছবি আকাশপটে মূর্ত হইল আবার। আকাশচুম্বী মন্দিরচূড়া, কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে।

সূত্রধার বলিলেন—"অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে সমৃদ্ধ পুণ্ড্রদেশের চিত্র ওই আকাশপটে আভাসিত হয়েছে। কিন্তু এ সমৃদ্ধিও বেশী দিন থাকে নি। ওই দেখুন শৈলবংশীয় একজন রাজা এসে পুণ্ড্রদেশ জয় করেছেন। হাহাকার উঠেছে চতুর্দিকে—"

হাহাকারে চীৎকারে গর্জনে আর্তনাদে বিলাপে চতুর্দিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। একজন তন্বী শ্যামা সুন্দরীকে কে যেন জোর করিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। সূত্রধার বলিলেন—"উনি পুণ্ড্রদেশের রাজলক্ষ্মী, বেশী দিন শৈলবংশীয় রাজার কবলে থাকেন নি। ওই দেখুন কনৌজের রাজা যশোবর্মা সসৈন্যে অগ্রসর হচ্ছেন—"

আবার রণাঙ্গনের চিত্র ফুটিয়া উঠিল আকাশে। কিন্তু তাহাও মিলাইয়া গেল দেখিতে দেখিতে। ইহার একটু পরেই কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল কে যেন। সূত্রধার বলিলেন, "কনৌজের রাজকবি বাক্‌পতিরাজ প্রাকৃত ভাষায় রচিত তাঁর 'গৌড়বহো' কাব্য পাঠ করেছেন। এ কাব্যে তিনি বঙ্গরাজ্যের রণ-হস্তিবাহিনীর উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ওই দেখুন যশোবর্মার রাজ্যও টিকল না। কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটল। ওই দেখুন ওই কাশ্মীরের রাজকবি কল্‌হন আসছেন। তাঁর হাতে 'রাজতরঙ্গিণী'।"

কল্‌হন রাজতরঙ্গিণী খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। বহুকাল পূর্বে গোপালদেব রাজতরঙ্গিণী পড়িয়াছিলেন, তাহা বাংলা ভাষায় লেখা নয়, কিন্তু তাহার মনে হইল কল্‌হন যেন চলতি বাংলা ভাষাতেই বলিতেছেন—"ললিতাদিত্য গৌড়রাজকে

কাশ্মীরে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিষ্ণুমূর্তি স্পর্শ করে শপথ করেছিলেন যে কাশ্মীরে তাঁর কোন বিপদ ঘটবে না। কিন্তু কাশ্মীরেই তাঁকে হত্যা করেন ললিতাদিত্য। এই ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বাংলা থেকে গৌড়রাজের কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর কাশ্মীরে যান তীর্থযাত্রার ছলে। তাঁরা উক্ত বিষ্ণুমূর্তিটি ভেঙে ফেলবার জন্যে মন্দিরে প্রবেশ করেন। কিন্তু ভুলক্রমে তাঁরা ভাঙতে আরম্ভ করেন আর একটি মূর্তি। ইতিমধ্যে কাশ্মীররাজার সৈন্যরা এসে তাঁদের বধ করে। ওই বাঙালী বীরগণের প্রভুভক্তি ও আত্মোৎসর্গের প্রশংসা আমি উচ্চকণ্ঠে করছি। উক্ত মন্দিরটি আজ শূন্য, কিন্তু গৌড়বীরগণের প্রশংসায় আজ পৃথিবী পূর্ণ। তাঁদের মহিমার জয় হোক।" কল্হন্ বলিতে লাগিলেন—"কিন্তু মনে হয় পুণ্ড্ররাজ্য বেশী দিন ললিতাদিত্যের বশ্যতা স্বীকার করেনি, কারণ, তাঁর পৌত্র জয়াপীড় দিগ্বিজয়ে বার হন আবার এবং সেই সুযোগে তাঁর মন্ত্রী জজ্ঞ তাঁর রাজ্য দখল করে। তাঁর সৈন্যরাও তাঁকে ত্যাগ করে পালায়। জয়াপীড় ছদ্মবেশে পুণ্ড্রবর্ধনে হাজির হয়ে দেখেন যে সেখানে জয়ন্ত নামে একজন সামন্ত রাজা রাজত্ব করছেন। ছদ্মবেশী জয়াপীড় জয়ন্তের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং গৌড়ের পাঁচজন রাজাকে পরাস্ত করে তাঁর নিজের শ্বশুরকে অর্থাৎ জয়ন্তকে তাঁদের অধীশ্বর করেন।' সূত্রধার বলিতে লাগিলেন, পট বারংবার পরিবর্তন হয়েছে। ভগদত্ত বংশীয় রাজা হর্ষও গৌড়ে রাজত্ব করেছেন। খড়্গবংশীয় রাজারাও—খড়্গোদ্যম, জাত-খড়্গ এবং দেব-খড়্গ। তারপর দেবখড়্গের পুত্র রাজরাজ (কারও মতে রাজরাজভট) বাংলা দেশের রাজা ছিলেন। অনেক মনে করেন গোপালদেব এই রাজরাজভট বংশ থেকে উদ্ভূত। এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে।"

গোপালদেবের অন্তরতম সত্তা কিন্তু অনুভব করিল মতান্তর থাকুক তবু ইহাই সত্য কথা। তিনিও বোধহয় ওই খড়্গবংশের সন্তান। তাঁহার পূর্বপুরুষ জীমূতবাহন এবং তাঁহার তরবারিটির কথা তাঁহার মনে পড়িল। ওই তরবারির প্রতি, ওই খড়্গের প্রতি জীমূতবাহনের অসীম ভক্তি ছিল। প্রতি কালীপূজায় রাত্রে তিনি ওই খড়্গকে পূজা করিতেন। গোপালদেব তরবারিটি এখানেও আনিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখেই টাঙানো ছিল সেটা। সহসা সেই তরবারির ভিতর হইতে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ বাহির হইয়া গোপালদেবকে বলিলেন—"দেখ গোপাল, অসত্য, অশিব এবং অসুন্দরকে ছিন্নভিন্ন করে সত্য শিব সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করাই আমার কাজ। কিন্তু সে কাজ আমি করি শক্তিধর, নিঃস্বার্থপর আদর্শবাদী বীরের সাহায্যে। আমি মহাকালীর হস্তে বিরাজ করি, যিনি শবারূঢ়া, মহাভীমা, ঘোরদংষ্ট্রা, বরপ্রদা, যিনি মুক্তকেশী, লোলজিহ্বা, যিনি মুহুর্মুহুঃ পাপীদের রক্ত পান করেন তাঁরই হস্তের অমোঘ আয়ুধ আমি। পাপের অন্ধকারে যখন পুণ্যের আলো নিবে যায়, যখন পাপীদের পাপের কালিমাই অমাবস্যা-রূপ ধারণ করে, তখনই গৌরী কালীরূপে আবির্ভূতা হন। সরমস্মিনগ্ধা বধূরূপিণী উমাই তখন হন ডলঙ্গিনী করালবদনা—সদ্যশ্ছিন্ন-শিরঃখড়্গ-বামাধোর্ধ্ব-করাম্বুজা কালী—আমারই সাহায্যে তিনি তখন বিনাশ করেন পাপকে, ধ্বংস করেন পাপীদের —"

জ্যোতির্ময় পুরুষ সহসা থামিয়া গেলেন। তাহার পর মুদিতনয়নে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

"ঘনকৃষ্ণ অত্যাচার ধরে যবে অমাবস্যা রূপ
আর্তদের হাহাকার অন্ধকারে যবে পুঞ্জীভূত
নিরুপায় মনুষ্যত্ব ধূলিতলে যবে বিলুণ্ঠিত
তমিস্রায় অবলুপ্ত পর্বত-সাগর-নদী-কূপ,
নিদারুণ সে সংকটে তোমার ভীষণা মূর্তি ভায়,
অত্যাচারে অবিচারে গৌরী হন উলঙ্গিনী কালী,
খল খল অট্টহাস্যে কাঁপে ধরা, দেয় করতালি
ভূত প্রেত পিশাচেরা ভয়ংকর শ্মশান-সভায়।
সে সভার সভানেত্রী তুমি কালী অমাবস্যার
সে সভায় বজ্রকণ্ঠে তব তীক্ষ্ণ তুরীয় ভাষণ
শূন্য-গর্ভ বাক্য নহে—পাতকীর অন্তিম শাসন,
খড়্গ-মুখে সমাধান করে দাও সব সমস্যার।
লোল-জিহ্বা, এলোকেশী, নেত্রী তুমি সকল ক্লান্তির
উৎখাত করিছ নিত্য যুগে যুগে সকল ভ্রান্তির।"

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন তিনি। তাহার পর বলিলেন, "আমি সেই খড়্গ। এইমাত্র সূত্রধারের জাদুমন্ত্রবলে আকাশপটে বাংলাদেশে অনেক রাজ্যের উত্থান পতন তুমি ছবির মতো দেখলে, কাহিনীর মতো শুনলে। তোমারই অন্তর্নিহিত জ্ঞান সূত্রধার-রূপে মূর্ত হ'য়ে পুরাতন কথা তোমাকে শুনিয়ে গেল। আর একটা কথাও তুমি জান, কিন্তু সেটা তবু আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। আমাদের দেশে বাইরে থেকে এত শত্রু কেন এসেছে জান? বিশ্বাসঘাতকদের জন্য। এই বিশ্বাসঘাতকরা সব যুগেই আছে। অতি প্রাচীন কালের ইতিহাসে তাদের কি নাম ছিল তা আমার জানা নেই, কিন্তু আমি জানি তারা ছিল। তারাই খাল কেটে কুমীরকে ডেকে এনেছিল। আধুনিক ইতিহাসের উমিচাঁদ মীরজাফরকে তোমরা সবাই চেন। তারও পরে যে সব বিশ্বাসঘাতকের দল স্বদেশী আন্দোলনের গোড়ার দিকে দেশের বিদ্রোহী তরুণ-তরুণীদের ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে, জেলে পুরে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দেশের উন্মুখ স্বাধীনতার আদর্শকে নিষ্পিষ্ট বিদলিত করে ইংরেজের দরবারে খেতাব ও পুরস্কার পেয়েছিল—তাদের কথাও আশা করি মনে আছে তোমার। অতি আধুনিক যুগে আর একদল বিশ্বাসঘাতক আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে তাদেরও আশা করি তুমি চিনতে পেরেছ। এরা সব ইনটেলেকচুয়ালিজম্ (intellectualism) অথবা আর্টের মুখোশ পরে থাকে। বিদেশীর চক্ষে ভারতবর্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করাই এদের উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষের যা কিছু খারাপ (অবশ্য তাদের মতে খারাপ) তাই কুড়িয়ে-বাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ওরা বিদেশের দরবারে প্রদর্শনী খোলে আর ভারি বাহবা পায়, অনেকে পুরস্কারও পায়। মনে রেখো ওরা ভারতবর্ষের মহাশত্রু। ভারতবর্ষের মাটির সঙ্গে ওদের যোগ নেই, এদেশের কিছুই ওদের চোখে ভালো নয়, ওরা বিদেশের উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরের দল। ভয় হয় ওরাই হয়তো আবার শত্রু ডেকে আনবে এদেশে। কারণ আমাদের স্বাধীনতার পর এদেশেও আবার ম্যাৎসন্যায় প্রচলিত হয়েছে। যারা শক্তিমান তারাই আবার দুর্বলকে গ্রাস করেছে। দেশে একটা অসন্তোষের ভাব জেগেছে। এর সুযোগ নেবে ঐ বিশ্বাসঘাতকরা। কিন্তু আমার আশা আছে এই নব-মাৎস্যন্যায়ে

যুগে আবার নতুন গোপালদেব আবির্ভূত হবেন। হয়তো তোমাকেই সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে হবে। তখন আমাকে ভুলো না। অতীতে অনেক বিশ্বাসঘাতকের মুণ্ডচ্ছেদ করেছি, এখনও দরকার হ'লে করব।"

জ্যোতির্ময় পুরুষ অন্তর্ধান করিলেন।

টক্ করিয়া একটা শব্দ হইল। গোপালদেব ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন সেই নার্সটি ব্লাড-প্রেসার মাপিবার যন্ত্রটি আনিয়াছেন। মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন তিনি খানিকক্ষণ। সম্নত দৃষ্টি, ধীর, স্থির, কোনরূপ প্রগল্‌ভতা নাই। শাড়িটি ভদ্রভাবে পরা, গলায় একটি ষ্টেথোস্কোপ ঝুলিতেছে।

মৃদুকণ্ঠে বলিল—"ব্লাড-প্রেসারটা নি ?"

"নাও।"

নিপুণতার সহিত ব্লাড-প্রেসার মাপিয়া নার্সটি চলিয়া যাইতেছিল।

গোপালদেব তাহাকে ডাকিলেন।

"কত প্রেসার দেখলে ?"

"নর্মালই আছে। ইউরিনও দেখেছি, শুগার অ্যালবুমেন নেই—"

বলিয়াই চলিয়া যাইতেছিল।

"আজকাল আমার পাল্‌স্ (pulse) কাউণ্ট (count) কর না ?"

"ডাক্তারবাবু বলেছেন, আর দরকার নেই।"

বলিয়াই আবার চলিয়া যাইতেছিল।

"শোন—"

দাঁড়াইয়া পড়িল আবার।

"তুমি এতদিন এখানে আছ, তোমার নামটাই জেনে নেওয়া হয়নি। কি নাম তোমার ?"

"আমার নাম অরুণা মণ্ডল।"

"নার্সগিরি ছাড়া আর কি জানো তুমি ? কোনও 'হবি' (hobby) টবি আছে ?"

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া মাথা নীচু করিয়া রহিল কয়েক সেকেণ্ড। তাহার পর বলিল, আছে। আমি ওয়াটার কালারে (water colour) ছবি আঁকি। রাঁধবারও শখ আছে।"

"তুমি ছবি আঁক কখন ? সমস্ত দিন তো নার্সগিরি করে বেড়াতে হয়—"

খানিকক্ষণ আবার নতমস্তকে থাকিয়া অরুণা উত্তর দিল, "আমার স্কেচবুক আর রঙের বাক্স আমার সঙ্গেই থাকে আমার ব্যাগে। নার্সদের তো সব সময় কাজ করতে হয় না, যখনই একটু অবসর পাই আঁকি—"

"এখানেও তো তোমার বিশেষ কোন কাজ নেই। এখানেও আঁকলে পারো—"

"আঁকি তো—"

"তাই নাকি। নিয়ে এসো তো, দেখি তোমার ছবি কেমন—"

কোন উত্তর না দিয়া অরুণা চলিয়া গেল।

একটু পরে মহান আসিয়া একটি খাতা দিয়া গেল। অরুণা আর আসিল না।

ছবি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলেন গোপালদেব। প্রথম ছবিটা একটা পদ্মের। পঙ্ক ভেদ করিয়া অপরূপ একটি পদ্ম সগৌরবে আকাশের দিকে মাথা তুলিয়াছে।

সহসা মনে পড়িল, কয়েকদিন আগে তাঁহার মনেও এরূপ একটি কল্পনা পুষ্পিত হইয়াছিল। আকাশপটে প্রস্তরবেদীর উপর মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সৌম্যমূর্তি ইতিহাস তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'ভ্রমর যখন পদ্মের নিকট আসিয়া মুগ্ধ গুঞ্জন তোলে তখন সে পদ্মের জন্ম-ঐতিহ্য লইয়া মাথা ঘামায় না। পদ্ম নিজের রূপগুণ লইয়া নিজেরই ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। অনেকক্ষণ তিনি মুগ্ধনেত্রে ছবিটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। দ্বিতীয় ছবিটি একটি প্রকাণ্ড পাখীর—বিরাট ডানা মেলিয়া প্রবল ঝড়ের সম্মুখীন হইয়াছে। সম্মুখে কালো মেঘে অশনির সংকেত, ঝড়ের বেগে বড় বড় বনস্পতি মাথা নত করিয়াছে, পাখীটা কিন্তু নির্ভয়, সে ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়াই যেন তাহার আকাশ-বিহার সমাপ্ত করিবে। কোন বাধাকেই সে মানিবে না। এ ছবিটি দেখিয়াও মুগ্ধ হইলেন গোপালদেব। তৃতীয় ছবিটি একটি ক্যাক্‌টাসের। নিষ্করুণ মরুভূমির সমস্ত রুক্ষতা সত্ত্বেও গাছটি প্রাণের প্রাচুর্যে যেন দম্ভভরে দাঁড়াইয়া আছে তাহার শাখায় শাখায় অদ্ভূত ধরনের ফুলও ফুটিয়াছে। এ ছবিটিও ভালো লাগিল তাঁহার। চতুর্থ ছবিটি একটি অশ্বারোহীর। দক্ষিণ হস্তে তরবারি তুলিয়া বাম হস্তে অশ্বের বলগা ধরিয়া তেজোদৃপ্ত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন। যেন মূর্ত বিদ্রোহের প্রতীক। অশ্বারোহীর মুখটা দেখিয়া তিনি চমকাইয়া উঠিলেন, এ যে তাঁহারই মুখ।

"মহান, মহান—"

মহান আসিয়া উপস্থিত হইল।

"অরুণাকে ডাক তো—"

"অরুণা কে?"

"ওই নার্সটি। ওর নাম অরুণা।"

"তিনি তো একটু আগে চলে গেলেন। উনি রোজ এগারোটার সময়ে চলে যান। এখন সওয়া এগারোটা বেজেছে। এইবার স্নানটান কর—"

মহান গোপালদেবের সহিত প্রভুর মতো ব্যবহার করে না, বন্ধুর মতো করে।

"হ্যাঁ, চল। আচ্ছা ও মেয়েটি সকাল থেকে বসে বসে কি করে বল তো? খালি ছবি আঁকে?"

"ছবি আঁকে মাঝে মাঝে। কিন্তু আরও অনেক কাজ করে। আমার অর্ধেক কাজ তো ওই করে। তোমার জামাকাপড় কেচে ইস্তিরি করে ওই সব তোমার আলমারিতে রাখে। তুমি জিগ্যেস করলে তাই বলে ফেললাম, কিন্তু উনি মানা করেছিলেন তোমাকে বলতে। ঠাকুরকে বলে তোমার জন্যে নতুন রকম তরকারিও করায়। এই যে আজকাল স্ট্যু খাচ্ছ, কাল যে মাছের দমপোক্ত খেয়েছিলে, পরশু চায়ের সঙ্গে মুগের ডালের যে ওমলেট খেলে—এ সবই ওই নার্সটি ঠাকুরকে বলে বলে করিয়েছেন। খুব ভালো মেয়েটি। আমি বলেছিলাম, আপনি নিজেই রাঁধুন না। উনি বললেন—আমার ছোঁয়া রান্না হয়তো উনি খাবেন না। কি জাত কে জানে। জাত যা-ই হোক মেয়েটি ভালো। তুমি ওঠ আর দেরি কোরো না।"

ওঠা কিন্তু হইল না। দ্বারপ্রান্তে রামগম্ভীরের ম্যানেজার সুখলাল দর্শন দিল তাহার বগলে একটি কাঠের সুদৃশ্য বাক্স এবং হাতে একটি চিঠি। সে আগাইয়া আসিয়া গোপালদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিল, "মালিক অনেক আগেই আমাকে এ চিঠিটা দিয়েছিলেন। কিন্তু বাক্সটা তৈরি করতে বড় দেরি করে ফেললে গুলাব মিস্ত্রি

কাল সন্ধ্যের সময় দিয়ে গেছে। একটু আগে সিভিল সার্জনও খবর পাঠিয়েছিলেন, তাই আমি এখনই চলে এলাম।"

গোপালদেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পত্রটি পড়িলেন।

শ্রীচরণেষু,

মাস্টার মশাই, আপনার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করতে আমি চাই না। আপনার কাছে হাত পেতে ভাড়া নেওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই একটি ছোট বাক্স আপনার কাছে পাঠালাম। আপনি ভাড়া বাবদ যা দেওয়া সংগত মনে করবেন তা ওই বাক্সতেই রেখে দেবেন। আমি পরে কোন সময়ে আপনার কাছে গিয়ে পরামর্শ করব টাকাটার কিভাবে সদ্গতি করা যায়। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি—

প্রণত

রামগম্ভীর

সুখলাল সুদৃশ্য বাক্সটি গোপালদেবের সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

গোপালদেব কোনও মন্তব্য করিলেন না। তাঁহার মন রামগম্ভীরের প্রস্তাব বা বাক্সকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনিল না। তাঁহার মন অরুণাকেই লইয়া ব্যস্ত হইয়া রহিল। তাঁহার সহসা মনে হইল, মেয়েটি যে কয়টি ছবি আঁকিয়াছে সবই তো বিদ্রোহের ছবি। পাঁককে তুচ্ছ করিয়া পদ্ম স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ঝড়কে তুচ্ছ করিয়া পাখীটা নির্ভয়ে আকাশে পাড়ে জমাইয়াছে, মরুভূমিকে তুচ্ছ করিয়া প্রাণবন্ত ক্যাক্‌টাস (cactus) স্বমর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সকলেরই ভঙ্গীতে বিদ্রোহের বাণী। ওই অশ্বারোহী তরবারি উৎক্ষিপ্ত করিয়া কি বাণী বলিতে চায়? অরুণা তাহার মুখের মতো করিয়া অশ্বারোহীর মুখ আঁকিয়াছে কেন? আমার মধ্যে সে বিদ্রোহের কোন বাণী-মূর্তি দেখিয়াছে কি?

"আমি, গল্পের লেখক ফটিকচাঁদ সামন্ত, এখানে নিজের কথা কিছু বলিতে চাই। আমি একটু মুশকিলে পড়িয়াছি। আমার মনটা যেন দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গিয়াছে। বুধের নির্দেশে গোপালদেবের চিন্তাই অহরহ করিতেছি। গোপালদেবকে শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ আদর্শবাদী পুরুষরূপে কল্পনা করিয়া আধুনিক যুগের আর এক অধ্যাপক গোপালদেবের মর্মে তাঁহাকে চিত্রিত করিতেছি। অধ্যাপক গোপালদেব অনমনীয় চরিত্রের লোক, তিনি আদর্শের জন্য সমাজ সংসার সব ত্যাগ করিয়াছেন। নীচবংশীয়া মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিল বলিয়া নিজের পুত্রকে হত্যা পর্যন্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে হয়তো আমি আরও কঠোর আরও উগ্ররূপে আঁকিতাম, কিন্তু মালিনীর সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়াতে একটু দ্বিধায় পড়িয়া গিয়াছি। কারণ অধ্যাপক গোপালদেবের পুত্র প্রবালের যে সমস্যা, আমার সমস্যাও অনেকটা সেইরূপ। মালিনীরা অবাঙালী, যদিও কলিকাতা শহরে তিন পুরুষ বাস করিয়া তাহারা বাঙালীই হইয়া গিয়াছে। ব্যবসায় করিয়া তাহারা অর্থও উপার্জন করিয়াছে প্রচুর। কিন্তু জাতিতে তাহারা 'ছত্রি'। আমি শূদ্রবংশীয়। আমার আশংকা হইতেছে, প্রবাল-আলতা নীলা-মগনের জীবনে যে ট্র্যাজেডি ঘটিয়াছে, গোপালদেবের যে অনমনীয় রক্ষণশীল চরিত্র আমার বর্ণনায় ফুটিয়াছে আমার নিজের জীবনেও তাহা সত্য হইয়া উঠিবে না কি? আমার বাবা নফর সামন্ত সুদূর পল্লীগ্রামে চাষবাস করেন। আমাকে

উচ্চশিক্ষা দিতে গিয়া তিনি সর্বস্বান্ত হইয়াছেন। আমি প্রতি মাসে তাঁহাকে টাকা পাঠাই। আমি মাতৃহীন। ভাই বোনও কেহ নাই। আমার এক দূরসম্পর্কের পিসী আমাদের বাড়িতে থাকিয়া বাবার দেখাশোনা করেন। বাবা তাঁহার এক বন্ধুর মেয়ের সহিত আমার বিবাহের কথাবার্তা প্রায় ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন। আমাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন, আমি উত্তর দিয়াছি, আয় কিছু না বাড়িলে বিবাহ করিব না। ইহা কিন্তু আমার সত্য মনোভাব নয়। আমি মালিনীকে ভালোবাসিয়াছি। মালিনীও আমাকে প্রশ্রয় দিতেছে। মালিনীর দাদা রণধীরও এ মেলামেশায় তেমন অশোভন কিছু দেখে না। তাহারা বড়লোক, তাহারা বিলাসের খরস্রোতে ভাসিতেছে, নানারকম আমোদ-প্রমোদ, হৃদয় লইয়া ছিনিমিনি খেলা তাহাদের পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, ইহাও তাহাদের বিলাসেরই একটা অঙ্গ। রণধীর এখন আর আমার ছাত্র নহে, আমি তাহার বয়স্য হইয়া পড়িয়াছি, সে মাঝে মাঝে আমার কাছে ইতিহাসের পাঠ লইয়া আমাকেই অনুগ্রহ করে যেন। তাহার শখ, নামের পিছনে এম-এ ডিগ্রী লাগাইবে। তাহার বয়স পঁচিশ বছর, এখন সে প্রাইভেটে আই-এ দিতেছে। একটি সুন্দরী ইহুদী তরুণী আসিয়া তাহাকে ইংরেজি পড়ায়। আমি জানি ওই ইহুদী মেয়েটি রণধীরের প্রণয়িনী। হয়তো ইহাকেই সে শেষ পর্যন্ত বিবাহ করিবে। তাহার ভগ্নী মালিনীর সম্বন্ধেও তাহার কোন কড়াকড়ি নাই। মালিনী স্বচ্ছন্দে আমার সঙ্গে মিশিতেছে। আপিসের পর আমরা দুজনেই দুইটি ঘোড়া লইয়া গড়ের মাঠে যাই। মালিনীর আদর্শ সে বীরাঙ্গনা হইবে। ইতিহাস হইতে নানা বীরাঙ্গনার কাহিনী বাছিয়া তাহাকে পড়িতে দিই। আমার উপর সে প্রসন্ন, কিন্তু সে ঠিক আমার প্রেমে পড়িয়াছে কি না জানি না। আমি কিন্তু হাবুডুবু খাইতেছি। এজন্য গোপালদেবের চরিত্রে যতটা দৃঢ়তা আমি সঞ্চার করিব ভাবিয়াছিলাম ততটা দৃঢ়তার উপকরণ আমি নিজের কল্পনার মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছি না। ইচ্ছা হইতেছে তাঁহাকেও আমার মতো প্রেমিকরূপে চিত্রিত করি। ইতিহাসে লেখা আছে, তাঁহার পত্নীর নাম ছিল দেদ্দা। দেদ্দাকে মালিনীরূপে আঁকিবার প্রলোভন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। অনেক ঐতিহাসিক বলেন দেদ্দা রাজবংশোদ্ভবা ছিলেন। সেই মাৎস্যন্যায়ের যুগে সকলেই তো রাজা ছিল। শক্তিমান মাত্রেই নিজের গণ্ডীতে রাজমহিমায় বাস করিত। দেদ্দাকে সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিক, শূদ্র—যে কোনও জাতের মেয়ে বলিয়া কল্পনা করিতে বাধা নাই। গোপালদেবকে সহজিয়া পন্থী করিতেও আমার লোভ হইতেছে—যে সহজ-পন্থীর শাস্ত্রে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে যদি বোধিলাভের ইচ্ছা থাকে তবে পঞ্চকাম উপভোগ কর। তবে সে উপভোগ সাধারণ মানুষের মতো করিও না, করিলে পাপপুণ্যে লিপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু যদি কোন বজ্রগুরু বুঝাইয়া দেন যে সবই শূন্য, কিছুরই স্বভাব নাই তখনই পঞ্চকাম উপভোগ ধর্ম হইবে, তাহাতে পাপ-পুণ্যের প্রশ্ন থাকিবে না। দারিকপাদ বলিয়াছেন, তুমি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরমার্থ সত্যের সহিত মহাসুখলীলাকে এক করিয়া পঞ্চমকাম উপভোগ কর। দারিক এই উপায়েই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছেন। আর যত রাজা আছেন তাঁহারা সকলেই বিষয়ের মোহে বদ্ধ। কিন্তু নিজগুরু লুইপাদের প্রসাদে দ্বাদশভুবন অতিক্রম করিয়া দারিক পরম সুখ লাভ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা প্রবন্ধে ইহা পাঠ করিয়াছি। গোপালদেবকে বিষয়ে নিরাসক্ত প্রেমোন্মত্ত

সহজিয়া যোগীরূপে চিত্রিত করিবার বাসনা হইতেছে। হয়তো তিনি বিষয়ে নিরাসক্ত প্রেমিক ছিলেন বলিয়াই অতি সহজে সকলের হৃদয় হরণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাই সকলেই তাঁহাকে নবপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের নেতারূপে অভিবাদন করিতে ইতস্তত করেন নাই। কিন্তু গোপালদেবের যে কোনও বজ্রগুরু ছিল ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই। দ্বিতীয়ত এ পর্যন্ত অধ্যাপক গোপালদেবকে যতটা অনমনীয় রক্ষণশীল বিদ্বান ব্যক্তি-রূপে আঁকিয়াছি তাহাতে তাহার মনে এখন পঞ্চকামোপভোগজারিত সহজিয়া মত সঞ্চারিত করা কি শোভন হইবে? আর একটা মুশকিল হইয়াছে মালিনীর প্রণয় যদিও, আমাকে এইদিকে প্রবৃত্ত করিতেছে কিন্তু আমার মনের ভিতর যে অদৃশ্য লেখক বসিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিতেছে সে ইহাতে রাজি নয়, কে যেন তাহার লেখনীকে দৃঢ়হস্তে অতীতের সেই সনাতনলোকে চালিত করিতেছে যে লোকে গোপালদেবেরা সনাতন সত্যে বিশ্বাসী—'ওলড্ ভ্যালুজ' (old values) প্রস্তর-ভিত্তির উপর যাঁহারা আজও মহিমান্বিত।

মুশকিলে পড়িয়াছি, কি করিব ভাবিয়া পাইতেছি না, মনটা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।"

কার্তিক তন্ময় হইয়া উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা পড়িতেছিল। এতদিন সে ওটা খুঁজিয়া পায় নাই। রাখাল তাঁহার ছেঁড়া থলিটা গুদামঘরে একটা প্রকাণ্ড সিন্দুকের মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিয়া মাদ্রাজে চলিয়া গিয়াছিল। চপলাই তাহাকে কি একটা জরুরি কাজে মাদ্রাজে পাঠাইয়াছিল। মাস তিনেক পরে কাল সে ফিরিয়াছে। চপলা এখনও ফেরে নাই। সে কার্তিককে খেজুরি গ্রামের বাড়িতে বসাইয়া জরুরী দরকারে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে। কেন গিয়াছে, কবে আসিবে রাখালও জানে না। ইহাদের অবর্তমানে কিন্তু কার্তিকের কোনও অসুবিধা হয় নাই। সে রাজার হালে একটি চমৎকার বাড়ি অধিকার করিয়া আছে। চাকর ঠাকুর তাহার সেবা করিতেছে। তাছাড়া আছেন বোসবাবুরা। এই বোসবাবুরা তাহার প্রতিবেশী। নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী-পরিবার, ইহাদের সেবা করিবার ভার চপলা তাহার উপর দিয়াছে। বলিয়াছে ইহাদের ভালোবাসিয়া আপন করিয়া লইতে হইবে। দূর হইতে টাকা ছুঁড়িয়া সাহায্য করিলে দরিদ্রের মনুষ্যত্বকে খর্ব করা হয় মাত্র, তাহাদের সেবা করা হয় না। খুবই ঠিক কথা, কিন্তু কার্তিক ইহাও অনুভব করিতেছিল ইহাদের ভালোবাসিয়া আপন করাও সহজ কাজ নয়। ইহাদের অসংখ্য অভাব সে গোপনে প্রকাশ্যে পূরণ করিয়া চলিয়াছে বটে কিন্তু ইহাদের মন এখনও পায় নাই। বাড়ির কর্তা বোসবাবু—কৃষ্ণধন বসু—একটু খেঁকী প্রকৃতির লোক। স্থানীয় একটি মাড়োয়ারির তেলকলে কাজ করে। মাড়োয়ারি বণিক জগৎরাম শহর হইতে বহুদূরে অনেকখানি জায়গা কিনিয়া এই তেলকলটি বসাইয়া প্রচুর অর্থ রোজগার করেন। কৃষ্ণধনবাবু সেইখানেই কেরানী। মাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়া বেতন পান। আগে পঁয়ত্রিশ টাকা পাইতেন চপলাদির অনুরোধেই তিনি এখন বেতন বাড়াইয়া পঞ্চাশ টাকা করিয়া দিয়াছেন। চপলাদিকে জগৎরাম খুব খাতির করেন, "দেবীজি" বলিয়া ডাকেন। খাতির করিবার হেতুটা কি তাহা কার্তিক এখনও বুঝিতে পারে নাই। প্রথম আসিয়া কৃষ্ণধনবাবুর সহিত কার্তিকের কয়েকদিন দেখাই হয় নাই। তিনি ভোরে বাহির হইয়া যান, ফেরেন রাত্রি দশটার পর। একদিন

রবিবার সকালে তাঁহার সহিত কৃষ্ণবাবুর দেখা হইয়া গেল। নমস্কার করিয়া বলিলেন, "নমস্কার। আমি আপনার নতুন প্রতিবেশী। এতদিন দেখাই হয়নি আপনার সঙ্গে।"

কৃষ্ণধন প্রতি-নমস্কার করিলেন না। মুখ গোমড়া করিয়া চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "হ্যাঁ মালতী, আরতির কাছে আপনার কথা শুনেছি। ওদের কিন্তু বেশী না-ই দেবেন না মশায়, গরীবের মেয়ে গরীবের মতো থাকাই উচিত। আপনার দেওয়া চকোলেট বিস্কুট রোজ রোজ খেলে মাথা বিগড়ে যাবে। গরীবের ঘরের পান্তাভাত মুড়ি তখন মুখে রুচবে না—"

কৃষ্ণধনবাবুর চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন উন্মাদ ভাব ফুটিয়া উঠিল। তিনি চোখ উলটাইয়া নিজের ভুরু দুইটিকে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কার্তিক লক্ষ্য করিল তাঁহার চোখের সাদা অংশটি পীত বর্ণের। ইহাও লক্ষ্য করিল তাঁহার কপিশবর্ণের গোঁফগুলি খোঁচা খোঁচা। বেঁটে লোক। সমস্ত দেহটাই যেন একটু মোচড়ানো। এই ব্যক্তিকে কি করিয়া সে প্রেমাস্পদ করিবে ভাবিয়া মনে মনে একটু বিপন্ন বোধ করিল।

হাসিয়া বলিল—"আমার নিজেরই চকোলেট বিস্কুট নেই তো ওদের দেব কোথা থেকে রোজ রোজ। সেদিন শখ করে কিনে এনেছিলাম নিধিরামের দোকান থেকে—"

"ওটা তো একটা চোর—।" 'চোর' কথাটা 'ছোর' মতো শুনাইল।

"কিছুদিন আগে একটা পেন্সিল কিনেছিলাম মশাই ওর দোকান থেকে। সাধারণ পেন্সিল। দাম নিলে ছ'আনা। দরকার ছিল কিনে ফেললাম। পরে শুনলাম কলকাতায় ও পেন্সিলের দাম দু'আনা। ছোর, ছোর ব্যাটা—"

ইহার উপর কার্তিক অন্য প্রসঙ্গ পাড়িয়াছিল।

"আপনি জগৎরামবাবুর তেলকলে কাজ করেন বুঝি। কাজকর্ম কেমন চলছে—"

"পূর্বজন্মে অনেক পাপ করেছিলাম তাই ওই মেড়ো ব্যাটার পায়ে তেল দিতে হচ্ছে। কাজকর্ম মানে দিনগত পাপক্ষয়—হ্যাঁ—"

কোন পথে আলাপ করিলে যে কৃষ্ণধনবাবুর একটা প্রসন্ন ভদ্ররূপ দেখা যাইবে তাহা কার্তিক সেদিন আবিষ্কার করিতে পারে নাই। মনে হইয়াছিল কখনও পারিবে না। কথা কহিলেই লোকটার একটা অসভ্য বর্বর পরশ্রীকাতর মূর্তি বাহির হইয়া পড়ে। তাহার মেয়ে দুইটির সহিত এবং ছেলেটির সহিত কিন্তু সহজেই কার্তিকের ভাব হইয়া গিয়াছিল। বড় মেয়েটির নাম মালতী—তেরো চোদ্দ বছর বয়স—সুশ্রী সদা-সপ্রতিভ হাস্যময়ী কিশোরী একটি। তাহার ছোট আরতি—দশ বছরের মেয়ে। কিন্তু মালতীর মতো চঞ্চলা নয়, সে একটু স্থির ধীর. গিন্নী-প্রকৃতির। প্রথম দিনই কার্তিককে উপদেশ দিয়াছিল—'তুমি অমন আদুড় গায়ে থেকো না, ঠান্ডা লেগে যাবে'। মুখে যদিও কিছু প্রকাশ করে না, কিন্তু কিছু দিলে টপ করিয়া সেটা লইয়া মুচকি মুচকি হাসিতে থাকে। কার্তিক ইহাদের জন্য ওই নিধিরামের দোকান হইতেই নানারকম ছেলে-ভুলানো জিনিসপত্র কেনে। জলছবি, পুঁতি, লজেন্স. চকোলেট, বিস্কুটও। লজেনস্ চকোলেট বিস্কুট কিন্তু তাহারা আর বাড়িতে লইয়া যায় না, পাছে বাবা রাগ করে। কার্তিকের বাসাতেই সেগুলি নিঃশেষ করিয়া তবে বাড়ি যায়।

একদিন মালতী মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে বলিল—"আপনার কাছে আর চকোলেট আছে ?"

"এখন তো নেই। তোমার বাবা তোমাদের বেশী চকোলেট দিতে মানা করেছেন। জানতে পারলে আবার আমার উপর রাগ করবেন। যে কটা চকোলেট ছিল পরশু দিনই তো তোমরা খেয়ে গেলে।"

মালতী মুখ টিপিয়া একটু হাসিল, তাহার পর চুপি চুপি বলিল—"মা খেতে চেয়েছে। আমাদের আপনি চকোলেট দিয়েছেন শুনে মা বললে, 'আহা আমার জন্যে যদি একটা আনতিস। ছেলেবেলায় আমিও চকোলেট খুব ভালোবাসতুম। বাবা প্রায়ই কিনে এনে দিতেন। বিয়ের পর তো আর ও জিনিস চোখেও দেখিনি।' মায়ের জন্যে দেবেন একটা ?"

কার্তিক চকোলেট কিনিয়া দিয়াছিল আবার। বলিয়া দিয়াছিল—"দেখো তোমার বাবা যেন না জানতে পারেন।"

কার্তিক একদিন মালতীকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা পড়াশোনা কর না ?"

আরতি হাসিয়া বলিল—"না। বাবা বলেছে পড়াশোনা করে কি হবে, কিছুদিন পরে ঘানিতে জুড়ে দেব—"

"তার মানে —"

মালতী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"মানে আমাদের বিয়ে দিয়ে দেবে। আমরা গিয়ে সংসারের ঘানি টানব।"

"তোমার ভাই পদুকেও পড়াবেন না নাকি। ওর কত বয়স হ'ল।"

"সাত বছর। এইবার হাতে খড়ি হবে। তারপর পাঠশালায় যাবে।"

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্তিক শেষে একটা বুদ্ধি বাহির করিয়াছিল। মরীয়া হইয়া একদিন সে কৃষ্ণধনবাবুর কাছে প্রস্তাব করিয়া ফেলিল—"আপনি আমার উপর একটু দয়া করবেন ?"

"আমি সামান্য লোক, গরীব মানুষ, আমি কিভাবে আপনাকে দয়া করতে পারি তা তো আমার মাথায় আসছে না। কি করতে হবে বলুন।"

"আমার স্ত্রী এখনও এসে পৌঁছয় নি। কবে পৌঁছবেন তার স্থিরতাও নেই। কিন্তু আমি ওই মৈথিল ঠাকুরের রান্না আর হজম করতে পারছি না। রোজই বিকেলে বুক জ্বালা করে। আপনি আমার প্রতিবেশী, আপনি যদি আমাকে পেইং গেস্ট (paying guest) হিসাবে রাখেন, মা লক্ষ্মীর হাতের বাঙালী রান্না খেয়ে আমি বর্তে যাই। আমার আর আমার কুকুর লর্ডের জন্য আমি চাল ডাল নুন তেল মাছ মাংস তরিতরকারি সব কিনে দেব, তাছাড়াও মাসে মাসে টাকাও দেব—"

"আমরা গরীব গৃহস্থ লোক। আমার বাড়ি তো হোটেল নয় মশাই।"

"হোটেল হ'লে কি আমি যেতে চাইতুম, হোটেল হলে কি আপনাকে বলতুম আমার উপর দয়া করুন। আপনার গৃহস্থলী মা-লক্ষ্মীর স্পর্শে পবিত্র, ভাগ্যে না থাকলে ওখানে আশ্রয় পাওয়া যায় না।"

"মা-লক্ষ্মী মা-লক্ষ্মী করছেন, কিন্তু আমার ভাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না তা জানেন ? মোটেই লক্ষ্মী নয়, উড়ুনচণ্ডে। কাল ফট্ করে একটা লাল গামছা কিনে বসল পাঁচসিকে দিয়ে—কিছুই দরকার ছিল না—"

"আপনি বিজ্ঞ লোক আপনার সঙ্গে তর্ক করবার স্পর্ধা আমার নেই। কিন্তু আমি জানি দারিদ্র্যের মধ্যেও লক্ষ্মী রাজরাণীর মতো থাকেন। অনেক সময় দারিদ্র্যটাও তাঁর বিলাস, তাঁর বাইরের ছদ্মবেশ, অন্তরে তিনি সর্বদা ঐশ্বর্যময়ী। আমি বলছি আপনার দুঃখের দিন থাকবে না।—"

কৃষ্ণধন কার্তিকের উচ্ছ্বাসের মধ্যেই শব্দ করিয়া উঠিলেন, "হুঁহ্যাঃ—"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর তিনি বলিলেন—"কত টাকা দেবেন আপনি? একটা বাইরের লোকের ঝঞ্ঝাট ঝামেলা পোয়ানো তো সহজ কথা নয়—আমার গিন্নীর সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু বলতে পারব না মশায়। কত টাকা দেবেন আপনি?"

"আপনি যা বলবেন তাই দেব—"

"আপনি চাল ডাল নুন তেল ঘি তরিতরকারি মাছ মাংস সব দেবেন বলছেন?"

"দেব—"

কৃষ্ণধনবাবু তাঁহার কপিশবর্ণ খোঁচা গোঁফের উপর কয়েক সেকেন্ড বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী সঞ্চালন করিলেন। তাহার পর বলিলেন—"এর উপর আরও টাকা পঞ্চাশেক দিতে পারবেন?"

"তাই দেব।"

কার্তিক কৃষ্ণধনবাবুর পরিবারভুক্ত হইয়া আর একটা কাজ করিয়াছে। পদুর হাতে খড়ি দিয়া তাহার পড়ার ব্যবস্থাও করিয়াছে। তাহাকে সে রোজ 'বর্ণপরিচয়' পড়ায়। পড়ার অপেক্ষা অবশ্য খেলার দিকেই পদুর (ভালো নাম প্রদ্যুম্ন) বেশী মন। কার্তিক তাহার খেলার সাথীও হইয়াছে। বাড়ির উঠানেই দুইজনে মার্বেল খেলে। ভোমরা (কৃষ্ণধনের স্ত্রী) রান্নাঘর হইতে প্রাপ্তবয়স্ক যুবক কার্তিকের আর ওঁর কচি ছেলে পদুর গুলি খেলা প্রত্যহ স-কৌতুকে উপভোগ করেন। কার্তিকের উপর তাঁহার যে স্নেহ-সঞ্চার হইয়াছে তাহা এই কারণে আরও অকপট যে, বহুকাল পূর্বে তাহার যে ভাইটি অকালে মারা যায় কার্তিকের সহিত তাহার নাকি অনেক সাদৃশ্য আছে। কার্তিক তাহাকে দিদি বলিয়া সম্বোধন করিতেছে এবং প্রত্যহ তাহার রান্নার অজস্র প্রশংসার অত্যুক্তিতে তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। কৃষ্ণধনবাবু কার্তিককে টাকার লোভেই নিজের পরিবারভুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনের ভিতর একটা সন্দেহ ছিলই। মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইতেছিল, হয়তো ওই মালতী মেয়েটার জন্যই লোকটা তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে চাহিতেছে। কিন্তু কয়েক-দিন লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সে ভুলটা ভাঙিয়া গেল। তবু কিন্তু তিনি কার্তিকের উপর ঠিক প্রসন্ন হইতে পারিতেছিলেন না। অন্তর-নিহিত একটা হিনম্মন্যতাই বোধহয় তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল। উপকারী কার্তিকের খুঁত বাহির করিবার জন্য তাঁহার মন সর্বদা গোপনে গোপনে যেন উৎসুক হইয়া থাকিত। একদিন কিন্তু এমন একটা কাণ্ড ঘটিল যে তিনি কার্তিকের প্রতি বিরূপতা আর বজায় রাখিতে পারিলেন না। তাহার উপর তাঁহার ভক্তিই হইয়া গেল।

কৃষ্ণধনবাবুর বাড়ির লাগাও একটা ছোট ঘর ছিল। একদিন সকালে দারোগাবাবু দুইজন পুলিশ হইয়া সেখানে হাজির হইলেন এবং কৃষ্ণধনবাবুকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। কার্তিক আগে বাহির হইয়া আসিল। কৃষ্ণধনবাবু কিছুক্ষণ পরে

আসিলেন। কার্তিক লক্ষ্য করিল তাঁহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াই দারোগাবাবু বলিলেন—"মিলের ম্যানেজার থানায় একটা খবর পাঠিয়েছিলেন যে মিল থেকে তেলের টিন প্রায়ই নাকি গায়েব হয়ে যাচ্ছে। কাল নাকি তাঁকে একজন খবর দিয়ে গেছে যে দুটো লোক দুটিন তেল নিয়ে আপনার এই বাড়িতে রেখে গেছে। ম্যানেজার সাহেবের ইচ্ছে আমরা আপনার বাড়িটা সার্চ করে দেখি—"

কার্তিক সহসা সপ্রতিভভাবে আগাইয়া গিয়া কৃষ্ণধনবাবুকে বলিল—"আমি কাল আপনাকে যে দু'টিন তেল আনতে বলেছিলাম তা এনেছেন নাকি। দাম তো নিয়ে যান নি।"

"দাম আজ নেব। ছোট ঘরটাতে আছে টিন দুটো। আজ দাম দিয়ে ক্যাশ মেমো দিয়ে যাব আপনাকে।"

অকম্পিত কণ্ঠে মিথ্যাভাষণ করিয়া গেলেন কৃষ্ণধনবাবু। তাহার পর দারোগাবাবুর দিকে চাহিয়া দেঁতো হাসি হাসিয়া বলিলেন—"ম্যানেজারবাবু ঠিকই খবর পেয়েছেন। কার্তিকবাবুর জন্যে দু'টিন তেল এনেছি আমি, ওই ছোট ঘরটাতে আছে—চলুন আপনাকে দেখিয়ে দি। ম্যানেজারবাবুর হুকুম নিতে পারিনি, কারণ তখন তিনি বাড়ি চলে গিয়েছিলেন, অথচ তেলটা ওঁর আজই দরকার--খেলাতপুরে কার জন্যে যেন পাঠাতে হবে, না কার্তিকবাবু ?"

কার্তিক মাথা নাড়িয়া বলিল—"হ্যাঁ—"

দারোগা সাহেব টিন দুইটি দেখিয়া এবং কার্তিকের নিকট হইতে একটি স্টেট্‌মেণ্ট (statement) লইয়া থানায় চলিয়া গেলেন।

তিনি চলিয়া যাইবার পর কার্তিক সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সবিস্ময়ে কৃষ্ণধনবাবুর দিকে চাইতেই কৃষ্ণধনবাবুর চোখ দুইটি আবার উলটাইয়া ভ্রূ-মুখী হইল।

বলিলেন, "চলুন, আপনার বাসায়। সব বলছি—"

কার্তিকের বাসায় এক লর্ড ছাড়া আর কেহ থাকে না। তাহারা আসিবামাত্র কৃষ্ণধনবাবুকে দেখিয়া লর্ড ঘেউ ঘেউ করিয়া বকিয়া দিল। লর্ডের সঙ্গে মালতী, আরতি, পদ্ম সকলেরই খুব ভাব, কৃষ্ণধনবাবুকে সে সহ্য করিতে পারে না। দেখিলেই ভর্ৎসনা করে।

"লর্ড তুমি ও ঘরে যাও—"

লর্ডের স্বভাবটি কিন্তু ঢ্যাটা, সে বাধ্য কুকুর নয়, সমানে তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল।

"যাও—"

তবু লর্ড যাইতে চাহিল না।

কৃষ্ণধনবাবু মন্তব্য করিলেন, "কুকুর জানোয়ারটা অতি ব্যাদড়া—"

কার্তিক লর্ডের কান ধরিয়া টানিতে টানিতে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে দুই থাপ্পড় মারিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিল। লর্ড আর চীৎকার করিল না, বুঝিল মনিব সত্যই চটিয়াছে।

কৃষ্ণধনবাবু বেশ সপ্রতিভভাবেই বলিলেন, "যখন ধরা পড়ে গেছি তখন সব কথাই খুলে বলছি আপনাকে। ও দুটিন তেল আমি চুরিই করেছিলাম এবং সুবিধে পেলেই করি—"

"কেন করেন !"

প্রশ্নটা সোজাই করিয়া বসিল কার্তিক।

"করি, কারণ না করে উপায় নেই। মালতী আরতীর বিয়ে দিতে হবে। মালতীটার তো এখনই দিলে হয়। কম করে করলেও তিন চার হাজার টাকা খরচ করতে হবে। সমাজ আমাকে রেহাই দেবে না। মাত্র পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাই তার থেকে কত জমবে বলুন এ বাজারে। তবু আপনি এসেছেন বলে আমার মাইনের টাকাটা জমাতে পারছি—"

"তা বলে চুরি করবেন !"

"সবাই যেখানে চোর—মালিক, নফর, সমাজ, রাষ্ট্র, সবাই যেখানে চোর—সেখানে আমি সাধু থাকি কি করে বলুন। আমাদের দেশ আলকাতরার কারখানা, সবারই গায়ে আলকাতরা লাগবেই। আপনার ওই চপলাদি—না থাক ওঁর কথা আর বলব না—উনি যাই হোন আমার অনেক উপকার করেছেন। শুধু আমার নয় এ অঞ্চলের অনেকেরই উনি উপকার করেছেন। আপনার গায়েও আলকাতরা লেগেছে নিশ্চয়, কিন্তু কোথায় লেগেছে তা আমার চোখে পড়েনি এখনও। চপলাদির সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কি তা-ও আমি জানি না, শুধু জানি আপনার উপর তাঁর অসীম অনুগ্রহ, হয়তো কোনও কারণ আছে, কিন্তু আমি আলকাতরা-ঘাঁটা মানুষ, নানারকম সন্দেহ হয়—মাপ করবেন—অকপটে সবই বলে ফেললাম।"

এই বলিয়া তিনি সামনের এবড়ো-খেবড়ো হলদে দাঁতগুলি বাহির করিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিলেন।

কার্তিক বলিল—"না না, মাপ করবার কিছু নেই। আপনার অকপট কথা শুনে আমার খুব ভালো লাগল। চপলাদি আমার দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া। হঠাৎ মেলায় সেদিন দেখা হ'য়ে গেল—আমিও বেকার হ'য়ে ঘুরছিলাম—উনি আমাকে এখানে একটা কাজ দিলেন। উনি এ অঞ্চলে যে কো-অপারেটিভ করেছেন তারই ম্যানেজার করে নিয়ে এলেন আমাকে। কিন্তু আমার কথা থাক, আপনি মেয়েদের বিয়ের জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন কেন। ওদের পড়ান। প্রাইভেটে পরীক্ষা দিক—"

"পড়াবে কে। প্রাইভেট টিউটার রাখবার সামর্থ্য আমার নেই—তাছাড়া এ অঞ্চলে মেয়ে প্রাইভেট টিউটার নেইও—"

"আমি যদি সে ভার নিই—"

কৃষ্ণধন চুপ করিয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিলেন—"মাপ করবেন, আমার যা মনে হচ্ছে তা বলছি। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় অল্প। এই অল্প পরিচয়ের উপর নির্ভর করে আমার মেয়ের সঙ্গে আপনাকে মাখামাখি করতে দিতে ভরসা পাচ্ছি না। এটাও বলব, আপনার যতটুকু পরিচয় পেয়েছি, তাতে দূষ্য কিছু দেখতে পাইনি, কিন্তু তবু ভরসা পাচ্ছি না। আমরা গরীব মানুষ, কেলেঙ্কারী কিছু হয়ে গেলে সেটা সামলাবার মতো টাকা নেই আমার। তাছাড়া আর একটা কথা, লেখাপড়া শেখালেই কি বিয়ের সমস্যাটা মিটবে? আমার পিসতুতো বোনরা গাদা গাদা টাকা খরচ করে বি-এ, এম-এ পাশ করেছে, তা সত্ত্বেও তাদের বিয়েও দিতে হয়েছে গাদা গাদা টাকা খরচ করে। একটা বোন তো কুলে কালী দিয়ে বোর্ডিং থেকেই পালিয়েছে—সেই জন্যে ওসব রাস্তায় চলবার সাহস নেই আমার।

ঠিক করেছি, যত শিগ্‌গির পারি ওদের ঘানিতে জুড়ে দেব। তাই চুরি করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই।"

কার্তিক সহসা হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া ফেলিল কৃষ্ণধনকে। হাঁ-হাঁ করিয়া পিছাইয়া গেলেন কৃষ্ণধন। কার্তিক বলিল, "আপনি মহাপুরুষ। মহাপুরুষরাই সরল সত্য কথা এমন নির্ভয়ে বলতে পারেন। আপনি যা বললেন তা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক। আপনি আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছেন না, না পারবারই কথা, কিন্তু তবু আমি বলব লেখাপড়া শেখানো ছাড়া মেয়েদের এ যুগে বাঁচবার কোনও উপায় নেই। আপনার মেয়ে লেখাপড়া শিখে বিয়ে করবে কেন আপনার ছেলের স্থান অধিকার করবে, অন্য সব দেশে তো এই হচ্ছে, আমাদের দেশেই হবে না কেন -"

কৃষ্ণধন বলিলেন, "মেয়ের রোজগার খেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভালো। ও দেশে মেয়েরা যে কিভাবে রোজগার করে তার কিছু কিছু খবর জানা আছে আমার। তেলের দামটা কি এখনি দিয়ে দেবেন?"

"হ্যাঁ। তেলটা বাড়িতেই থাক—"

"বাড়িতে অনেক তেল আছে। ওটা বিক্রি করে দেব। অনেক চোরাবাজারী হাঁ করে বসে আছে—। টাকাটা আপনাকেই দিয়ে যাব কি!"

"না, ওটা তো আপনারই প্রাপ্য—।"

কার্তিক বাক্স খুলিয়া দুইখানি একশো টাকার নোট বাহির করিয়া কৃষ্ণধনকে দিল।

"তেলের দাম নিয়ে বাকিটা আমাকে দিয়ে যাবেন—"

কৃষ্ণধন নোট দুইটি হাতে লইয়া নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"একটা কথা জিগ্যেস করব। সদুত্তর দেবেন?"

"নিশ্চয়, কি কথা—"

"আপনি এত টাকা পান কোথা থেকে—"

"চপলাদি যে কো-অপারেটিভের দোকান সব করেছেন, আমি তার ম্যানেজার। মাসে দু'শ টাকা করে আমার বেতন। সে টাকা আমার খরচ হয় না। কারণ আমার ভরণপোষণের ব্যবস্থাও চপলাদি করেছেন। কলকাতা যাবার আগে তিনি আমাকে পাঁচ মাসের মাইনে এক হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে গিয়েছিলেন—"

"আপনার চপলাদিই বা এত টাকা পান কোথায়।"

"তাতো জানি না। আমাকে সব কথা খুলে বলবেন বলেছিলেন, কিন্তু এসেই তাঁকে কলকাতা চলে যেতে হয়েছে। এখনও ফেরেন নি। ফিরলে সব জানতে পারব আশা করি।"

"উনি দশটা কো-অপারেটিভ দোকান করেছেন। কিন্তু নামেই সে সব কো-অপারেটিভ, কেউ কো-অপারেশন (co-operation) করে নি, শুনেছি সব ওঁরই টাকা। আপনার সেই বামন বন্ধুটি তো একটা দোকানের ইনচার্জ (in-charge)—সে তো ওখানে খুব জমিয়েছে মশাই। সার্কাসের খেলা দেখায়। একটা বাঁদরও পুষেছে। সে যদি আসে তাকে একটা কথা বলে দেবেন মশাই। পাশের গাঁটা মুসলমানদের। অনেকগুলো মুসলমান ছোঁড়া আসে ওর কাছে। আমার মতে ওদের সঙ্গে বেশী মাখামাখি করাটা ভালো নয়। আমার বাড়ির পাশেও একটা মুসলমান ছোঁড়া ঘুরঘুর করে—মাঝে মাঝে সিটি মারে—"

"কেন—"

"কেন আবার, এই মালতীর জন্য। আমি গরীব মানুষ, সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় মশাই। ওই বামনটা কি আসে আপনার কাছে ?"

"না, অনেকদিন আসে নি।"

"এলে একটু বলে দেবেন। মুসলমান ছোঁড়াগুলোকে যেন একটু সামলে রাখে—"

"না, না, সে সব ভয় কিছু নেই—"

কৃষ্ণধন চলিয়া গেলেন।

এই তিন মাসে বসু-পরিবারের সহিত তাহার বেশ খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে বটে, কৃষ্ণধনবাবুর উগ্রতা ও বিরূপতাও অনেকটা কমিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তবুও কার্তিক অনুভব করিতেছে এখনও সে উহাদের আপন করিতে পারে নাই, উহাদের ভালোও বাসিতে পারে নাই, যতটুকু ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে তাহা টাকার জোরে হইয়াছে, প্রেমের জোরে হয় নাই। ব্যাপারটাকে সে এখনও আধ্যাত্মিক পর্যায়ে লইয়া যাইতে পারে নাই, এখনও তাহা আর্থিক স্তরেই নিবদ্ধ আছে। এজন্য তাহার লজ্জার আর কুণ্ঠার সীমা নাই। তাহার মনে হইতেছে, চপলাদির কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়া সে কাজে নামিয়াছিল সে প্রতিশ্রুতি সে রক্ষা করিতে পারিতেছে না। এক হিসাবে চপলাদির সহিত সে প্রতারণাই করিতেছে। আর একটা কারণেও তাহার মনে একটা উৎকণ্ঠা সদাজাগরূক হইয়া আছে—নিমু কবে আসিবে। চপলাদি বলিয়াছিল নিমুকে এখানে লইয়া আসিবার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবে। কিন্তু চপলাদি আসিয়াই কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা না করিয়াই। কার্তিক অবশ্য নিমুকে পত্র লিখিয়াছে, নিমুর উত্তরও আসিয়াছে, কিন্তু নিমু না আসা পর্যন্ত সে স্বস্তি পাইতেছে না। চপলাদি না ফিরিলে যে নিমুর এখানে আসা হইবে না তাহা কার্তিক বুঝিয়াছিল। রাখাল বলিল, "মা শীগগিরই ফিরবেন। চালের আর গমের ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলেন। মৃণালবাবু কাল রাত্রে এসেছেন, তিনি বললেন সব ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে। আজই বোধহয় মা ফিরবেন।"

"মৃণালবাবু কে ?"

"তিনি ঠিক কে তা তো আমার জানা নেই। তবে তিনি মায়ের ডান হাত। কোলকাতার লোক—'

"আমার ছোট থলিটা তুমি কোথায় রেখেছ বল তো ? তাতে একটা বই ছিল।"

"থলিটা আপনার দরকার হবে তা ভাবিনি তো। ঘরে বন্ধ করে রেখেছি—"

রাখাল থলিটা বাহির করিয়া আনিল।

"কড়া আর খুন্তিটা দিয়ে দাও কাউকে। এই বইটা আমার কাছে থাক। ও থলিটাও দিয়ে দাও কাউকে—"

"যে আজ্ঞে—"

পাণ্ডুলিপিটা বাহির করিয়া কার্তিক তাহাতেই মনঃসংযোগ করিল। অরুণার কথা পড়িতে পড়িতে সে একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল, মালতীর কথা মনে পড়িল তাহার। যদিও সে কাহাকেও এখনও কিছু বলে নাই কিন্তু মালতী মেয়েটি ক্রমশ যেন

একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহার পক্ষে। মেয়েটা যখন তখন তাহার ঘরে আসিয়া ঘুরঘুর করে। ঘাড় ফিরাইয়া তাহার দিকে চায় আর মুচকি মুচকি হাসে, মাঝে মাঝে গায়ের কাপড়চোপড় যেন ইচ্ছা করিয়া একটু অসম্বৃত করিয়া ফেলে। সেদিন সে দুপুরে শুইয়াছিল, হঠাৎ পাশ ফিরিয়া দেখে মালতী তাহার বিছানায় বসিয়া আছে, আর মুচকি মুচকি হাসিতেছে। বকিয়া দিয়াছিল তাহাকে।

"তুমি বারবার আমার ঘরে আস কেন বল তো। বিছানায় বসেছ কেন? তুমি বড় হয়েছ, একটু সামলে চলতে শেখ, তা না হলে সবাই যে নিন্দে করবে। একা আমার ঘরে আর এসো না।"

লজ্জায় সেদিন মালতী মাথা হেঁট করিয়াছিল। তাহার আনত চোখের কম্পনে মুখের শঙ্কিত মৃদু হাসিতে রক্তিম গণ্ডে যাহা সেদিন ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা অনির্বচনীয়। মালতী চলিয়া যাইবার পর কার্তিকের মনটা বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর হইতে যদিও মালতী একা আর কখনও তাহার ঘরে আসে নাই, কিন্তু কার্তিক অনুভব করে সে সর্বদাই যেন লুকাইয়া তাহাকে দেখিতেছে। এদিক ওদিক চাহিলেই তাহার সহিত চোখাচোখি হইয়া যায় এবং তাহার চোখে যে ভাষা ফুটিয়া ওঠে তাহা অস্বস্তিকর। তাই সে ইদানীং বাড়িতেও বড় একটা থাকে না। যে দশটি কো-অপারেটিভ দোকান খোলা হইয়াছে তাহারই তদারক করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়ে। কো-অপারেটিভ দোকানগুলির প্রধান কাজ গরীব নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারদের খুব কম মূল্যে চাল গম বিক্রয় করা। কাজটা কিন্তু গোপনে করিতে হয়। চাল প্রতি দোকানে গোপনে সংগৃহীত হইয়া গোপনেই বিক্রীত হয়। কাহারা চাল যোগাড় করে, কে চালের দাম দেয় তাহা কার্তিক জানে না। মাঝে মাঝে এক একটা লোক (কখনও বা স্ত্রীলোক) প্রতি দোকানে চাল লুকাইয়া দিয়া যায়। কেন দিয়া যায়, কে তাহাদের চালের দাম দেয় তাহা কার্তিকের অজ্ঞাত। কার্তিককে শুধু দেখিতে হয় চালগুলি যেন প্রকৃত গরীব লোকেরা কম মূল্যে পায়। আশপাশের গ্রামগুলি মুসলমানপ্রধান গ্রাম। তাহাদের মধ্যেও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার অনেকে আছে। তাহারাও চাল পায়। আনুটা যে গ্রামে থাকে সেটা মুসলমানপ্রধান গ্রাম। আনুটা সেখানে খুব জমাইয়াছে। সার্কাসের আখড়া খুলিয়াছে একটা।

কার্তিক উপন্যাসটায় ক্রমশ তন্ময় হইয়া গেল। গোপালদেবের চরিত্রটি লেখক শেষ পর্যন্ত কিভাবে কোন রঙে আঁকিবেন তাহা জানিবার জন্য সে কৌতূহলী হইয়া উঠিতেছিল।

"সুরং নিশ্চয় রাগ করে বসে আছ।"

কার্তিক ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল চপলাদি স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক।

"এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি আমার একজন বন্ধু। অনেকে বলে আমার ডান হাত। কিন্তু আমি জানি মস্তবড় শত্রু আমার উনি একজন—"

"শত্রু?"—কার্তিক সবিস্ময়ে প্রশ্নটা না করিয়া পারিল না।

"হ্যাঁ পয়লা নম্বরের শত্রু। আমার সঙ্গ ছাড়বেন না। তাই আমার হিতৈষীরা—হিতৈষীদের তো অভাব নেই এদেশে—নানা রঙের উপদেশ এবং

কুৎসা ছড়িয়ে বেড়ান আমাকে কেন্দ্র করে। নানা রঙের মধ্যে আলকাতরার রংও থাকে—"

কার্তিক নমস্কার করিল।

"এঁর নাম মৃণাল, আমি কিন্তু এঁকে পদ্মকলি বলে ডাকি। স্বরং-এর সঙ্গে পদ্মকলি আশা করি বেমানান হবে না।"

পদ্মকলির দিকে চাহিয়া কার্তিক জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি করেন ?"

পদ্মকলি হাসিয়া উত্তর দিলেন—"আমি অকর্মণ্য। আমি সেই দলভুক্ত যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও গদিতে বসতে পায় না—অর্থাৎ আমি বেকার। ইনি আমার ভরণ-পোষণ করেন তাই আমি বেঁচে আছি এখনও।"

চপলাদি স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। দুটি টোল পড়িয়াছিল তাহার গালে।

"পদ্মকলি খুব বিনয়ী লোক। সে বেকার ঠিক, কিন্তু সেইটেই যে তার গৌরব তা ও মানতে চায় না। সর্বদেশে সর্বকালে মহৎ লেখকরা, মহৎ শিল্পীরা, মহৎ জননায়করা বেকার জীবন যাপন করেছেন। কিছুদিন আগে দেশনেতাদের পদস্পর্শে জেল তীর্থ হয়ে উঠেছিল। বহু অখ্যাত অজ্ঞাত প্রতিভাবান কবি শিল্পীরাও তেমনি বেকার-সম্প্রদায়কে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম-সম্প্রদায়ের চেয়েও বড় মর্যাদা দিয়েছেন। ওই একদা-বেকার মানুষরাই যে মানব সমাজের ভূষণস্বরূপ—ইতিহাসে তার অজস্র প্রমাণ আছে। পদ্মকলি একজন প্রতিভাবান চিত্রকর। ওর আঁকা ভিসুবিয়সের (Vesuvius) ছবি যদি দেখ মুগ্ধ হয়ে যাবে। ও ভিসুবিয়স কখনও দেখে নি, তবু ওর ভিসুবিয়স অপূর্ব। আগ্নেয়গিরি অগ্নি উদ্গিরণ করতে করতে যেন কাঁদছে। আর একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি ওর মধ্যে। ও ভিসুবিয়সের ছবি এঁকেছে বটে কিন্তু ওর বুকের ভিতর যা তোলপাড় করছে তার ছবি ও এখনও আঁকতে পারেনি—সেটা একটা সাগর, অশ্রুর সাগর—"

"কি যে বলছ তুমি, থামো থামো। আমি চললুম—"

মৃণাল সত্য সত্যই বাহিরে চলিয়া গেল।

কার্তিক অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। আর একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। চপলার ভ্যানিটি ব্যাগে একতাড়া নোটের সহিত পদ্মকলির একটি ছবি দেখিয়াছিল।

"চপলাদি, আমাকে সব খুলে বলবে বলেছিলে। কবে বলবে ? এই কুয়াশার মধ্যে বেশীক্ষণ থাকতে ভালো লাগছে না। তোমার ভ্যানিটি ব্যাগে একটা পদ্মকলির ছবি দেখেছিলাম—"

"সেটা ওরই আঁকা। ওইটে ওর সই। ও যখন চিঠি লেখে তখন নাম লেখে না তার তলায় একটা পদ্মকলি আঁকা থাকে শুধু। ও যখন কোন জিনিস পাঠায় তার সঙ্গে পদ্মকলির ছবি থাকলেই বুঝতে পারি কে পাঠিয়েছে। ওর আঁকা অনেক পদ্মকলি আছে আমার কাছে।"

"ওর সঙ্গে আলাপ হল কি করে ? আত্মীয়তা আছে নাকি কোনও—"

"আলাপ হয়েছিল এক মেলায় তাঁবুর মধ্যে। যদি বলি উনি একদিন আমার খদ্দের হয়ে এসেছিলেন তাহলে—"

"তাহলে আমি অবিশ্বাস করব। আমি তোমাকে চিনেছি চপলাদি, হেঁয়ালি দিয়ে ামাকে ভোলাতে পারবে না !"

চপলা স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। তাহার চক্ষু দুইটি কৌতুকে নাচিতে াগিল। তাহার পর চুপিচুপি বলিল, "উনি একজন টেরোরিস্ট। ওর দাদা আই-এন-তে (I.N.A.) সৈনিক ছিল। দেশের জন্য যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছে। ়ণালের মতে দেশ এখনও স্বাধীন হয়নি, স্বাধীনতার নামে কতগুলি বিশেষ ধরনের াজে লোক টাকা আর প্রোপাগ্যান্ডার জোরে নবাবী করছে।"

"তুমি ওর নাগাল পেলে কি করে।"

"একদিন ট্রেনে যাচ্ছিলাম। কামরাটা প্যাসেঞ্জারে ভরতি ছিল। হঠাৎ কিছুক্ষণ রে সবাই নেবে গেল। দেখলাম এক কোণে একটি ছেলে বসে খাতায় কি লিখছে। কটু পরে উঠে এসে নমস্কার করে খাতার পাতাটা ছিঁড়ে আমার হাতে দিয়ে বললে— অচেনা লোকের সামান্য উপহার গ্রহণ করুন !" দেখলাম আমারই একটা ছবি এঁকেছে। ই থেকে আলাপ শুরু। হ্যাঁ, আর একটা কথা। একটা 'লরি' ভাড়া করেছি। মুকে আনবার জন্যে। তুমি নিমুকে আর তোমার শালা শ্রদ্ধেয় কালীকিংকরবাবুকে কটা চিঠি লিখে দাও যে তুমি এখানে আলাদা একটা বাসা করেছ, নিমু যেন এই রিতে চলে আসে।"

"নিমু কি একলা আসতে সাহস করবে ?"

"রাখাল যাচ্ছে। তুমি লিখে দাও রাখালকে তুমিই পাঠাচ্ছ, চিন্তার কোনও ারণ নেই।"

কার্তিক গুম্ হইয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিল—"দেখো চপলাদি, তামার সব কথা খোলসা করে না জানা পর্যন্ত আমি ঠিক করতে পারছি না, তোমার ঙ্গে আমার জীবন জড়াব কি না।"

"তুমি বলেছিলে তুমি এ যুগের গোপালদেব হতে চাও। তার সুযোগ কি তুমি াওনি ?"

"পেয়েছি। এখানে আমার খুব ভালো লাগছে। এখানে অনেকের সঙ্গে ভাব য়েছে। বোসবাবুদের সঙ্গেও আত্মীয়তা হয়েছে খানিকটা। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে ামার মনে যে সংশয় আছে তা না ঘুচলে আমার পক্ষে এখানে থাকা শক্ত।"

"আজই সব বলব তোমায়। তুমি চিঠি দুটো লিখে ফেলো। ও হ্যাঁ, আর একটা ়থা। কলকাতার ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে মেম্বার করে দিয়েছি তোমাকে। তুমি মাঝে াঝে সেখানে গিয়ে পছন্দসই বই নিয়ে আসতে পার। কলকাতা তো এখান থেকে বশী দূর নয়। একটা কার্ড এনেছি সেটা সই করে পাঠিয়ে দাও। চাঁদা আমি জমা ়রে দিয়েছি—"

এই সংবাদে খুব খুশী হইয়া উঠিল কার্তিক। তাহার মনের মেঘ সহসা কাটিয়া গল যেন।

"খুব ভালো করেছ। তুমি তোমার চারিদিকে যে রহস্য ঘনিয়ে রেখেছ সেটা সরিয়ে ফেল চপলাদি। স্বচ্ছ পরিষ্কার আলোতে তোমাকে দেখতে পেলে আমার মনে আর কোন দ্বিধা থাকবে না। তোমার সব কথা আমি জানতে চাই।"

"সব কথা বলা যায় না সুরং। সব কথা বলা উচিতও নয়। তবে যতটা পারি ততটা

তোমাকে বলব। তুমি চিঠি দুটো লিখে ফেল। 'লরি'টা এখনি এসে পড়বে। রাখাল তৈরী হয়ে বসে আছে।—"

"হঠাৎ 'লরি' ভাড়া করতে গেলে কেন?"

"লরিটা ভাড়া করেছি আমাদের কাজের জন্য। হয়তো ওটা শেষ পর্যন্ত কিনে নেব। 'লরি' পাঠালে জিনিসপত্র নিয়ে আসতে সুবিধে হবে নিমুর। তাছাড়া তাড়াতাড়ি হবে। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই এসে পড়বে। তোমার শ্বশুরবাড়ি এখান থেকে মোটে বিশ মাইল। তুমি চিঠি দুটো তাড়াতাড়ি লিখে ও ঘরে এসো।"

খেজুর বিবি নিজের আত্মকথা বলিতেছিলেন। ঘরে কার্তিক ছাড়া আর কেউ ছিল না।

"তোমার শালা কালীকিংকর যেদিন আমার উপর বলাৎকার করেন সেদিন আমি তার মুখে লাথি মেরে চলে আসি। সেইদিনই আমার নূতন জীবন শুরু। আমার বাবা এ অঞ্চলের একজন বড় গৃহস্থ ছিলেন। মা অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছিলেন। তারপর বাবাও যখন অনেকদিন পক্ষাঘাতে ভুগে মারা গেলেন তখন আমি একলা হয়ে পড়লুম। একা এখানে থাকতে ভয় করত। তাই ঠিক করলুম পড়া তো শেষ হয়েছে এবার কোথাও মাস্টারি জুটিয়ে নিই একটা। আর কিছু না হোক পাঁচজন ভদ্রলোকের মধ্যে থাকতে পারব। আর দেশের মেয়েদের মানুষ করে তুলব। কালীকিংকরদের স্কুলে যখন চাকরি পেলাম তখন বড় আশা নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়ল। কলকাতায় ফিরে গেলাম। কলকাতায় আমার কলেজের এক বান্ধবী ছিল, তার নামটা আমি গোপন রাখব। সে চাকরি করত। আমি যখন কলকাতায় যেতাম তারই বাসায় উঠতাম। সে আমাকে বলল দেশের কাজে নেমে পড়। বললাম দেশের তো অনেক কাজ, কোন কাজে নামতে বলছিস তুই? সে বলল মধ্যবিত্ত পরিবারদের সেবা কর। তারা খেতে পাচ্ছে না। তাদের জন্যে খাবার যোগাড় কর। মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকেই বাংলাদেশে বড় বড় লোক জন্মেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে, এখনও জন্মাবে যদি ওদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারিস। আমি নিজে সাধ্যমতো সেই চেষ্টা করি। তোর তো শুনেছি জমিজমা আছে, তুই যদি এ কাজে লাগিস অনেকের উপকার হয়। আমার সামর্থ্য কম। আমি তো বেশী কিছু করতে পারি না, কিন্তু আমি জানি অনেকের বাড়িতে দুবেলা হাঁড়ি চড়ে না। প্রশ্ন করে জানলুম সে যা মাইনে পায় তার অর্ধেক সে দান করে। চোরাবাজার থেকে চাল কিনে দান করে অনেক পরিবারকে। তারপর সে নিজেই বললে—এ রকম দান করে কিন্তু তৃপ্তির চেয়ে অতৃপ্তিই বেশী হচ্ছে আমার। ওরা গরীব, কিন্তু ওরা তো ভিখিরি নয়। এভাবে চাল নিয়ে অনেকে অপমানিত বোধ করে, অনেকে নিতে চায় না, অনেকে আবার লজ্জার মাথা খেয়ে পেটের দায়ে নেয়ও। আমার নিজেরই কেমন যেন লজ্জা করে। যদি কেউ এমন একটা দোকান করত যেখান থেকে ওরা নিজেদের সামর্থ্যমতো কম দামে চাল কিনে নিতে পারত তাহলে ভালো হ'ত খুব। আমি তাকে বললাম তুই এখানে একটা স্টেশনারি দোকান কর। আমি তোকে ক্যাপিটাল দিচ্ছি। সেই দোকানে আমার জমি থেকে কিছু কিছু চালও আমি পাঠাব মাঝে মাঝে। সেটা তুই লুকিয়ে বিক্রি করিস কম দামে। ওইটেই আমার প্রথম দোকান। আমার সেই বান্ধবী এখনও সে

লাচ্ছে। কিন্তু ওই দোকান করতে গিয়ে আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। শ্বরীকে বললাম—রোজগার না করলে তো আর চালাতে পারব না। কি করি বল তা? সে বললে ভগবান তোকে এমন দুটো জিনিস দিয়েছেন যাতে মানুষ ভোলে—প, আর গানের গলা। ইচ্ছে করলে ও দুটো ভাঙিয়ে তুই হাজার হাজার টাকা রাজগার করতে পারবি। তুই রাজি থাকিস তো বল্ আমি দালালি করি। সেই সময় নেক জলসায় গান গেয়েছিলাম, অনেক শখের থিয়েটারে অভিনয়ও করেছি। প্রণয়ীও টেছিল দু'চারজন। তার মধ্যে এখনও একজন টিকে আছে, তার নাম দিয়েছি আমি বর্ণদন্ত'। তাকে তুমিও দেখেছ একদিন। ও এখন আমার প্রধান একজন সহকারী। লিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে ও কখনও দাঁতের উপর সোনার ওয়াড় লাগায় াবার কখনও খুলে ফেলে। ভারী কাজের লোক। ও না থাকলে আমি অনেক কিছুই রতে পারতাম না। আর একটা কথা—"

কার্তিক তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল—"আমি কিন্তু যে কথাটা শুনব বলে কান পতে আছি তার—"

"কোন্ কথা শুনবে বলে তুমি কান পেতে আছ তা আমি জানি। তা আমি সবার চেষ্টা করব, কিন্তু তা বলা যাবে না—"

"আমি এই কথাটা সর্বাগ্রে জানতে চাই তুমি দেহ-বিক্রী করে টাকা রোজগার র কি না।"

খেজুরি বিবির মুখে হাসি ফুটিল, গালে টোল পড়িল।

"দেহ বিক্রী করেছি বই কি। আমার হাসি, আমার রূপ, আমার গান, আমার ভিনয়-ক্ষমতা সবই তো আমার দেহকে কেন্দ্র করে। সেগুলো বিক্রী করিনি বললে থ্যা বলা হবে। কিন্তু—"

হঠাৎ নিজের শাড়ির ভিতর হাত ঢুকাইয়া একটা টকটকে-লাল-খাপে-মোড়া ছোরা হির করিয়া সে বলিল—"কিন্তু এটাও সর্বদা আমার সঙ্গে থাকে। এর থেকে তুমি যা ঝবার বোঝ। আর একটা কথাও শোনো। ভালোবাসবার মতো লোক যে পাইনি নয়, কিন্তু পেয়েও তাকে পাইনি, সে বাহুবন্ধনে ধরা দেবার লোক নয়। আর মার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি তাকে আমি নষ্ট করেছি। নষ্ট করেছি নিজের ার্থের জন্য নয়, ওই ভাগ্যহত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারদের স্বার্থের জন্য। মনে মনে জেকে স্তোক দিচ্ছি একটা মহৎ কাজের জন্য নীতির পথ থেকে একটু আধটু সরে' ল ক্ষতি কি। সবাই তো চোর, আমি সাধু থাকব কি করে। এ স্তোকবাক্যে কিন্তু ভুলছে না। সে বারবার বলছে, ওর মোহের সুযোগ নিয়ে ওকে তুমি নষ্ট করছ। মোহ যদি না থাকত তাহলে আমি—"

কার্তিক আবার বাধা দিল।

"মেলায় মেলায় তাঁবুতে তাঁবুতে বাইজী সেজে ঘোরবার অর্থটা কি সেইটে খুলে আগে—"

"ওখানে আমার খদ্দের আসে। তারা আমার গান শোনে। টাকাও দেয় নক—"

"মনে হচ্ছে তুমি বলেছিলে তোমার লাইসেন্স আছে। কিসের লাইসেন্স—"

"আগে ছিল। এখন গভর্ণমেণ্ট সুনীতিপরায়ণ হয়েছেন। পতিতাদের এখন কোন

লাইসেন্স লাগে না। পতিতা-পল্লী উঠিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। এখন আইনের চক্ষে পতিতা আর উত্থিতার কোন তফাত নেই। পতিতারা ভদ্রপল্লীতে গিয়ে বসবাস করছেন। এখন লাইসেন্স নেই, গোড়ার দিকে ছিল—"

"তোমার তাঁবুতে কি ধরনের খদ্দের আসে—"

মুচকি হাসিয়া খেজুরি বিবি বলিল—"রূপ এবং রুপিয়া দুয়েরই খদ্দের আসে।"

"রুপিয়ার খদ্দের কি রকম ?"

"আমি তাদের অনেক টাকা দিই যে—"

"কি রকম ?"

"সেদিনই তো আমার ভ্যানিটি ব্যাগে দেখলে এক তাড়া হাজার টাকার নোট আছে। তুমি চমকে গিয়েছিলে, গুণে দেখলে আরও চমকে যেতে—ওতে এক লাখ টাকা ছিল !"

"বল কি ! অত টাকা তুমি পেলে কোথা ?"

"প্রায়ই পাই। তা না হলে এত বড় কাণ্ড চালাচ্ছি কি করে !"

"টাকা পাচ্ছ কোথায় !"

গম্ভীর হইয়া গেল খেজুরি বিবি। তারপর বলিল—"সেটা শোনবার আগে শপথ করতে হবে তোমাকে যে এ কথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না। এমন কি নিমু কাছেও নয়—"

"না, তা করব কেন, তুমি যখন মানা করছ—"

"আর একটা কথাও তোমাকে বলা উচিত। এ কথা যদি প্রকাশ করে ফেল তাহলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য।"

"কে মারবে আমাকে—"

খেজুরি বিবির চোখের দৃষ্টি চকচক করিয়া উঠিল।

"আমি ! এ কথা গোপন রাখতে না পারলে যে লোকের প্রাণসংশয় হবে। লোকের নিরাপত্তার ভার শপথ নিয়ে আমি গ্রহণ করেছি। যদি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে তাকে প্রাণ দিয়ে তার মূল্য দিতে হবে। তাই আমি বলছি একথা তুমি শুনতে চেও না। অথচ তোমাকেও আমার চাই, তোমার মতো লোক আমি আর পাব না—"

"একথা তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না ?"

"না। আমার তাঁবুর সামনে যে লোকটা পাহারা দেয় সে হয়তো কিছু জানে কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না, কারণ সে বোবা। বোবা বলেই তাকে ও কাজে বাহাল করেছি।"

"রাখাল ?"

"রাখাল কিছু জানে না। ও হচ্ছে মস্ত পালোয়ান, গায়ে খুব জোর, ইচ্ছে করলে ও একটা মানুষকে শূন্যে তুলে মট্ করে ভেঙে ফেলতে পারে আখের মতো। ও আমার অন্ধ ভক্ত। হয়তো রূপে মুগ্ধ। ও আমার বডিগার্ড, আর্মড ফোর্স (armed force) বলতে পার। ও কাছে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকি। আমার কাছে থাকতে পেলেই ও খুশী, তোমার মতো ওর কোনও কৌতূহল নেই, আমার আদেশ পালন করলেই ওর তৃপ্তি—"

"ওর বাড়ি কোথা—"

"উত্তর প্রদেশে। ডাকাতি করে জেল খেটেছিল। জেল থেকে বেরিয়ে চলে আসে কলকাতায়। ওর আসল নাম ভীম তেওয়ারি। পদ্মকলির কাছে অনেকদিন ছিল। চমৎকার বাংলা শিখেছে। অবাঙালী বলে বোঝা যায় না। পদ্মকলিই ওর নাম দিয়েছে রাখাল। পদ্মকলির কাছ থেকেই ওকে পেয়েছি। ওর একটি মাত্র ছেলে, আর কেউ নেই। ছেলেটিকে মিলিটারিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে পদ্মকলি। রাখাল এখন আমাদের পরিবারের লোক। তোমাকেও আমাদের পরিবারভুক্ত হ'তে হবে। নিমু হবে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি—"

"কিন্তু ওই লক্ষ টাকার কথাটা তো বললে না—"

"ওটা না-ই শুনলে। শোনার অনেক রিস্‌ক্ (risk) আছে। সেটা না-ই নিলে।"

"না আমাকে শুনতেই হবে। তোমার সমস্ত পরিচয় সম্পূর্ণভাবে না পেলে তোমার কাছে থাকা যাবে না। তুমি সব খুলে বল—"

"বেশ শোন তবে। আমি নোট জাল করি। ঠিক আমি করি না। আমার জন্যে পদ্মকলি করে। সে চিত্রকর, নোট ছাপাবার যন্ত্রও তার কাছে আছে—"

"নোট জাল কর!"

কার্তিক বিস্ফারিত নয়নে খেজুরি বিবির দিকে চাহিয়া রহিল।

"হঁ্যা করি। যেখানে সমস্ত ব্যাপারই জাল-জুয়াচুরি পৈরবী, তদ্বির, খোশামোদ আর মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত সেখানে জাল না করলে এতগুলি গরীব লোককে আমি খেতে দিতে পারব না।"

কার্তিক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর দাঁড়াইয়া উঠিল।

"আমি চললুম। জাল-জুয়াচুরির সঙ্গে নিজেকে জড়াতে পারব না। তুমি ওই জাল নোটের জালে নিজেই একদিন জড়িয়ে পড়বে। আমি দূরে চলে যেতে চাই, কারণ প্রথমত ওসব জিনিসকে আমি ঘৃণা করি আর দ্বিতীয়ত জেল খাটবার ইচ্ছে আমার নেই। আমি চললুম। নিমুকে আনতে গাড়ি পাঠাবার দরকার নেই—"

"কি অবুঝের মতো কথা বলছ সুরং। তোমাকে এখন আমি কিছুতেই যেতে দেব না। নিমু আসুক, তারপর যা হয় ঠিক কোরো। বস না। পদ্মকলির সঙ্গে আলাপ কর একটু—"

কার্তিক কিন্তু বসিল না। উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা বগলদাবা করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল সে। খেজুরিবিবি তাহার প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ছোট খুকীর মতো তাহার নীচের ঠোঁটটি বারবার কাঁপিতে লাগিল। এ কান্না সে আরও অনেকবার কাঁদিয়াছে। তাঁহার বিবেক জানে কাজটি অন্যায়, তাহার অন্তরতম সত্তা অনুভব করে তাহার প্রেমাস্পদকে দিয়া সে অতি ঘৃণ্য কাজ করাইতেছে। এ সবই সে বারবার অনুভব করিয়াছে। কার্তিকের মুখেও সে যখন শুনিল—'আমি ওসব জিনিসকে ঘৃণা করি' তখন তাহার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মর্মটা কে যেন মাড়াইয়া দিল। কিন্তু চপলা আর একটা জিনিসও ভুলিতে পারে না। তাহার মায়ের বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখটা। সেই কোটরগত চক্ষু, সেই ঈষৎ-ব্যায়ত আনন, কালো রঙের সেই দাঁতগুলা। পঞ্চাশের মন্বন্তরের

সময় তাহার মা কলিকাতায় ছিলেন। তাঁহার পক্ষাঘাত হইয়াছিল। অনাহারে মারা গিয়াছিলেন তিনি। এক ছটাক চালও তাঁহার নিকট পেঁছাইয়া দিতে পারা যায় নাই। সমস্ত চাল তখন লীগ গভর্ণমেন্টের.হাতে। তাহাদের জমির সমস্ত ধান ইস্পাহানিরা কিনিয়া লইয়াছিল। চপলার বয়স তখন আট নয় বৎসর। সে তখন তাহার দিদিমার কাছে ছিল কুমিল্লায়। খবর পাইয়া যখন আসিল তখন মা মারা গিয়াছেন। কলিকাতায় রাস্তাঘাটে মড়া পড়িয়া আছে। বাবাও তখন খেজুরিতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তিনিও মাকে দেখিতে পান নাই তাঁহাকে কোন সাহায্য করিবারও সামর্থ্য ছিল না তাঁহার। চপলা অনুভব করিতেছে—ওই রকম আর একটা মন্বন্তর আসন্ন। তাই সে—

লরিটা আসিয়া পড়িল।

চপলা নিজেই চিঠি লিখিয়া দিল একটা।

ভাই নিমু,

তোমার জন্যে লরি পাঠালাম। জিনিসপত্র গুছিয়ে চলে এস তুমি। স্মরৎ বাইরে গেছে, তাই আমিই চিঠি লিখলাম। আমরা ভালো আছি। আশীর্বাদ নাও। ইতি

চপলাদি

চিঠি লইয়া 'লরি' চলিয়া গেল।

নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল খেজুরি বিবি। ক্রমশ তাহার চোখের জল শুকাইয়া গেল, মুখের ভাব প্রশান্ত হইয়া আসিল। ক্রমে ক্রমে আবার সেই প্রশ্নটাই তাহার মনে জাগিল যাহা বহুবার জাগিয়াছে। মা বাবাকে ছাড়িয়া কলিকাতায় একটা ছোট ভাড়াটে বাড়িতে চলিয়া গিয়াছিলেন কেন? তাহাকেই বা সুদূর কুমিল্লায় মামার বাড়িতে পাঠাইয়া দেওয়ার হেতু কি? হেতুটা ঠিক কি তাহা চপলা জানে না। শুধু জানে একদিন সকালে উঠিয়া মা বলিলেন, চল আজ আমরা কলকাতা যাব। বাবা তখন বাড়িতে ছিলেন না। কলিকাতায় আসিয়া তিনি এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠিয়াছিলেন এবং সেখানে বাপের বাড়ির একজন লোককে পাইয়া তাহার সহিতই চপলাকে কুমিল্লা পাঠাইয়া দেন। এসব করিবার কি কারণ ছিল? চপলা ঠিক জানে না। কিন্তু নিশ্চয়ই গুরুতর কারণ ছিল একটা। একটা জনশ্রুতি অবশ্য সে শুনিয়াছে। কৃষ্ণধনবাবুর মায়ের সহিত তাঁহার বাবার নাকি একটা অবৈধ সম্পর্ক ঘটিয়াছিল। কৃষ্ণধনবাবুর বাবা এখানে জমিদারি স্টেটে সামান্য বেতনের মুহুরি ছিলেন। মা যেদিন সে কথা টের পান সেইদিনই গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। বাড়ির পুরাতন দাসী মুনুর মায়ের কাছে এ কথা শুনিয়াছিল সে। শুনিয়া ধমকাইয়া দিয়াছিল তাহাকে। কিন্তু মানুষের মন এমন বিচিত্র যে মুনুর মাকে ধমকাইয়া দিলেও কথাটাকে সে অবিশ্বাস করে নাই। নিজের সে এখন বুঝিয়াছে পুরুষ-জাতের স্বভাবটা কি। যুবতী নারীর সংস্পর্শে প্রায়ই তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়ে। অনেকটা পতঙ্গের মতো, আলো দেখিলেই ছুটিয়া আসে। এই সাধারণত সব পুরুষেরই স্বভাব, কোথাও প্রকট, কোথাও প্রচ্ছন্ন। এ জন্য বাবার উপর তাহার রাগ নাই। বরং এই জন্যই সে কৃষ্ণধনবাবুর পরিবারের সহিত নিজের কেমন যেন একটা আত্মীয়তা অনুভব করে। বাবা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন হয়তো ইহাদের এতো অভাব থাকিত না। কৃষ্ণধনবাবুর মাকে সে ছেলেবেলায় দেখিয়াছিল। তিনি কালো ছিলেন, কিন্তু কি অপরূপ শ্রী যে ছিল তাঁহার! চপলাকে তিনি খুব আদর করিতেন। কৃষ্ণধনবাবুর বাবা রূপবান ছিলেন না…হঠাৎ তাহার

মায়ের মুখটা আবার তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। কঠিন হইয়া উঠিল তাহার মুখের ভাব। সে মনে মনে বলিল—না, আমি ঠিকই করছি। অনাহারে কাউকে আমি মরতে দেব না। এর জন্যে যদি আমাকে নরকেও নামতে হয় নামব।

"এখন কি করছ আলো—কার্তিকবাবু কোথা"—পদ্মকলি আসিয়া প্রবেশ করিল। চপলা মৃণাল নামটাকে বদলাইয়া পদ্মকলি করিয়াছিল, মৃণালও তাহার নূতন নামকরণ করিয়াছিল—আলো।

"বেরিয়ে গেল। আমি ওকে সব কথা বলেছি, পদ্মকলি। তুমি রাগ করবে না তো? ও এমন না-ছোড়, বলতেই হল—"

"একটা কথা তুমি মনে রেখো। পদ্ম কখনও আলোর উপর রাগ করে না। তার স্পর্শে সে সর্বদাই আনন্দিত। তুমি আমার আনন্দের উৎস। তুমি যা খুশী কর আমার আপত্তি নেই, আমার ভয় নেই, ভাবনাও নেই—"

চপলা স্মিতমুখে চাহিয়া রহিল তাহার দিকে। তাহার পর বলিল—"কিন্তু উৎসে অবগাহন করবার প্রবৃত্তি তো হয় না তোমার কোনও দিন—"

"না। উৎসকে আমি অপবিত্র করতে চাই না। আমি জানি প্লেটোনিক ভালোবাসা অসম্পূর্ণ, কিন্তু ওই অসম্পূর্ণতারই আনন্দে আমি ভরপুর। ওর সীমাবদ্ধতার সীমায় দাঁড়িয়ে আমি অসীমকে দেখতে পাই। তা যখন পাব না তখনই সীমা লঙ্ঘন করবার কথা ভাবব। চল কার্তিকবাবুর সঙ্গে একটু আলাপ করা যাক—"

"সে বেরিয়েছে। দেখি কোথায় গেল—"

বাহির হইয়া তাহারা কার্তিককে দেখিতে পাইল না।

॥ ৪ ॥

বাহির হইয়াই কার্তিক একটা খালি রিকশা পাইয়া গেল। তাহাতেই চড়িয়া বসিল।

"কোথা যাবেন বাবু—"

"চল না কিছু দূরে এগিয়ে। কোনও ফাঁকা জায়গায় নেমে পড়ব।"

"কোন ফাঁকা জায়গায়—"

"আরে তুমি চল না, আমি ঠিক জায়গায় নেমে পড়ব।"

কার্তিককে এ অঞ্চলে সকলেই চিনিত, সকলেই জানিত যে দশটি কো-অপারেটিভ দোকান এ অঞ্চলে গরীবদের সহায় কার্তিকই তাহার সর্বেসর্বা। রিকশাওয়ালা আর আপত্তি করিল না। মাইল দুই দূরে একটা ফাঁকা মাঠে সে নামিয়া পড়িল। মাঠের ওপারে বৃক্ষবেষ্টিত একটা স্থান ছিল। রিকশাওলার ভাড়া মিটাইয়া সেই দিকেই অগ্রসর হইল কার্তিক। গিয়া দেখিল মস্তবড় একটা পুষ্করিণী। একটা গাছের নীচে বসিয়া সে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিতে মনোনিবেশ করিল। চপলার নিদারুণ স্বীকারোক্তি তাহার মনে যে ঝড় তুলিয়াছিল, যে অনিশ্চিত জীবনের ছবি আবার তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছিল তাহার অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুর আকস্মিকতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই সে পলাইয়া আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল এই নির্জন

স্থানটিতে এবং চেষ্টা করিতেছিল এই অখ্যাত লেখকের অদ্ভুত লেখাটার সাহায্যে নিজেকে খানিকক্ষণ ভুলিয়া থাকিতে।

"সূত্রধার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মনে হইতেছিল তিনি যেন সর্ব-শুক্লা স্বরস্বতীর পুরুষ-সংস্করণ। হস্তে শ্বেতপদ্ম, পরিধানে শ্বেত বসন, শ্বেত উত্তরীয়, কণ্ঠে শ্বেতপুষ্পের মালা, ললাটে শ্বেতচন্দনের তিলক। তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে ও মুখের হাসিতেও যেন শুভ্রতা ক্ষরিত হইতেছিল।

তিনি বলিতেছিলেন, "মানুষ যে জঘন্যতম পশু এর অনেক উদাহরণ ইতিহাসে আছে। সমস্ত পশুরাই মাৎস্যন্যায়ের অনুবর্তী। পশুশক্তিই তাদের কাছে ন্যায়ের একমাত্র মাপকাঠি। মানুষ-পশুরাও অন্য ন্যায় জানে না। এই পশু-দানবদের দলন করতে হলে তাই পশু-শক্তিই প্রয়োগ করতে হয়। যেখানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে সেখানে অহিংসার বাণী যত জোরেই এবং যত রকমেই বলা হোক আগুন নিববে না। আগুনে জল ঢালতে হবে, আগুন নেবাবার জন্য দমকল ডাকতে হবে। গীতার অর্জুন থেকে আরম্ভ করে আপনাদের যুগের নেতাজী পর্যন্ত ওই এক কথা বলে গেছেন। গোপালদেবও যে সেই মাৎস্যন্যায়ের যুগে গণতন্ত্র স্থাপন করে তার নেতারূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন তারও মূলে ছিল তাঁর বাহুবল। এর কোনও ঐতিহাসিক তথ্যই তো পাওয়া যায় না। কিন্তু ফল থেকে কারণ অনুমান অসঙ্গত নয়। তিনি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশে অত বড় একটা অভিনব রাজত্ব স্থাপন করতে পেরেছিলেন শুধু অহিংসার বচন আউড়ে বা প্রেমের বাণী বিতরণ করে—এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিনি সৈনিক ছিলেন, হয়তো নানা সদ্‌গুণের জন্য তিনি জনপ্রিয়ও ছিলেন—কিন্তু শুধু সদ্‌গুণের জন্যই তিনি একটা রাজ্যের নেতা হয়েছিলেন, কোনরকম বলপ্রয়োগ বা কৌশলপ্রয়োগ করেন নি একথা মন মানতে চায় না। আমি বলব মাৎস্যন্যায়ের বিশৃঙ্খলা তিনি বীর্যবলেই সুনিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। তারপরও আমাদের দেশে অনেকবার মাৎস্যন্যায়ের বীভৎসতা দেখা গেছে, যদিও ইতিহাসে সে কথা মাৎস্যন্যায়ের নামে চিহ্নিত হয়ে নেই। আজকালকার কথাই ভাবুন না। আজকাল ন্যায়ের মুখোশ পরে মাৎস্যন্যায়ই কি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসে নেই ? ওই যে ইতিহাস আসছেন, তাঁর মুখেই ইতিহাসের কথা শুনুন।......"

সূত্রধার অন্তর্হিত হইলেন।

গোপালদেব সবিস্ময়ে দেখিলেন আকাশপটে এক বিরাট বাদক স্কন্ধে এক বিরাট দামামা ঝুলাইয়া সেটি বাজাইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার মাথায় স্বরঞ্জিত শিরস্ত্রাণ, পরিধানের বস্ত্রটিও বর্ণ-শোভায় মনোহর। গায়ে কিন্তু কোন জামা নাই। সর্বাঙ্গ সুগঠিত পেশীতে সমৃদ্ধ। সেই দুন্দুভি-নিনাদে গোপালদেব যেন শুনিতে লাগিলেন সত্যের জয় হোক, সত্যের জয় হোক, সত্যের জয় হোক। নানাভাবে নানা ছন্দে দুন্দুভি কেবল বলিতে লাগিল সত্যের জয় হোক, সত্যের জয় হোক। সর্বশেষে বাদ্য থামাইয়া তিনি ঘোষণা করিলেন—ইতিহাস আসিতেছেন।

ঘোষক অন্তর্ধান করিলেন। আকাশপটে পুনরায় সেই শিলাবেদি মূর্ত হইল। তাহার উপর সৌম্যকান্তি ইতিহাস আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়া ভূর্জপত্র হইতে পাঠ করিতে লাগিলেন ঃ—

"আমাদের দেশে প্রত্যেক রাজত্বের অবসান সময়েই মাৎস্যন্যায় দেখা দিয়াছিল। পাল রাজগণ যখন দুর্বল হইয়া পড়িলেন তখন বর্মরাজবংশের উদ্ভব হইল। এই বংশের বজ্রবর্মা একাধারে বীর কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র জাতবর্মার অনেক কীর্তিকথা ইতিহাসে লেখা আছে। কিন্তু ইঁহারাও বেশীদিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। ভোজবর্মাই এ বংশের শেষ রাজা। তাহার পর আসিলেন সেন রাজগণ কর্ণাটক হইতে। কোনও রাজ্যের প্রজাগণ যদি সন্তুষ্ট থাকেন তাহা হইলে বহিরাগত কোন শত্রু আসিয়া সহসা সেখানে রাজ্য স্থাপন করিতে পারে না। পাল রাজাগণ সকলেই প্রায় বৌদ্ধ ছিলেন, বৌদ্ধ ধর্মের বাড়াবাড়ি বঙ্গদেশ বোধহয় আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। বর্ম বংশীয় রাজারা বৈদিক ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সেই জন্যই সম্ভবত তাঁহারা বঙ্গদেশে প্রশ্রয় পাইযাছিলেন। কিন্তু বর্মরাজবংশ বেশীদিন নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখিতে পারেন নাই। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে কর্ণাটদেশীয় বিজয় সেন এই বর্মরাজবংশকে উৎখাত করেন। সেন রাজারাও বৌদ্ধ ছিলেন না। পাল রাজত্বের শেষ যুগে বাংলায় রাজনৈতিক একতা আর ছিল না, বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহারা পরস্পর কলহে মত্ত হইয়াছিলেন। বিজয় সেন দ্বিতীয় গোপালদেবের মতো আবির্ভূত হইয়া দেশে দৃঢ় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্বত্র সুখ ও শান্তি আনয়ন করিলেন। বিজয় সেনের রাজত্ব বাংলাব ইতিহাসে গৌরবের যুগ। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন দেশকে গৌরবের শিখরে লইয়া গিয়াছিলেন। শস্ত্রচালনা ও শাস্ত্রচর্চায় জীবন অতিবাহিত করিয়া রাজর্ষিতুল্য বল্লাল সেন বৃদ্ধবয়সে পুত্র লক্ষ্মণ সেনের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ এবং তাঁহাকে সাম্রাজ্যরক্ষারূপ দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া সস্ত্রীক ত্রিবেণীর নিকট গঙ্গাতীরে বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্বক শেষ জীবন অতিবাহিত করেন—প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের পুস্তক হইতে ঐটুকু উদ্ধৃত করিলাম। দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর গ্রন্থ দুইখানি বল্লাল সেনের অমর কীর্তি। লক্ষ্মণ সেন যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের সময়ই তুরস্ক সেনারা গৌড় জয় করিল। বাংলার মাটিতে মুসলমান মহম্মদ বখতিয়ার খিলজী পদার্পণ করিলেন। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে লক্ষ্মণ সেন খুব খারাপ রাজা ছিলেন না, তবু তাঁহাকে রাজ্য হারাইতে হইল খুব সম্ভবত বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রে। সপ্তদশ অশ্বারোহীর ভয়ে লক্ষ্মণ সেন পলায়ন করিয়াছিলেন মীনহাজুদ্দিন লিখিত এই অদ্ভুত গাল-গল্প নিতান্তই অবিশ্বাস্য। ইহার কোন দলিল বা বিবরণ নাই। লোকমুখে শোনা কথা। আধুনিক কালে ইংরেজরাও আমাদেব নামে এরূপ মিথ্যা কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমাদের নামে অনেক মিথ্যা কুৎসাও তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হলওয়েল মনুমেণ্ট একটা বিরাট মিথ্যার প্রতীক ছিল এই সেদিন পর্যন্ত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র কলঙ্কের স্তম্ভটাকে অপসারিত করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসে যাহা লেখা হয় সব সময়ে তাহা সত্য নয়। তবে এটা সত্য কথা যে যখন কোন রাজ্যের পতন হয় তখন সে রাজ্যের ভিতরই অনেক গলদ থাকে। সেই গলদের সুযোগ লইয়া বিশ্বাসঘাতকরা শত্রুপক্ষের সুবিধা করিয়া দেয়। প্রত্যেক রাজত্বের পতনের পূর্বে রাজা আর রাজ্যের সম্বন্ধে সমনস্ক থাকেন না। তাঁহার অনুগ্রহ-পুষ্ট রাজকর্মচারীরা তখন যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত

হয়, মাৎস্যন্যায়ের মতোই একটা অন্যায় কাণ্ড সর্বত্র চলিতে থাকে, প্রজারা অসন্তুষ্ট হয় এবং বিশ্বাসঘাতকরা সেই সুযোগে শত্রুদের ডাকিয়া আনে। ইতিহাসে বারংবার ইহা ঘটিয়াছে। আর একটা জিনিসও ঘটিয়াছে। দেশ যখন বিশৃঙ্খল বিপর্যস্ত হইয়া যায় তখন দেশের ভিতর হইতেই ইহার প্রতিকার ইহার প্রতিবাদ কোনও নেতা বা রাজার ভিতর মূর্তি পরিগ্রহ করে। সেকালে রাজা গোপালদেব ইহার উদাহরণ। আর একটি উদাহরণ রাজা গণেশ। তিনিই একমাত্র স্মরণীয় পুরুষ যিনি পাঁচ শতাধিক বর্ষব্যাপী মুসলমান শাসনের মধ্যে হিন্দু অভ্যুত্থানের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিতে পারিয়াছিলেন। মুসলমান রাজত্বের সময় এইরূপ আরও দুইটি অবিস্মরণীয় পুরুষ শিবাজী এবং রানা প্রতাপ সিংহ। মুসলমান শাসন-কালে আর একজন বিদ্রোহী পুরুষও বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—শ্রীচৈতন্য। ইনি অসিহস্তে যুদ্ধ করেন নাই, দুই বাহু বাড়াইয়া সকলকে প্রেমালিঙ্গনে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার এই অভিনব বিদ্রোহ শুধু ধর্মজগতেই নয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক জগতেও যে পরিবর্তন আনিয়াছিল তাহা বিস্ময়কর। শ্রীচৈতন্য তপস্বী ছিলেন, তপস্যা কখনও নিষ্ফল হয় না। ইতিহাসে এইরূপ আর একটি তপস্যার প্রভাব ভারতের ভাগ্যে নিদারুণ অভিশাপই বহন করিয়া আনিয়াছিল। এ তপস্যা করিয়াছিলেন পর্তুগালের ইতিহাসবিখ্যাত রাজকুমার হেনরি। তিনি চিরকুমার থাকিয়া সেন্‌ট্‌ ভিনসেণ্ট (St. Vincent) নামক অন্তরীপে পুরোহিতগণের পবিত্র সাধনক্ষেত্রে বসিয়া স্বপ্ন দেখিতেন—কি করিয়া নৌকাযোগে সমুদ্রপথে নূতন দেশে যাওয়া যায়। তাঁহার অপূর্ব অধ্যবসায় বলে তিনি বায়ুবলে পোত-চালনা করিবার শিক্ষালাভ করিয়া বড় বড় সমুদ্রপোত নির্মাণের উদ্যম করিয়াছিলেন। তাঁহার সে উদ্যম সফল হইয়াছিল। বায়ুচলিত অর্ণবপোতে সুশিক্ষিত নাবিকরা সমুদ্রপথে বহুদূরে অগ্রসর হইতেও পারিয়াছিল। এই তপস্যার ফলেই ভাস্কো-ডা-গামা, আলবুকার্ক প্রভৃতি দস্যুরা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতের মালাবার উপকূলে কেরলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা যাহা করিয়াছিল তাহা সভ্যমানুষের কীর্তি নয়, অসভ্য বর্বর নর-পশুদের লোভোন্মত্ত পাশবিক অত্যাচার। এমন লোককে সাহায্য করিবার জন্যও ভারতবর্ষে বিশ্বাসঘাতক জুটিয়াছিল—কোচিনরাজ সাহায্য না করিলে তাঁহারা কালিকটরাজ সামরীকে বিধ্বস্ত করিতে পারিতেন না। আলবুকার্ক যখন ভারতের উপকূলে রাজধানী স্থাপন করিবার জন্য স্থান অন্বেষণ করিতেছিলেন তখন গোয়া স্থানটির সন্ধান তাঁহাকে একজন ভারতীয় জলদস্যুই দিয়াছিল—লোকটার নাম টিমোজা। এরূপ টিমোজা ও কোচিনরাজের অস্তিত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বত্র আছে। নেতাজী আই-এন-এ হইতেও ইহাদের সম্পূর্ণ দূর করিতে পারেন নাই। আমি এসব কথা বলিতেছি তাহার কারণ যেখানে ইতিহাসে স্পষ্ট প্রমাণ নাই সেখানে সবরকম সম্ভবপর কথাই ঐতিহাসিকের মনে রাখা উচিত। ইতিহাস কেবল মহৎ লোকদের কাহিনীমালাই নহে, তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়া আছে অনেক নীচ স্বার্থপর লোকেরও কুকীর্তি। গোপালদেব সম্বন্ধে কিছু জানা নাই, ঐতিহাসিক তাঁহাকে মহামানব বলিতেও যেমন ইতস্তত করিবে মহাদানব বলিতেও তেমনি ইতস্তত করিবে। ইতিহাসের আলোকে এক যুগের বীর অন্য যুগে দস্যু বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে। ইহাও স্মরণযোগ্য আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন, ফ্রেডারিক দি গ্রেট, হিটলার এখন আর বীর বলিয়া লোকের সম্ভ্রম উদ্রেক

করিতে পারেন না। গোপালদেব সম্বন্ধেও ঐতিহাসিক মনোভাব সেজন্য নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। হয়ত তিনি মহাকৌশলী ছিলেন—ও বাবা, কবি আসিতেছেন। আমি চলিলাম। তাঁহার কল্পনার ফেনায়িত সমুদ্রে সাঁতার কাটিবার সাধ্য আমার নাই।"

ইতিহাস সহসা আকাশপট হইতে বিলীন হইয়া গেলেন। কবির আবির্ভাব হইল। এবার কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধ-রূপ নহে তরুণী-রূপ। গায়ত্রীর ধ্যানে মধ্যাহ্নকাশে তাঁহাকে যে রূপে ঋষিরা কল্পনা করিয়াছেন—এ যেন সেই রূপ। রক্তিম স্বর্ণাভায় সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত, বিরাট গরুড়পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পীতবাসা যুবতী দুই হস্তে বৃহৎ একটি স্বর্ণ প্রদীপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সে প্রদীপের অকম্পিত শিখা জবাকুসুমসংকাশ। তাহার আকাশমুখী সমুজ্জ্বল বার্তা নীরব অথচ বাঙময়। তাহা যেন বলিতেছে—'আমার দিকে চাহিয়া দেখ, আমিই তোমাদের ভবিষ্যৎ। সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অন্তরে আমার জন্ম হইয়াছিল সুদূর অতীতে, সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অন্তরে আমি এখনও দেদীপ্যমান, সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অন্তরেই ভবিষ্যতেও আমার জ্যোতি অম্লান থাকিবে। যাঁহার অন্তর হইতে বাহির হইয়া আমি প্রদীপরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছি, তিনি সাগ্নিক কবি। তিনি সরস্বতীর কৃপায় ধন্য। তিনি নারীরূপেই শক্তি-স্বরূপিণী। তিনি গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছেন, কারণ গরুড়ই একদা বিবদমান গজকচ্ছপকে ভক্ষণ করেন, গরুড়ই জননীর জন্য অমৃত উদ্ধার মানসে স্বর্গে গমন করিয়া অগ্নিবেষ্টিত চক্রকুণ্ডে প্রবেশ করতঃ অমৃতরক্ষাকারী ভীষণ সর্পকে বধ করিয়া অমৃত উদ্ধার করেন। ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করিয়াও এই গরুড়কে বধ করিতে পারেন নাই। এই গরুড় সর্পকুলের শত্রু। এই গরুড় পালনকর্তা বিষ্ণুর বাহন। তাই কবি আজ গরুড়ে আরোহণ করিয়া শক্তিরূপিণী নারীর রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার বাণী শ্রবণ করুন।'

কবি কথা কহিলেন।

"গোপালদেব কি রকম ছিলেন তা নিয়ে চিন্তা করা আমি পণ্ডশ্রম মনে করি। গোপালদেব সত্যিই যেদিন আসবেন সেদিনও তাঁকে জনতা চিনতে পারবে না কিছুদিন। যেদিন পারবে সেদিন কেউ ফুলের মালা নিয়ে ছুটে আসবে, কেউ কাদা ছুঁড়বে। এই কিছুদিন আগেই তোমাদের মধ্যেই মহান নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল, তিনি দেশের জন্য সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে যা করেছিলেন তার তুলনা পৃথিবীতে নেই। এক সভায় সেই নেতাজীর গলায় ফুলের মালা পরাতে গিয়ে স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, বৃটিশ সরকার আপনার স্বদেশ-প্রীতির জন্য আপনাকে কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন—আমরা আপনার দেশবাসীরা আপনার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছি। নেতাজী এখন নেই। তাঁর দেশ এখন খণ্ডিত স্বাধীনতা পেয়েছে। সেই স্বাধীন সরকারও তাকে তাঁর যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। অনেক নেতারই এ দুর্দশা ঘটেছে। তাই আমি এমন নেতার রূপ কল্পনা করছি, এমন একজন গোপালদেবের কথা ভাবছি, যিনি এখনও মূর্ত হননি, যাঁর মাথায় কেউ এখনও কাঁটার মালা পরিয়ে দেয়নি, যিনি এখনও অকলঙ্কিত চন্দ্রের মতো আমার মানসলোকে জ্যোৎস্না বিকিরণ করছেন, যাঁর উজ্জ্বল আবির্ভাবে আমার মনের আকাশ পুলকিত হয়ে উঠেছে। যাঁর অভ্যর্থনায় শত শত শঙ্খ বাজছে, যাঁর মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করছেন স্বর্গের দেবতারা। এই অজাত নেতাকেই আমি প্রতিদিন

নানা অলংকারে সাজাই, নানা বর্ণে রঞ্জিত করি অর্চনা করি নানা বন্দনায়, চর্চিত করি যে গন্ধ-প্রসাধনে তা মর্ত্যলোকে সুলভ নয়। সে নেতার আগমনী গান ধ্বনিত হচ্ছে দুঃখীর ক্রন্দনে, আর্তদের হাহাকারে, অত্যাচারের অট্টহাস্যে. সে নেতার পথে আলোর দীপাবলী সাজিয়েছেন আশাবাদী বিশ্বাসীরা, সে আবির্ভাবের পটভূমিকা তৈরি করছে বর্তমান যুগের শহীদদের আত্মোৎসর্গ, তাঁর বন্দনা-গান রচনা করছি আমি, শাশ্বত কালের কবি। কিন্তু তিনি এখনও আসেন নি, তবে এও জানি তিনি আসন্ন। তিনি আসবেন। অরবিন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, মহামান্য টিলক, নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতার যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, ইনিও সেই বাণী উচ্চারণ করবেন। কারণ বাণী চিরকাল একই থাকে, প্রকাশ করবার ভঙ্গীতেই তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। বন্দেমাতরম্ আর জয় হিন্দ—মূলত একই ভাবের প্রকাশ। দেশের সম্বন্ধে বিবেকানন্দ যা বলেছেন সেই ভাবই প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বাণীতে। তবু কত বিভিন্ন ওঁদের আবির্ভাব। সত্য শিব সুন্দরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সেই বহু প্রাচীন কালে উপনিষদের কবি গেয়েছিলেন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। তার পর লক্ষ লক্ষ কবি লক্ষ লক্ষ নেতা ওই একই ভাবে ডাক দিয়েছেন নিদ্রিত জনতাকে—কিন্তু ভিন্ন ভাষায়, ভিন্ন ভঙ্গীতে। অনাগত যুগের অজাত নেতার মুখে কোন্ ভাষায় কোন্ ভঙ্গীতে এই সনাতন বাণী ফুটবে তা শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছি, কিন্তু এখনও শুনতে পাইনি। আপনি গোপালদেবের কথা ভাবছেন, গোপালদেবই আবার আবির্ভূত হবেন, কিন্তু নব রূপে। কোনও লোভ, কোনও মোহ, কোনও স্বার্থ তাঁকে বিচলিত করতে পারবে না, অতন্দ্রিত তপস্যায় নিজেকে তিনি পবিত্র করছেন, প্রস্তুত করছেন. নিজেকে স্বদেশ-প্রেমযজ্ঞাগ্নির আহুতি রূপে। দেশের জন্য আত্মবিসর্জন করবেন তিনি। গরুড়ের মতো ধ্বংস করবেন সর্পকুলকে, অমৃত এনে দেবেন দেশমাতার হস্তে, বহন করবেন পালনকর্তা বিষ্ণুকে, দহন করবেন সর্ববিধ পাপ ও অশান্তি। তারপর দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি আত্মবিসর্জন করবেন, তাঁর দেহটা হয়তো ভস্মীভূত হয়ে যাবে, কিন্তু তিনি মরবেন না, তাঁর অমর কীর্তির অমরাবতীতে তিনি মৃত্যুঞ্জয় হয়ে থাকবেন ভবিষ্য যুগের আদর্শ হয়ে চিরকাল। ইতিহাসের নজীর নিয়ে গোপালদেবের কল্পনা করবেন না, কারণ তিনি হবেন অনন্য, অভূতপূর্ব। তিনি কি বলবেন কি করবেন তা আমরা জানি অথচ জানি না। কোন্ অভিনবত্ব নিয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন তার নানারকম কল্পনা করে চিত্তবিনোদন করতে পারি, কিন্তু বার বার স্বীকার করতে হবে—জানি না জানি না তুমি কেমন হবে।—"

মহান আসিয়া প্রবেশ করিতেই স্বপ্নজাল ছিন্ন হইয়া গেল। মহান ডাক লইয়া আসিয়াছিল। ডাকটি রাখিয়া সে বলিল—"একটা ঘোড়া এসেছে। খুব ভালো ঘোড়া।"

"ঘোড়া?"

"হ্যাঁ। যিনি এনেছেন তিনি এই চিঠিটাও দিলেন।"

শিলমোহর-করা একটি পত্র সে গোপালদেবের হাতে দিল। পত্রটি পড়িয়া গোপালদেব বিস্মিত হইয়া গেলেন। বহুকাল পূর্বে তিনি যে অশ্বব্যবসায়ীকে পত্র

লিখিয়াছিলেন তিনিই ঘোড়াটি পাঠাইয়াছেন। লিখিয়াছেন—'অধ্যাপক মহাশয়, আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমি এই পত্রবাহকের সহিত একটি ভালো ঘোড়া পাঠাইতেছি। এটি আমার উপহারস্বরূপ যদি গ্রহণ করেন কৃতার্থ হইব। একজন প্রকৃত গুণীকে সেবা করিবার সুযোগ জীবনে বড় একটা আসে না। সে সুযোগ যখন আসিয়াছে তখন আমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবেন না। .....'

গোপালদেব মহানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"লোকটি কোথা ?"

"সে বাইরের ঘরে রয়েছে। তার একটি কথা বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত কাবুলী—"

"তাকে ডেকে আন—"

একজন বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় ব্যক্তি আসিয়া প্রবেশ করিল। উজ্জ্বল চক্ষু, তীক্ষ্ণ নাসা, সূচ্যগ্র দাড়ি। মাথায় কাবুলী টুপি পরিধান করিয়া আছে। সে আসিয়াই গোপালদেবকে মিলিটারি কায়দায় স্যালুট করিল। যে ভাষায় কথা কহিল তাহা গোপালদেব বুঝিতে পারিলেন না, মনে হইল পুস্তু ভাষা। গোপালদেব তখন মহানকে ডাকিয়া বলিলেন, "আলমারি থেকে একটা একশ টাকার নোট নিয়ে এস।"

কাবুলী কিন্তু নোট হইল না। আর একবার স্যালুট করিয়া পকেট হইতে একটি ছোট চামড়ার থলি বাহির করিল। থলিটি খুলিয়া সে দুইখানি একশত টাকার নোট গোপালদেবকে দেখাইল। এবং বার কয়েক মাথা নাড়িল। গোপালদেব তখন বাহিরে গিয়া ঘোড়াটি দেখিলেন। অপূর্ব ঘোড়া। মনে হইল আরব দেশের ঘোড়া এটি। ঘোড়াটির গ্রীবা-ভঙ্গী, গড়ন, উচ্চতা প্রভৃতি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। দেখিলেন ঘোড়াটি সুসজ্জিত করিয়াই পাঠাইয়াছেন ভদ্রলোক। নূতন জিন, লাগাম, রেকাবে ঘোড়াটি সুসজ্জিত। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি একটি পত্র লিখিয়া কাবুলীকে দিলেন। লিখিলেন—'আপনার বদান্যতায় আমি মুগ্ধ। অনেকদিন ঘোড়ায় চড়ি নাই, এবার চড়িবার চেষ্টা করিব। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

পত্র লইয়া কাবুলী পুনরায় স্যালুট করিয়া চলিয়া গেল।

কার্তিক তন্ময় হইয়া পড়িতেছিল—হঠাৎ ঘেউ ঘেউ ঘেউ শব্দে চমকাইয়া উঠিল। কুকুরটা যে কখন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সে টের পায় নাই। দেখিল ঘন ঘন ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে লর্ড তাহাকে বকিতেছে। ভাবটা—এমন ভাবে পালিয়ে আসার মানেটা কি।

"তুই কি করে এলি এখানে!"

লর্ড তাহার কাঁধের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া আবদারের সুরে বলিল—"গো-ও-ও-ও—।"

"সর। পড়ছি, এখন বিরক্ত করিস না—"

লর্ড পুনরায় বলিল—"গো-ও-ও-ও—।"

তাহার পরই সোঁ করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। পুকুরের পাড়ে গিরগিটি দেখিতে পাইয়াছিল সে। গিরগিটিকে ধরিতে পারিল না। একটা গাছের ডালে কয়েকটা শালিক বসিয়াছিল, পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া তাহাদেরই বকিতে লাগিল। শালিকরা

উড়িয়া গেল। তখন সে মাথা নীচু করিয়া মাটি শুঁকিতে শুঁকিতে পুকুরের পাড়ের ঝোপঝাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কার্তিক আবার পাণ্ডুলিপিতে মন দিল।

"গোপালদেব ডাকের চিঠিপত্র দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে একটা খাম তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। খামের উপর পরিচিত হস্তাক্ষর, যে হস্তাক্ষরের আশায় প্রথম যৌবনে একদা তিনি পিয়নের পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন। দময়ন্তীর চিঠি। খামের ভিতর হইতে চিঠিটা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। দময়ন্তী লিখিয়াছিলেন—

শ্রীচরণেষু,

অনেক দিন পরে তোমাকে চিঠি লিখছি। কাল আমি আমেরিকা চলে যাচ্ছি। মগনলাল সেখানে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নীলার ছেলে-পেলে হবে। ওরা টাকা দিয়ে যদিও নার্স হাসপাতাল ডাক্তার সব কিছুর ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু নীলা, আমাদের সেই নীলা, যার তুমি অনেক নাম দিয়েছিলে—নীলটু, নাইল, নীল পাখী, নীলগ—আমাদের সেই নীলা বিদেশে গিয়ে বড়ই কাতর হয়ে পড়েছে। আমাকে চিঠি লিখেছে—'মা, এখানে আমার একটুও ভালো লাগছে না। টাকা দিয়ে সব কেনা যায় ভালোবাসা কেনা যায় না। এখানে কোনও জিনিসেরই অভাব নেই, তবু মনে হচ্ছে আমি নিতান্ত অসহায়। জলের মাছকে কে যেন ডাঙায় তুলে এনেছে। কাল রাত্রে একটা ভারী বিশ্রী দুঃস্বপ্ন দেখেছি। মগন যেন মারা গেছে, আর সে 'নিগার' বলে তার মড়া যেন কেউ ছুঁচ্ছে না। আমি যেন পাগলের মতো নোটের তাড়া নিয়ে সকলের খোশামোদ করে বেড়াচ্ছি, তবু কেউ আসছে না। বড্ড খারাপ লাগছে আমার। এখানে স্নেহ ভালোবাসা সেবা যত্নও সব নিক্তির ওজনে, ডলারের মাপে। তোমার জন্যে বড্ড মন কেমন করছে। তুমি কাছে থাকলে আমি নির্ভয় হবো। এখানে এই অচেনা জায়গায় সর্বদাই ভয় ভয় করে আমার। মা তুমি এস। আমি এই সঙ্গে একটা ড্রাফ্ট পাঠালুম। প্লেনে চলে এস। দাদাকে বললেই সে পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দেবে। বাবাকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে খুব। কিন্তু ভয়ে লিখতে পারি না। তাঁর চক্ষে আমরা দোষী। যদিও আমরা যা করেছি তা নিজেদের বিবেক অনুসারেই করেছি, কিন্তু তাঁর বিবেকের সঙ্গে আমাদের বিবেকের মিল নেই। আমরা সাধারণ মানুষ, তিনি অসাধারণ। তাঁর নাগাল পেলুম না. এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। সেই দুর্ভাগ্যটাকে নতশিরে মেনে নিয়েছি। সত্যি, জীবন জিনিসটা কি আশ্চর্য—কত রকমই যে হয়—আমাদের বাবা অত দূরে চলে যাবেন এ যে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তুমি কিন্তু মা এসো। বুঝলে? কোন ওজর আমি শুনব না।'

প্রবাল সব ঠিক করে দিয়েছে। কাল আমি যাচ্ছি। তুমি তো জানো, আগে আমার নানারকম সংস্কার ছিল, ছুঁচিবাই ছিল, গঙ্গাজল ছেটানো আর বারবার কাপড় ছাড়া নিয়ে তুমিও একদিন কত ঠাট্টা করেছ। এখন ছেলেমেয়েদের জন্য সব জলাঞ্জলি দিয়েছি। এখন মনে হয়, স্বামীকে আর ছেলেমেয়েদের সেবা করাই আমার একমাত্র কর্তব্য। তুমি তো তরোয়াল চালিয়ে আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছ, ইচ্ছে থাকলেও তোমার কাছে তাই আর যেতে পারি না। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্বন্ধ

এখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। তাই যতদিন বাঁচি তাদেরই সেবা করব, তাদেরই জীবনকে মধুময় করে তুলব। তাদেরই অনুরোধে তাই পেটকাটা ব্লাউজ পরি, তাদেরই অনুরোধে জুতা পায়ে দিই, সিনেমায় হোটেলে যাই, তারাই নানারকম ফ্যাশানে আমাকে সাজিয়ে তৃপ্তি পায়। তাদের সে তৃপ্তিতে আমি বাধা দিতে চাই না, বাধা দিতে পারি না। ওরাই এখন আমার ধর্মকর্ম, ঈশ্বর ভগবান—সব। নীলা চিরকালই ভীতু, রাতে আমাদের বাড়ির বড় দালান পেরিয়ে একা যেতে ভয় করত তার, তাকে তার শোবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসতে হত আমাকে! সে ওই বিদেশ বিভুঁই থেকে ডাক দিয়েছে, মাগো তুমি এস। আমি কি না গিয়ে পারি? প্রবাল একটা মেসে গিয়ে থাকবে ঠিক করেছে। মেসটি ভালো। আমি দেখে এসেছি। আমাদের পুরানো ঠাকুর অর্জুনই সেখানে রান্না করে। প্রবাল এখন আনন্দের সপ্তম স্বর্গে চড়ে বসে আছে। সুরেশ ঠাকুরপো বললেন—তার বউকে তোমার না কি খুব ভালো লেগেছে। অরুণা—প্রবালেরই বউ। সুরেশ ঠাকুরপো ওকে নার্স সাজিয়ে নিয়ে গেছে তোমার কাছে। অনেকদিন আগে ও নার্সের কাজ করেও ছিল অবশ্য কিছুদিন। এখন করে না। ও যে তোমাকে খুশী করতে পেরেছে এতে আমিও খুব সুখী। বউ সত্যিই ভালো হয়েছে আমাদের।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জেনো। কবে ফিরব—ফিরব কি না—তা মা মঙ্গলচণ্ডীই জানেন। সাবধানে থেকো। এখনও কি বেশী লঙ্কা খাও? খেও না, লক্ষ্মীটি।

প্রণতা

দময়ন্তী

পত্রটি পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন গোপালদেব। তাঁহার রগের শিরাগুলি দপদপ করিতে লাগিল।

"মহান—"

মহান আসিয়া দাঁড়াইতেই বলিলেন—"ওই নার্সটিকে ডেকে দাও তো—"

একটু পরেই অরুণা আসিয়া দাঁড়াইল।

"তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ কেন।"

অরুণার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে আনতনয়নে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গোপালদেব বলিতে লাগিলেন—"তুমি প্রবালের বউ এ কথা তো প্রকাশ করনি একদিনও।"

"ডাক্তার কাকা মানা করেছিলেন, তাছাড়া নিজের মুখে ও কথা বলব কেমন করে!"

গোপালদেব নির্নিমেষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত, তাঁহার অধর স্ফুরিত হইতে লাগিল, নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল। গাঢ়কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"তোমাকে যদি পুত্রবধূরূপে স্বীকার করতে পারতাম তাহলে খুব সুখী হতাম। তুমি সত্যিই খুব ভালো মেয়ে। কিন্তু স্বীকার করতে পারব না। আমার অতীত বংশগৌরব তোমার আমার মধ্যে বিরাট প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ভূশায়ী করে তোমার কাছে আমি যেতে পারব না। আমরা সেকেলে লোক। প্রাচীন মত প্রাচীন পথ আমরা ত্যাগ করতে পারি না। ত্যাগ করবার ইচ্ছাও নেই। তুমি

ভালো মেয়ে, কিন্তু প্রবালের মা, আমার মা, আমার ঠাকুমা, আমার প্রপিতামহী যে আসনে বসেছিলেন, সে আসনে তোমাকে আমি বসাতে পারব না। সে আসনে অন্য জাতের মেয়েকে বসাবার অধিকার আমার নেই। আশীর্বাদ করছি, তুমি সুখী হও।"

অরুণা ক্ষণকাল নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর চলিয়া গেল।

"মহান—"

মহান আসিয়া দাঁড়াইল।

"ঘোড়াটাকে নিয়ে এস। এখুনি চড়ব—"

"কোথায় যাবে এখন—"

"তুমি নিয়ে এস না, আমার যেখানে খুশী যাব—"

"ও ঘোড়া আমি আনতে পারব না। ও তো পাহাড় একটা। সহিসটহিস বাহাল কর আগে, দু'দিন থাকুক এখানে, একটু পোষ মানুক।"

"না, আমি এখনি চড়ব—"

গোপালদেব উঠিয়া পড়িলেন। সম্মুখের দেওয়ালেই তরবারিটি টাঙানো ছিল, সেটি কোষমুক্ত করিয়া তিনি দৃঢ়মুষ্টিতে সেটি ধরিয়া রহিলেন চক্ষুর সম্মুখে। দময়ন্তীর চিঠিটা পড়িয়া তাঁহার অন্তর্লোকে ভূমিকম্পের মতো একটা বিপর্যয় হইয়া গিয়াছিল। তিনি যে বিংশ শতাব্দীর লোক একথা সহসা যেন তিনি ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল তিনি সেই অষ্টম শতাব্দীর গোপালদেব, তাঁহাকে ঘিরিয়া বিশ্বাসঘাতকদের একটা ষড়যন্ত্র চলিয়াছে, তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুরাই প্রতারক হইয়াছে, কিন্তু তিনি গোপালদেব, তাঁহাকে অত সহজে বিধ্বস্ত করা যাইবে না, তিনি তাঁহার সমস্ত সত্তা দিয়া ইহার প্রতিরোধ করিবেন। যে প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর আমাদের দেশের সত্য-শিব-সুন্দর প্রতিষ্ঠিত, যে সামাজিক বনিয়াদের উপর আমাদের গৌরব-মান-মর্যাদা অধিষ্ঠিত, তাহাদের যেমন করিয়া হোক রক্ষা করিব। পরিবর্তন যদি স্বাভাবিক সভ্য পথে আসে তাহা মানিয়া লইতে আপত্তি নাই, কিন্তু কাম, লোভ ও অসংযমের ন্যক্কারজনক যে ঔদ্ধত্য সমাজকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিতেছে, যথেচ্ছাচারের অসংযত লীলাকেই পরিবর্তন বলিয়া যাহারা আস্ফালন করিতেছে, তাহাদের তিনি মানিবেন না, কিছুতেই মানিবেন না। প্রয়োজন হইলে অসি-হস্তেই আবার তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। মাৎস্যন্যায়কে গোপালদেব অসি-শক্তিতেই দেশ হইতে বিদূরিত করিয়াছিলেন—যদিও ইতিহাসে সেকথা স্পষ্টভাবে লেখা নাই। ইতিহাসে—বিশেষত প্রাচীন ইতিহাসে কয়টা সত্য কথাই স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে? দেদ্দা ; দেদ্দা যে তাঁহার স্বজাতীয়া ছিলেন না এমন কথা তো কোথাও লেখা নাই।... গোপালদেবের সমস্ত মুখ ভ্রূকুটিকুটিল হইয়া গেল। তাঁহার মনে হইল বাংলোর আশেপাশেই বুঝি শত্রুরা হানা দিয়াছে। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। অসিহস্তে একাই তিনি হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

"কি কান্ড করছ তুমি—"

মহান একবার প্রতিবাদ করিল। কিন্তু গোপালদেব তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। বাংলোর বাহিরে মাঠের উপরই ঘোড়াটা দাঁড়াইয়াছিল। তখনও তাহার পিঠ হইতে জিন নামানো হয় নাই। মুখে লাগাম লাগানই ছিল, একটা খুঁটিতে সেটা আটকানো ছিল কেবল। গোপালদেব এককালে সত্যই ভালো ঘোড়সওয়ার ছিলেন।

সোজা গিয়া ঘোড়াটার পিঠে চাপড় দিলেন বার দুই, তাহার পর লাগামটা খুঁটা হইতে তুলিয়া এক লম্ফে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বাম হস্তে লাগামটা বাগাইয়া ধরিলেন—দক্ষিণ হস্তে উৎক্ষিপ্ত উন্মুক্ত তরবারি ঝকমক করিয়া উঠিল। তীরবেগে অশ্ব বাহির হইয়া গেল। শহরের রাস্তা পার হইয়া অবশেষে প্রান্তরে গিয়া পড়িলেন গোপালদেব। দিগন্তবিস্তৃত বিরাট প্রান্তর। তাঁহার মনে হইল, ওই প্রান্তরের অপর পারে শত্রু সেনারা সমবেত হইয়া আছে। বীরবিক্রমে তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। গোপালদেব আরও বেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। আরবী অশ্ব বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটিতে লাগিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দুর্ঘটনা ঘটিল একটা। মাঠের মাঝে বিরাট একটা গহ্বর ছিল, সে গহ্বরের ভিতর হইতে অনেক কুশ, গুল্ম, আগাছা গজাইয়াছিল বলিয়া সেটাকে সমতল মনে হইতেছিল। গোপালদেব অশ্ব সহিত সেই গহ্বরের ভিতর পড়িয়া গেলেন। ঘোড়াটার কোমর ভাঙিয়া গেল, সে ছটফট করিতে লাগিল, গোপাল-দেবও গুরুতর আঘাত পাইলেন, কারণ তাঁহার হাতের তরবারি তাঁহারই কণ্ঠে বিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। একটু পরে সেই নির্জন প্রান্তরে নিজের আদর্শ ও স্বপ্ন পরিবেষ্টিত হইয়া উন্মাদ প্রাচীনপন্থী মহাপুরুষ প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই পর্যন্ত পড়িয়া কার্তিক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল খানিকক্ষণ। গোপালদেবের জন্য দুঃখ হইতে লাগিল তাহার। পাতা উল্টাইয়া দেখিল গ্রন্থকার ফকিরচাঁদ আরও খানিকটা লিখিয়াছেন।

"গল্পটা এইভাবে এইখানেই শেষ করিয়া দিলাম। এভাবে শেষ করিবার ইচ্ছা ছিল না। মালিনীর প্রেমে আত্মহারা হইয়া আমি যাহা হইয়াছি তাহারই আলেখ্য গোপাল-দেবের চরিত্রে প্রতিফলিত করিব ভাবিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল অরুণা ও প্রবালের প্রেমকে, মগনলাল ও নীলার বিবাহকে তিনি ক্ষমার চক্ষে দেখিয়া আবার তাহাদের সহিত মিলিত হইবেন এবং বাকী জীবনটা প্রেমই যে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি এই উপলব্ধির মহিমা প্রচার করিবেন। কিন্তু তাহা পারিলাম না। গতরাত্রে সেই প্রিয়গুরু কালিকাশ্যাম বন্ধ—আমার গুরুদেব—স্বপ্নে আবার আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। দেখিলাম তাঁহার চক্ষু হইতে রোষ-বহ্নি বিচ্ছুরিত হইতেছে। বলিলেন—'তুমি যে গোপালদেবের তপস্যা করিতেছিলে তিনি শক্ত সমর্থ অবিচল বীরপুরুষ। তাঁহার মত ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত তাহা নির্ণয় করা তোমার কাজ নহে। তুমি যে ছবি আঁকিতে বসিয়াছ সে ছবিটি যাহাতে নিখুঁত হয় শিল্পী হিসাবে তাহাই তোমার একমাত্র বিবেচ্য। তাহাকে সহজিয়া পন্থী, কামুক, বা প্রেম-ঢুলু-ঢুলু প্রণয়বিলাসী করিলে তোমার কাব্যে ছন্দপতন ঘটিবে। গোপালদেব শক্তিশালী পুরুষ বলিয়াই তাহার তপস্যা তুমি শুরু করিয়াছিলে, এখন যদি অন্য রকম ভাবে তাঁহার মূর্তি কল্পনা কর তোমার তপস্যা দ্বিমুখী দ্বিধাগ্রস্ত হইবে। শক্তিমানের তপস্যা করিতেছিলে বলিয়াই তোমার দেহে মনে ভাষায় দৃষ্টিতে শক্তির দ্যোতনা পরিস্ফুট হইয়াছিল। এই জন্যই মালিনী তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু একথা মনে রাখিও, মালিনী কুহকিনী। সে তোমার তপস্যা ভঙ্গ করিতে আসিয়াছে। কুহকিনীর কুহকে না ভুলিয়া তুমি শক্ত সমর্থ প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন গোপালদেবের তপস্যা কর। পর্বতের চিত্র পর্বতের মতো করিয়া আঁক, তাহার কানে দুল পরাইতে যাইও না। সেটা অশোভন হইবে।

তোমার তপস্যা নষ্ট হইয়া যাইবে। আমি একাগ্র হইয়া বুধের তপস্যা করিয়াছিলাম বলিয়াই বুধ হইতে পারিয়াছি, বুধের কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি যদি বৃহস্পতি বা শুক্রের সৌন্দর্যে অভিভূত হইতাম তাহা হইলে আর বুধ হইতে পারিতাম না। একাগ্র হও, সাধনাকে একমুখী কর—।' এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। আমার ঘুমটাও ভাঙিয়া গেল। গোপালদেবকে শক্ত সমর্থ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষরূপেই আঁকিলাম।

বইটা শেষ করিবার পর রণধীরের চাকর ঝমকু আর একটা খবর আমাকে চুপি চুপি দিয়া গেল। রণধীরের জ্যাঠা রাজপুতানা হইতে আজ আসিয়াছেন। লোকটি ভীষণ-দর্শন এবং অত্যন্ত সেকেলে। আজ এক নজর তাঁহাকে দেখিয়াছি। প্রকাণ্ড জুলপি, প্রকাণ্ড ঊর্ধ্বমুখী গোঁফ, প্রকাণ্ড নাক, প্রকাণ্ড পাগড়ী। কিংখাবের কোট প্যাণ্টলুন পরা, যাত্রাদলের রাজার মতো। আমার সহিত মালিনীর প্রণয়-লীলার কথা কে নাকি তাঁহার কানে তুলিয়া দিয়াছে। তিনি কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া অবশেষে না কি হিন্দীতে বলিয়াছেন—শালা কুত্তাকো পিটতে পিটতে রাস্তে মে নিকাল দেও। উসকা সামান ভি রাস্তে মে ফেক দো। (শালা কুকুরকে মারতে মারতে রাস্তায় বের করে দাও। ওর জিনিসপত্রও রাস্তায় ফেলে দাও)। মালিনী একথা শুনিয়া নাকি খিলখিল করিয়া হাসিয়াছে। জ্যাঠামশাই বিষয়ের মালিক। তাই ভয়ে ভয়ে আছি, কি জানি কি হয়। মালিনী খিলখিল করিয়া হাসিয়াছে? কথাটা কিন্তু বিশ্বাস হয় না। আর একটা কথাও এখানে লিখিয়া রাখি—আমি খুব ভালো ঘোড়-সওয়ার হইয়াছি। মালিনীদের ঘোড়াটার সহিত আমার খুব ভাবও হইয়াছে। যদি বেগতিক দেখি ঘোড়ায় চড়িয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিব। প্রচার করিব সেই গোপালদেবকে, যিনি আমার মতে প্রেমময়, যিনি প্রেমের বলেই সে যুগে গণতন্ত্র স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। আমার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি এইখানেই শেষ হইল। যদিও শেষে দুই একটা অবান্তর ব্যক্তিগত কথা লিখিয়া ফেলিলাম।"

উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা শেষ করিয়া কার্তিক অসহায় বোধ করিতে লাগিল। যে অবলম্বনটিকে আশ্রয় করিয়া তাহার মন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিল, আশা-আশঙ্কার অলীক দোলায় দুলিতেছিল তাহা সহসা ফুরাইয়া গেল। মন অবলম্বনহীন হইয়া নূতন স্বপ্নের উপাদান সংগ্রহে ব্যস্ত হইল। চপলাদিকে ঘিরিয়া তাহার মনে যে স্বপ্ন রঙীন হইয়া উঠিয়াছিল তাহা আর মনোরম নাই, তাহা বীভৎস বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। যে কোনও প্রতারণাকে সে চিরকাল মনে মনে ঘৃণা করিয়াছে। এণ্ড জাস্টিফাইজ দি মীনস্ (End justifies the meaus)—এ নীতিতে সে কোনকালেই বিশ্বাস করে নাই। সহজ সরল নীতির পথে চলিয়া সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতে চায় সে। মনে পড়িল কলেজ জীবনে এই জন্যই তাহার এক পরম বন্ধুর সহিত ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছিল। সে গোপনে ডাকাতি ও নরহত্যা করিয়া টাকা যোগাড় করিয়াছিল, সে টাকায় বোমা পিস্তল কিনিয়া স্বদেশ উদ্ধার করিবে বলিয়া। স্বদেশের জন্য ইংরেজের সহিত সম্মুখ-সমরে প্রাণ দিতে কার্তিকের আপত্তি ছিল না, কিন্তু নিরীহ স্বদেশবাসীর ধনসম্পত্তি লুঠ করিয়া—নির্দোষ লোককে হত্যা করিয়া বোমা পিস্তল সংগ্রহ ব্যাপারে তাহার মন সায় দেয় নাই। তাছাড়া ওই পদ্মকলির সঙ্গে

চপলাদির সম্পর্কটাও যেন কেমন কেমন। হয়তো তাহারা পরস্পরকে ভালোবাসে, ভালোবাসা খারাপ জিনিস নয়, কিন্তু সমাজে বাস করিতে গেলে ভালোবাসাকে সমাজের বন্ধনে বাঁধিতে হইবে, না বাঁধিলে সে একদিন সর্বনাশ আনিবেই। নদীর ঘাট যেখানে মজবুত শানবাঁধানো নাই সেখানে নদী যে কোনও মুহূর্তে প্রলয়ংকরী হইয়া উঠিতে পারে। তা-ও না হয় সে সহ্য করিত, কিন্তু নোট জাল করিয়া পরোপকার সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিবে না। কিছুতেই পারিবে না। কিন্তু··· এখানেই তাহার চিন্তাধারা যেন একটা বিরাট গহ্বরের সম্মুখে আসিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। তাহার পর কি করিবে সে। থলি হাতে করিয়া আবার পথে বাহির হইয়া পড়িবে? দ্বারে দ্বারে আপিসে আপিসে কড়া নাড়িয়া বেড়াইবে—চাকরি দাও, আমাকে বাঁচাও? হঠাৎ মনে হইল বাঙালীদের সহিত 'জু'-দের (Jew) অনেক মিল আছে। কত শতাব্দী ধরিয়া তাহারা দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, কত দেশে কত নির্যাতন সহ্য করিয়াছে। এই কিছুদিন আগে হিটলার তো তাহাদের নিঃশেষ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। 'জু'-বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত অস্ত্রই হিটলারকে বিধ্বস্ত করিয়া দিল। জার্মানীর যাহা কিছু গৌরবজনক তাহার অধিকাংশই প্রতিভাবান 'জু' মনীষীদের কীর্তি—সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, বিজ্ঞানে সর্বত্রই তাহাদের জ্যোতির্ময় দীপ্তি। হিংসার বশে হিটলার (নিজেকে তিনি খাঁটি আর্য বলিয়া জাহির করিতেন!) তাহাদের বর্বরের মতো পিষিয়া মারিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। হিটলার আজ নাই—কিন্তু 'জু'-প্রতিভাবানেরা আজও অম্লান। সহসা তাহার মনে হইল—প্রতিভাবানেরা প্রতিভার জোরে চিরকাল অম্লান থাকে। কিন্তু সাধারণ 'জু'-দের জীবন-সমস্যার সমাধান হইয়াছে কি? আর্নলড্ ওয়েসকারের (Arnold Wesker) লেখা তিনখানা নাটকের কথা সহসা মনে পড়িল। নিম্নমধ্যবিত্ত গরীব শ্রমিক 'জু'দের কি অপরূপ চিত্রই না আঁকিয়াছেন তিনি। চিত্র চমৎকার হইয়াছে, কিন্তু সমস্যার সমাধান নাই। আমাদের অবস্থাও তাই। উত্তর ভারতের তথাকথিত আর্যগণ চিরকাল বাংলা দেশকে দাবাইয়া রাখিতে চাহিয়াছেন, এখনও চাহিতেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালীর কৃতিত্বটা যথাসম্ভব চাপা দিয়া মিথ্যা ইতিহাস শেখাইতেছেন—ইতিহাসের সত্যকে জুয়াচুরির কুয়াসা দিয়া আবৃত করিতেছেন—কিন্তু কুয়াসা বেশী দিন টিকিবে না। সহসা তাহার কৃষ্ণধনবাবুর পরিবারের কথা মনে পড়িল—মনে পড়িল তাহার সন্দেহ-সংশয়-কণ্টকিত শজারুর মতো ব্যবহার—মনে পড়িল তাঁহার স্ত্রী ভোমরাকে, তাহার কৌতুকোজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি, তাহার সলজ্জ হাসি, তাহার নিখুঁত ভদ্রতা, তাহার চমৎকার রান্না, মনে পড়িল আসন্ন যৌবনা মালতীকে, মনে পড়িল তাহার উন্মুখ যৌবনের স্বাভাবিক যৌন-প্রবণতা, মনে পড়িল তাহার ছোট বোন চাপাস্বভাব লোভী আরতিকে, মনে পড়িল পড়ায়-অন্যমনস্ক খেলুড়ে পদুকে—কয়দিনের বা আলাপ—তবু তাহারা কেমন আপন হইয়া গিয়াছিল—সে যদি চপলাদিকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, যাইতেই হইবে, তাহা হইলে আর কি উহাদের সহিত দেখা হইবে জীবনে—সে যেমন উহাদের আপন করিয়া লইয়াছিল তাহার পরবর্তী ম্যানেজার কি তাহাদের তেমনভাবে আপন করিয়া লইতে পারিবে—জীবনটা কি বিচিত্র—অদৃশ্য একটা স্রোতে নানাঘাটে ভাসিয়া বেড়ানো। হঠাৎ দেখিতে পাইল লর্ড মাটি খুঁড়িতেছে একটা ঝোপের ধারে। বোধহয় ছুঁচা বা [illegible]সন্ধান

পাইয়াছে। জমিটা কার, ও জমি খুঁড়িবার অধিকার তাহার আছে কি না, নিরীহ ছুঁচা বা ইঁদুরকে হত্যা করা উচিত কি না—এ সব নীতির ঝামেলায় তাহার জীবন জড়িত-বিজড়িত নয়—কে মুখ্যমন্ত্রী হইল, র‍্যাশানের বরাদ্দ কমিল না বাড়িল, পাকিস্তান বা চীনের সহিত আমাদের কূটনৈতিক সম্বন্ধ কিরূপ হইলে দুশ্চিন্তা থাকিবে না—এসব লইয়া লর্ড মাথা ঘামায় না—চাকুরির জন্যও সে লালায়িত নয়, কোনও মনিব যদি না জোটে, পথ আছে। লর্ড সুখী, অথচ আমরা তাহাকে পশু বলি—অথচ আমরা নিজেরা কি পশুত্বের উর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছি ? আর একটা দৃশ্যও তাহার চোখে পড়িল—একটা গাছে একটা লতা জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিয়া অজস্র ফুল ফুটাইয়াছে—রৌদ্রকিরণে আত্মহারা হইয়া জীবনটাকে উপভোগ করিতেছে। আমরা নিজেদের ঢাক নিজেরা পিটাইয়া সর্বত্র জাহির করিয়া বেড়াইতেছি যে আমরাই সংসারের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব—অথচ অশান্তির দাবানলে মানব সমাজ বারবার পুড়িয়া যাইতেছে, হানাহানির রক্তস্রোতে সভ্যতা ভাসিয়া যাইতেছে—ইহাই আমাদের ইতিহাস। কার্তিক মুগ্ধনেত্রে ফুলগুলির দিকে চাহিয়া রহিল।

চপলা কথাটা শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল।

"কি বললে! দরকার হলে আমাকে তুমি মুছে ফেলতে পার ? এত নিষ্ঠুর তুমি হতে পার পদ্মকলি, সত্যি পার ?"

"পারি। শিল্পীরা নিষ্ঠুরই হয়। সে নিজের শিল্প ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসে না। ভগবান নিজের শিল্পকেও ভালোবাসেন না, তাই তিনি মহাশিল্পী। অহরহ কত সুন্দর সুন্দর জিনিস তিনি গড়ছেন আবার ভাঙছেন। কোন কিছুর উপরই তাঁর মায়া নেই !"

চপলার মুখে হাসি ফুটিল, গালে টোল পড়িল।

"কিন্তু আমি তো তোমার আঁকা ছবি নই। আমিও ভগবানের সৃষ্টি—"

"ওইখানেই ভুল করছ তুমি। ভগবান চপলা নামে যে মেয়েটিকে সৃষ্টি করেছিলেন সে আর পাঁচটা মেয়ের মতো, কিন্তু শিল্পী পদ্মকলি যাকে সৃষ্টি করেছে সে আলো সে অনন্য। তাকে আমিই সৃষ্টি করেছি এ ছবি পৃথিবীর কোন আর্ট-গ্যালারিতে নেই আছে আমার মনে। আমি সেই ছবিটার কথাই বলছিলাম। রক্তমাংসের তৈরি তোমার ওই দেহটার কথা আমি বলিনি। তোমার ওই রক্তমাংসের তৈরি দেহটাকে অবলম্বন করে যে আলো আমি জেলেছি সেইটেই আমার ছবি। সেটা যতক্ষণ আমার ভালো লাগবে ততক্ষণ আমি সেটাকে জ্বালিয়ে রাখব, ভালো না লাগলেই নিবিয়ে দেব এক ফুঁয়ে। তুমি বারবার আমাকে বলছ, তোমার দুঃখ তুমি আমাকে নষ্ট করছ। কিন্তু আমাকে নষ্ট করবার ক্ষমতা তোমার নেই আলো। আমি শিল্পী। আমি যা করছি নিজের খুশীতে নিজের খেয়ালে করছি। আমার জাল-করা নোট দিয়ে তুমি অনেক লোকের উপকার করছ, এটা আমার কাছে বড় কথা নয়, আমার কাছে সবচেয়ে বড় কথা, ওই নোটগুলো পেয়ে তুমি উৎফুল্ল, তুমি আনন্দিত হ'য়ে ওঠ—সেই তুমি যাকে আমি সৃষ্টি করেছি, সে চপলা নয়, সে আলো। সেবার তুমি বলেছিলে, তোমার মেলার তাঁবুতে তাঁবুতে যে সব খদ্দেররা জাল নোটের বদলে আসল নোট দিয়ে যায় তারা তোমার পুরো দাম দেয় না। হাজার টাকার নোট কোথাও পাঁচশ টাকাতে

বিক্রি করতে হয়েছে তোমাকে। প্রতিবার তোমাকে এক লাখ টাকা দিয়ে যাই—এবার দু'লাখ টাকা এনেছি—এতে আশা করি তোমার কুলিয়ে যাবে। দাঁড়াও তোমাকে দিয়ে দি—"

পদ্মকলি ঝুঁকিয়া খাটের নীচে হইতে একটা ছোট স্যুটকেশ বাহির করিল। স্যুটকেশের ভিতর হইতে বাহির করিল ছেঁড়া-গেঞ্জিতে জড়ানো নোটের তাড়াটা।

"এতে দু'শোটা নোট আছে। প্রত্যেকটি হাজার টাকার। যদি প্রত্যেক নোটটা পাঁচশ টাকাতেও বিক্রি কর তাহলেও তোমার 'নেট্' এক লাখ টাকা থাকবে। এই নাও—"

অবহেলাভরে সে পুলিন্দাটা বিছানার উপর ছুঁড়িয়া দিল।

"খুশী তো? কই এবার তোমার চোখে সেই দীপ্তি তো ঝলমল করে উঠল না যা দেখবার জন্যে আমি জাল-জয়োচুরির আশ্রয় নিয়েছি—"

সত্যই চপলার মুখটা ম্লান হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ তাহার চোখের কোণে এক ঝলক রোষ-বহ্নি চকমক করিয়া উঠিল।

"তোমার আলোর জন্যে তুমি যা এনেছ তাতে আমার আনন্দিত হবার কি আছে। তোমার আলো তো তোমার মনের ভিতর আছে তাকেই একথা জিগ্যেস কর। আমার এই রক্তমাংসের দেহটা তো তোমার কাছে কিছুই নয়।"

পদ্মকলি হাসিমুখে উত্তর দিল—"সত্যিই কিছু নয়। ওটা বরং বাধা। মল মূত্র ব্রণক্ষত কৃমিকীটদের লীলাভূমি ওই দেহটা খুব একটা লোভনীয় জিনিস নয়। তোমাদের দেহের মধ্যে যা লোভনীয় তার সম্বন্ধেও শঙ্করাচার্য সাবধান করে দিয়ে গেছেন—নারীস্তন ভরনাভিনিবেশং, মিথ্যা-মায়ামোহাবেশং। এতন্মাংসবসাদিবিকারং মনসি বিচারয় বারংবারম্!"

"শঙ্করাচার্য সন্ন্যাসী ছিলেন—তুমিও কি সন্ন্যাসী?"

"বড় শিল্পী, বড় বিজ্ঞানী, বড় সন্ন্যাসী সব একজাতের লোক। তাঁরা নানা পথ দিয়ে সত্য সন্ধান করেন। আমার পথ সৌন্দর্যের পথ, শিল্পের পথ—আমি হয়তো খুব বড় শিল্পী নই, কিন্তু পথ নিয়েই আমি মেতে থাকতে চাই না, পথ অতিক্রম করে আমি সেই মন্দিরে পৌঁছতে চাই যেখানে আলো জ্বলছে। তোমার দেহ নিয়ে একবার যদি উন্মত্ত হয়ে পড়ি তাহলেই সর্বনাশ হ'য়ে যাবে।…"

"কিন্তু পদ্মকলি তুমি আমাকে এত দিচ্ছ, আমি তোমাকে কি দেব বল, দেহ ছাড়া তো আমার আর কিছু নেই—"

"তোমার দেহকেই তো গ্রহণ করেছি আমি, কিন্তু স্থূলভাবে নয়, তোমারই সূক্ষ্ম সুষমা দিয়ে তো আমি জেলেছি আলো—"

"আচ্ছা, একটা কথা সত্যি করে বল আমায় পদ্মকলি। আমি নানা জায়গায় বাইজী সেজে গান গাইতে যাই, তোমার কোনও সন্দেহ হয় না তো, একদিন তুমি বলেছিলে যে, আমি যদি রূপজীবাও হতাম তাহলেও তুমি আসতে আমার কাছে। কিন্তু বিশ্বাস কর পদ্মকলি আমি অপাপবিদ্ধা, আমি কুমারী এখনও—আমি—"

সহসা চপলা মাটিতে বসিয়া পড়িল এবং পদ্মকলির দুই পা ধরিয়া বলিতে লাগিল, "বিশ্বাস কর আমি সতী, বিশ্বাস কর আমি দেহ-বিক্রী করি না। আমাকে নাও তুমি, যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছি—"

পদ্মকলি আস্তে আস্তে তাহাকে ধরিয়া তুলিল।

"আলো, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি! ছিঃ, অমন কোরো না।"

চপলার চোখে আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

"তুমি নিশ্চয় আর কাউকে ভালোবাস। দেখি তোমার ওই স্যুটকেসে কি আছে।"

পাগলিনীর মতো সে পদ্মকলির স্যুটকেসটা হাঁটকাইতে লাগিল। স্যুটকেসে আরও কয়েক হাজার টাকা ছিল আর ছিল একটা 'পাসপোর্ট'!

"এটা কি—"

"আমি কাল প্যারিস যাচ্ছি। সেখানকার বিশ্ববিখ্যাত আর্ট-গ্যালারিটা দেখে তারপর যাব রোমে—"

"তুমি চলে যাবে! আমি যে ভেবেছিলাম তোমাকে নিয়ে আর একটা সেণ্টার খুলব—"

"দেখ আলো, ওসবে আমার তেমন উৎসাহ নেই। আমি জানি কোনও কিছু করেই শেষ পর্যন্ত কিছু হবে না। মানুষ চিরকালই এমনি আছে, চিরকালই এমনি থাকবে। আগে কলেরায় মরত, এখন গুলিতে কিম্বা অ্যাটম-বমে মরবে। আগে চণ্ডীমণ্ডপে গুলতানি করত, এখন কাগজে, লোকসভায় গুলতানি করে। মন্বন্তর আগেও হয়েছে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, পঞ্চাশের মন্বন্তর, এখন কনট্রোলের মন্বন্তর চলছে। আবার নতুন রকম কিছু হবে ভবিষ্যতে। মানুষ বদলাবে না, ওকে বদলানো যাবে না। মানুষের একমাত্র মুক্তির ক্ষেত্র শিল্পে, যেখানে সে সৃষ্টিকর্তা, যেখানে সে স্বাধীন, যেখানে সে—"

তাহাকে থামাইয়া দিয়া চপলা বলিল—"মানুষের দুঃখের দিনে তুমি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? তুমি কি মানুষের সমাজে বাস কর না?"

"মানুষের সমাজে বাস করি বাধ্য হ'য়ে। মানুষের সমাজে জন্ম গ্রহণ করবার আগে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি তুমি এই সমাজে জন্মাতে চাও কি না। ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে কেউ যেন আমাকে এই হুল্লোড়ের গোলক-ধাঁধায় ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই গোলকধাঁধায় ক্রমাগত ধাক্কাধাক্কি করে চলেছি জন্মে থেকে। তবে যিনিই আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে থাকুন, একটা বিষয়ের জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ আছি—তিনি আমাকে বেনে করেন নি, দেশহিতৈষী করেন নি, গুণ্ডা করেন নি, সৈনিক করেন নি, শিল্পী ক'রে পাঠিয়েছেন—শিল্পের ক্ষেত্রে আমি স্বাধীন। কোনও বিশেষ একটা খুঁটিতে বেঁধে রাখতেন যদি আমাকে, আর সেই বাঁধা খুঁটিতেই যদি ঘুরতে হ'ত আমাকে সারাজীবন, তাহলে বোধহয় আমি পাগল হ'য়ে যেতাম। আর একটা বিষয়েরও জন্য কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। আমাকে তিনি ধনীর সন্তান করে পাঠিয়েছেন, কারও কাছে হাত পাততে হয় না আমাকে। স্যুটকেসে যে বাকি টাকাগুলো আছে ওগুলো জাল নয়—"

এমন সময় বাহিরে একটা রিকশার টুনটুন শুনিয়া পদ্মকলি বাহিরের বারান্দায় বাহির হইয়া গেল এবং হাত তুলিয়া থামাইল রিকশাটাকে।

"আমি এই রিকশাতেই চলে যাই আলো। কাল আমার প্লেন ছাড়বে। মাস দুই পরে ফিরব।"

স্যুটকেসটা বন্ধ করিয়া নির্বিকারভাবে সে রিকশায় গিয়া উঠিয়া বসিল।

"তোমার টাকাও নিয়ে যাও। চাই না এ টাকা—"

নোটের পুলিন্দাটা বাহিরে ছুঁড়িয়া দিয়া চপলা কপাট বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল খানিকক্ষণ। ক্রন্দনাবেগে তাহার সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

"মা—মা।"

কৃষ্ণধনবাবুর কণ্ঠস্বর।

চপলা উঠিয়া বসিয়া সম্বৃত করিয়া লইল নিজেকে। তাহার পর কপাট খুলিল। খুলিয়া প্রথমেই দেখিতে পাইল ছেঁড়া-গেঞ্জিতে-মোড়া নোটের পুলিন্দাটা গেটের একধারে একটা ঝোপের মধ্যে পড়িয়া আছে। পদ্মকলি সেটি লইয়া যায় নাই।

কৃষ্ণধনবাবু আকুল কণ্ঠে বলিলেন—"মা সর্বনাশ হ'য়ে গেছে। মালতী সকালে পুকুরে জল আনতে গিয়েছিল। আর ফেরেনি। গিয়ে দেখলাম কলসীটা পুকুর পাড়ে পড়ে আছে, মালতী নেই। শুনলাম রাউতপুরের কয়েকটা গুণ্ডা নাকি ধরে নিয়ে গেছে তাকে—। বিজনবাবুর ভাইপো দুটো গুণ্ডা মুসলমান ছেলের সঙ্গে তাকে রাউতপুরের দিকে যেতে দেখেছে। কার্তিকবাবুও নেই দেখছি। আমি এখন কি করব ভেবে পাচ্ছি না—"

স্তম্ভিত হইয়া গেল চপলা।

মনে পড়িল, স্বরং এবং পদ্মকলি তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। হঠাৎ একটা দৈবী শক্তি যেন তাহার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া গেল। মনে পড়িল রবীন্দ্রনাথের 'সবলা' কবিতাটি—'আমাকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দেবে অধিকার'। মনে পড়িল 'মুক্তি' কবিতার সেই লাইন দুইটি, 'আমি নারী আমি মহীয়সী আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী'।

কৃষ্ণধনবাবুকে বলিল, "আপনি থানায় এক্ষুনি খবর দিয়ে দিন। ভয় নেই, আমি আছি। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কৃষ্ণধনবাবু চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পরই নোটের পুলিন্দাটা সে ঝোপের ভিতর হইতে কুড়াইয়া আনিল। সেটাকে নিজের ব্যাগে রাখিল না। আলমারিতে বড় ফাঁক-মুখ একটা থার্মোফ্লাস্ক ছিল। সেইটার ভিতর পুলিন্দাটা পুরিয়া রাখিল। আলমারিতে নানারকম কাচের বাসনের মধ্যেই রাখিয়া দিল 'ফ্লাস্কটা'।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল গেটের সামনে। ট্যাক্সি হইতে নামিলেন চপলার সেই মোটা-সোটা স্বর্ণ-দন্ত প্রণয়ীটি। ইনিও দুঃসংবাদ আনিয়াছিলেন।

"সর্বনাশ হয়ে গেছে। পুলিশ জাল নোটের খবর পেয়েছে। ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে না কি আমাদের দুজনের নামে। তাই আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এলাম। চলুন পালাই!"

"কি করে প্রকাশ পেল জাল নোটের কথা—"

"যে বোবা চাকরটাকে আপনি বহাল করেছিলেন, সে বোবা সেজে থাকত। সে পুলিশের চর। পুলিশ অনেকদিন আগে থাকতেই আপনাকে সন্দেহ করত তাই ওই লোকটাকে লাগিয়ে রেখেছিল আপনার পিছুতে—। চলুন পালাই, আর দেরি করা ঠিক হবে না—"

"আপনি যান, আমি যাব না—"

"যাবেন না ?"

"এদের ফেলে আমি যেতে পারব না। যদি মরতে হয় ওদের মধ্যেই মরব। আপনি যান—"

স্বর্ণ-দস্ত কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"ব্যাপারটা ভেবে দেখুন ভালো করে।"

"ভেবে দেখেছি। আপনি যান—"

স্বর্ণদস্তকে লইয়া ট্যাক্সি চলিয়া যাইতেই চপলা ত্বরিতপদে বারান্দার ওপারে চলিয়া গেল। দেখিল কোথাও কেহ নাই। বারান্দার কোণে শাবলটা রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি শাবলটা লইয়া বাড়ির পিছন দিকে চলিয়া গেল সে। সেখানটা ঘেঁটুর জঙ্গল, তাহারই মধ্যে একটা গর্ত খুঁড়িতে লাগিল সে। বেশ গভীর গর্ত খুঁড়িল একটা। তাহার পর সেই ফ্লাস্কটা আনিয়া পুঁতিয়া ফেলিল। মাটি ঢাকা দিয়া কিছু আবর্জনাও ছড়াইয়া দিল সেখানে। কয়েকটা ঘেঁটু ফুলের চারাও পুঁতিয়া দিল তাহার উপর। তাহার পর বাথরুমে ঢুকিয়া পড়িল। কাপড়চোপড়ে মাটি লাগিয়া নোংরা হইয়া গিয়াছিল। বাথরুম হইতে একটি টকটকে লাল শাড়ি পরিয়া বাহির হইল সে। মনে হইতে লাগিল সে যেন মানবী নয়—মূর্তিমান অগ্নিশিখা। তাহার পর আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুলটা ঠিক করিয়া আলমারি হইতে ছোরাটা বাহির করিয়া কোমরে গুঁজিয়া লইল। একটা ছোট রিভলবারও বাহির করিল, তাহাতে গুলি পুরিল এবং সেটিও কোমরে গুঁজিয়া লইল। তাহার পর মাথার বেণীতে বাঁধিল সাঁচ্চা জরির প্রকাণ্ড ফুল একটা। তাহার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটিল। চোখের দৃষ্টিতে যাহা ঝলমল করিতে লাগিল তাহা অনির্বচনীয়। বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া রিকশার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল তাহার পর। রিকশা পাইতে বেশী দেরি হইল না। তাড়াতাড়ি রিকশায় উঠিয়া বলিল—'চল রাউতপুর'। রিকশা চলিতে আরম্ভ করিলে নিজের ব্যাগটা খুলিয়া গণিতে লাগিল কত টাকা আছে। দেখিল দশখানা হাজার টাকার নোট ছাড়া আরও কয়েক শত টাকা আছে। খুচরাও আছে কিছু।

"জোরে চল।"

"দু টাকা ভাড়া নেব মাইজি।"

"তোকে পাঁচ টাকা দেব। জোরে চল—"

কার্তিক পুকুরের ধারে ফুলের দিকেই তন্ময় হইয়া চাহিয়াছিল। হঠাৎ লর্ড ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। পর মুহূর্তেই রাস্তার দিকে ছুটিয়া গেল সে।

"আরে হুই—হুই—হুই—তুই এখানে কি করছিস রে—"

আনটার গলা না ? কার্তিক উঠিয়া পড়িল। হ্যাঁ, আনটাই তো। একটা ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছে।

"এ কি তুমি এখানে! মাছ ধরছ না কি—"

"না। অমনি এসেছি। ঘোড়া পেলে কোথা।"

"আমি যে সার্কাসটায় চাকরি করতাম—সেটা আসানসোলে এসেছে। আমি সেখানে গিয়েছিলাম কাল মোহিনীকে দেখতে। আমার মাইনেও বাকি ছিল তিন

মাসের। মোহিনীকে দেখতে পেলাম না, শুনলাম সে হারামজাদী পালিয়েছে রিং মাস্টারের সঙ্গে। ম্যানেজার বললে, সার্কাস ভালো চলছে না, মাইনে দিতে পারবে না। অনেক খেলোয়াড় ভেগেছে। সার্কাসের জিনিস-পত্র জানোয়ার-টানোয়ার বিক্রি করে সে সার্কাস উঠিয়ে দিচ্ছে। আমি এই ঘোড়াটায় চড়লুম। বললাম—আমাকে বাকি মাইনের বদলে তাহলে এই ঘোড়াটাই দাও। প্রথমে দিতে চায় না, শেষে আরও একশ' টাকা দিয়ে নিলাম ঘোড়াটা। ভালো করি নি ?"

"ঘোড়া নিয়ে কি হবে !"

"চড়ব আমরা ! তুমি ঘোড়ায় চড়তে জান না ?"

"তা জানি। কিন্তু—"

"তোমাকে দশটা গাঁয়ে ঘুরতে হয়, সাইকেলে চড়ে ঘোরা সহজ না কি। তার চেয়ে খটখটিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাবে, ম্যানেজার সাহেবকে মানাবে। আর এ কি যে সে ঘোড়া। হেট্—হেট্—হেট্।"

হঠাৎ ঘোড়াটা পিছনের দুই পায়ে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং পিছনের দুই পায়ের উপরই ভর করিয়া আগাইয়া গেল কার্তিকের দিকে। লর্ড ঘেউ ঘেউ করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল ঘোড়াটাকে।

"সাবাস বাচ্চা সাবাস !—"

আনুটা ঘোড়ার পিঠে চাপড় মারিয়া আদর করিল।

"একশ টাকা তুমি পেলে কোথায় ?"

"দোকান থেকে শ' দুই টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, মোহিনী যদি আসতে চায় আমার সঙ্গে তাকে কিছু গয়না কাপড় কিনে দেব। কিন্তু সে তো সটকান দিয়েছে। একশ' টাকা দিয়ে ঘোড়াটাই কিনে ফেললাম। ভালো করিনি ?"

"আমাকে না জিগ্যেস করে দোকান থেকে টাকা নিয়ে তুমি অন্যায় করেছ আনুটা—"

"তুমি এবার মঞ্জুর করে দাও। সার্কাসটা কাছে এনেছে শুনে আমি আর থাকতে পারলাম না। বাই করে চলে গেলাম। তোমার কাছে আসবার সময় পেলাম কই—"

"অন্যায় করেছ—"

"আমার মাইনে বাকি নেই ? হি হি সেটি মনে রেখো। এমন লাচুনি ঘোড়া তুমি একশ' টাকায় কোথা পাবে—"

কার্তিক গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার কিছুই যেন ভালো লাগিতেছিল না।

"ওই, সঙের মতো দাঁড়িয়ে রইলে যে ! আমার পিছন দিকে চেপে পড়—"

"রেকাব নেই চড়ব কি করে—"

"এ পিঠ পেতে তোমাকে তুলে নেবে—। বৈঠ্—বৈঠ্—"

ঘোড়াটা পিছনের পা দুইটি মুড়িয়া পিঠ নীচু করিয়া দিল।

"এইবার চেপে পড়, চেপে পড়—চেপে আমাকে জাপটে ধরে থাক।"

কার্তিক অবশেষে না চড়িয়া পারিল না। ঘোড়া কদম চালে চলিতে শুরু করিল। আর তাহার পিছনে পিছনে ছুটিতে লাগিল লর্ড। দেখা গেল, তাহার একটা কান উলটাইয়া গিয়াছে। তীরবেগে ছুটিতেছে সে।

আনটো বলিল—"খেজুরিতে রমেশ সিংগীর বাড়িতে একটা পুরানো ঘোড়ার সাজ আছে। জিন লাগাম—সব। সেটা কিনতে হবে বুঝলে—আরে তুমি রা কাড়ছ না কেন।"

কার্তিক তবু কিছু বলিল না।

রাউতপুরের মাঠে গ্রামবাসীরা সমবেত হইয়াছিল। সে মাঠের ধারে প্রকাণ্ড একটা আম গাছ ছিল। আম গাছের দুইটি শাখা খুব নীচু হইয়া প্রায় সমান্তরাল রেখায় কিছুদূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল। তাহারই একটি শাখার উপর বসিয়াছিল চপলা। শ্যাম-পত্রপল্লবের পটভূমিকায় রক্তাম্বরধারিণী চপলাকে দেবীমূর্তি বলিয়া মনে হইতেছিল। বহুকাল পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সীতারাম উপন্যাসে এই ধরনের একটি মূর্তি কল্পনা করিয়াছিলেন—"মহামহীরূহের শ্যামল-পল্লবরাশিমণ্ডিতা চণ্ডীমূর্তি।" সে মূর্তি সীতারামপত্নী শ্রীর। সে মূর্তিও অসংখ্য জনতার সম্মুখবর্তিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সহসা সকলে দেখিয়াছিল "অতুলনীয়া এক রূপবতী বৃক্ষের ডাল ধরিয়া শ্যামল পত্ররাশির মধ্যে বিরাজ করিতেছে। প্রতিমার টাটের মতো, চারিদিকে বৃক্ষশাখা বৃক্ষপত্র ঘেরিয়া রহিয়াছে, চুলের উপর পাতা পড়িয়াছে, বক্ষঃস্থ কেশদাম কতক কতক মাত্র ঢাকিয়া পাতা পড়িয়াছে—"।

সেদিন সেই জনতাকে সম্বোধন করিয়া শ্রী যাহা বলিয়াছিল চপলা কিন্তু তাহা বলিল না। তাহার ভাষা অন্যরূপ। আবেদনও ভিন্ন।

চপলা বলিল—"আমি তোমাদের মা। এই দুর্দিনে তোমরা সসম্মানে যাতে খেতে পাও তার ব্যবস্থা আমি করেছি। সে ব্যবস্থা করবার জন্যে আমাকে সর্বস্ব পণ করতে হয়েছে। আমি আশা করেছিলাম তোমরা সুখে শান্তিতে ভদ্র জীবন যাপন করবে। কিন্তু আজ শুনলাম আমার প্রতিবেশী কৃষ্ণধনবাবুর মেয়ে মালতীকে নিয়ে দুটি গুণ্ডা না কি রাউতপুরে এসেছে। সে গুণ্ডা বাঙালী কি বিহারী হিন্দু কি মুসলমান তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। তারা গুণ্ডা তারা অভদ্র এই তাদের একমাত্র পরিচয়। তোমাদের সকলকে তাই আমি অনুরোধ করছি সেই গুণ্ডাদের ধরে তোমরাই শাস্তি দাও আর মালতীকে ফিরিয়ে দাও তার বাবা মায়ের কাছে।..."

জনতার মধ্য হইতে একজন বলিল—"মেয়েটি নিজে চলে এসেছে। কেউ তাকে জোর করে আনে নি। সে বিয়ে করতে চাইছে ওই ছেলেটিকে। এতে জোর জবরদস্তি কিছু নেই—"

চপলা সে দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিল—"নাবালিকা মেয়ে নিজের মতে চলতে পারে না। তার বাবা মায়ের মতেই তাকে চলতে হবে—"

"ওইখানেই আমাদের আপত্তি। ছেলেমেয়েদের উপরও তার বাবা মার অন্যায় অত্যাচার আমরা বরদাস্ত করব না। তাছাড়া বয়স হিসাবেই নাবালিকা সাবালিকা ঠিক করা সঙ্গত নয়। মালতী বয়স হিসাবে হয়তো নাবালিকা, কিন্তু তার দেহ ও মন সাবালিকার। তার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেওয়ার কোনও অধিকার নেই তার বাবার—"

"ভীড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে কে কথা বলছেন, সামনে এসে দাঁড়ান।"

কেহ সামনে আসিয়া দাঁড়াইল না। জনতার ভিতর উত্তেজনা দেখা দিল।

"মালতী সত্যিই যদি নিজের ইচ্ছায় চলে এসে থাকে, নিজের মতে বিয়ে করতে চায় তাহলে সে কথাও সে সকলের সামনে এসে বলুক—"

"যদি দরকার হয় সে কথা সে আদালতে বলবে। এখানে বলবে কেন!"

চপলা স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

তাহার পর শান্ত কণ্ঠে বলিল—"আমি আমার সর্বস্ব পণ করে এই দুর্দিনে তোমাদের খাওয়াবার ভার নিয়েছি। আমার এই সামান্য অনুরোধটুকু তোমরা মানবে না?"

জনতার ভিতর হইতে কোনও উত্তর আসিল না। উত্তেজিত কলরব উঠিল চতুর্দিকে। জনতার ভিতর হইতে একজনের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"মা আপনি শুধু একবার হুকুম দিন। আমরা মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে আসি ওদের হাত থেকে—"।

নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল চপলা।

"জয় মা অন্নপূর্ণার জয়, জয় মা অন্নপূর্ণার জয়, মা অন্নপূর্ণার জয়—"

তাহার পর হঠাৎ শোনা গেল—"আগুন লেগেছে, আগুন লেগেছে—"

চপলা দেখিল কুণ্ডলীকৃত ধূম ও লেলিহান অগ্নিশিখা আকাশ ঢাকিয়া ফেলিতেছে।

"অন্নপূর্ণা, না রাক্ষসী? দেবী না দানবী? আমাদের ঘরে ঘরে আগুন লাগাবার বন্দোবস্ত করে ভালো মানুষের মতো এখানে বক্তৃতা দিচ্ছেন—হারামজাদী, শয়তানী—"

একদল গুণ্ডা তাহার দিকে ছুটিয়া গেল।

চপলার কাছে রিভলভার ছিল, কিন্তু সে গুলি ছুড়িল না, ছোরা ছিল কিন্তু ছোরা বাহির করিল না। প্রস্তরমূর্তিবৎ সে নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল কেবল। একটা প্রকাণ্ড থান ইঁট আসিয়া তাহার কপালে লাগিল। মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল সে। আর উঠিল না।

॥ ৫ ॥

ভীষণ দাঙ্গা বাধিয়া গিয়াছে। অনেক বাড়ি পুড়িয়াছে, অনেক নারী ধর্ষিতা হইয়াছে। চপলার কো-অপারেটিভ দোকানগুলি লুঠ করিয়াছে গুণ্ডারা। পুলিশের গুলি চলিয়াছে, কারফিউ জারি হইয়াছে। তবু কিন্তু শান্তি ফিরিয়া আসে নাই। শক্তিমানেরা সুবিধা পাইলেই দুর্বলদের পীড়ন করিতেছে। অবশেষে গভর্ণমেণ্ট একটি শান্তি-সমিতি গঠন করিয়াছেন। সে সমিতির কাজ গ্রামের লোকদের একত্রিত করিয়া শান্তির বাণী শোনানো এবং হিতোপদেশ বিতরণ করা। কার্তিক এইরূপ একটি সমিতির নেতা। তাহার কাজ বন্দুকধারী পুলিশ পরিবৃত হইয়া সভায় সভায় বক্তৃতা করা। চপলা বাঁচিয়া থাকিলে হয়তো সে চপলাকে ছাড়িয়া আবার পথে বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু চপলা মরিয়া যাওয়াতে তাহা আর হইল না। চপলার অনুপস্থিতিই

যেন তাহার পায়ে একটা অদৃশ্য শৃঙ্খল পরাইয়া দিল। বার বার মনে পড়িতে লাগিল —"অষ্টম শতাব্দীতে মাৎস্যন্যায়ের যুগে গোপালদেব যা করেছিলেন এ যুগে তোমাকেও তাই করতে হবে। কারণ এ যুগটাও মাৎস্যন্যায়ের যুগ। এ যুগের গণতন্ত্রও মাৎস্যন্যায়ের গণতন্ত্র। তোমাকে প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপন করতে হবে সুরং। আমাকে তুমি ছেড়ে যেও না। আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব—"

চপলা ঠিক এই কথাগুলিই হয়তো বলে নাই, কিন্তু যাহা বলিয়াছিল তাহার ভাবার্থ উহাই। কার্তিক ঠিক করিয়াছে চপলার এই আদর্শকে সে মূর্ত করিবে। এ স্থান ত্যাগ না করিবার আর একটা কারণ নিমু। নিমু বলিয়াছে সে আর কোথাও যাইবে না। এইখানেই থাকিবে। চপলাদির আদর্শ অনুসরণ করিয়া সে নিম্ন-মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের সেবা করিবে। কৃষ্ণধনবাবুর পরিবারের সহিত সে মিশিয়া গিয়াছে। ভোমরা এখন তাহার সখী। ভোমরার ছেলেমেয়েরা তাহারই ছেলেমেয়ে। মালতী মাথায় সিঁদুর পরিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সে বিবাহ করিয়াছে একটি অবাঙালী নীচজাতীয় যুবককে। কৃষ্ণধনবাবু এ বিবাহ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। নবজামাতাকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া ভুরিভোজন করাইয়াছে নিমু। মালতীর মুখে হাসি ফুটিয়াছে। একটি দুঃখজনক ঘটনায় কার্তিকের অর্থসমস্যারও সমাধান হইয়া গিয়াছে। করোনারি হইয়া কালীকিংকর মারা গিয়াছেন কিছুদিন পূর্বে। নিমুই এখন সমস্ত বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।

সেদিন একটি জনসমাবেশে অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া কার্তিক উপস্থিত হইল। আনটোর ঘোড়াটা সে-ই আজকাল ব্যবহার করে। আনটো ঘোড়াটারই সেবা করে আজকাল কেবল। আর কিছু করে না। নিমুর স্নেহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে সে। তাহার ফাই-ফরমাস খাটে এবং মাঝে মাঝে সার্কাসের নানা রকম বাজি দেখায় তাহাকে।

বিরাট জনতাকে সম্বোধন করিয়া কার্তিক বলিতে লাগিল—এখনও মাঝে মাঝে খবর পাওয়া যাচ্ছে সবলরা দুর্বলকে পীড়ন করছেন। আপনাদের সেবক আমি। আপনাদের কাছে করজোড়ে নিবেদন করছি, জোর যার মুলুক তাক—এ নীতি ভুল নীতি। সংস্কৃতে এর নাম মাৎস্যন্যায়। দেশে অষ্টম শতাব্দীতে এই মাৎস্যন্যায় আমাদের দেশকে যখন ছারখার করছিল তখন দেশের লোকেরা গোপালদেব নামক একজন লোককে নির্বাচিত করে এ দেশে গণতন্ত্র স্থাপন করেন। দেশে আবার সুখ শান্তি ফিরে আসে। কেন এই গোপালদেবকে নির্বাচন করেছিলেন দেশের লোকেরা? ইতিহাসে এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর নেই। ইতিহাসে এর সদুত্তর না থাকলেও আমাদের মনের ভিতর এর সদুত্তর আছে। গোপালদেব সকলকেই সমান মনুষ্যত্ব মর্যাদার আশ্বাস দিয়েছিলেন, যে আশ্বাস আমরা এই সেদিনও শুনেছি কবি সত্যেন্দ্রনাথের কণ্ঠে, তাঁর 'আখেরী' কবিতায়—

> কেউ কারো দাস নয় দুনিয়ায়, এই কথা আজ বলব জোরে
> মিথ্যা দলিল তাদের যারা জীবকে দ্যাখে তুচ্ছ করে'।
> দলিল তাদের বাতিল যারা মানুষকে চায় করতে খাটো।
> হামবড়াইয়ের সংহিতা কোড, বেবাক কাটো বেবাক কাটো।
> সবাই সমান এই জগতে—কেউ ছোট নয় কারোই চেয়ে

কার কাছে তুই নোয়াস মাথা ত্রস্ত চোখে কম্পদেহে ?
সবাই সামনে আঁতুড় ঘরে, বলের দেমাক মিছাই করা
সবাই সমান শ্মশান-ধূলে, বড়াই-ধুয়া মিছাই ধরা।
মিথ্যা গরব গোত্র-কুলের মিথ্যা গরব রঙ বা ঢঙের
ভেদের তিলক-তকমাতে লোকসংখ্যা বাড়ায় কেবল সঙের।
মরদ বলেই গরব যাদের, চায় নারীদের দলতে পায়ে
তৈমুরও যার স্তন্যে মানুষ, মরদ সে কি ? আয় সুধায়ে।
চেঙ্গিসও যার পীযূষ-কাঙাল পুরুষ সেকি ? জিজ্ঞাসা কর
মাংসপেশীর পেষণ বলে হয় না মহৎ হয় না ডাগর।

প্রতিটি মানুষ যেদিন প্রতিটি মানুষকে এই মর্যাদা দিতে পারবে, শুধু বাহ্যিক লোক দেখানো আর্থিক সাম্য নয়, যেদিন শ্রদ্ধা-পূত আন্তরিক সাম্য জাগবে সকলের মনে, সেই দিনই আবার সুখ শান্তি ফিরে আসবে। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য আমাদের হীন করে, দুর্বল করে এবং তারই পঙ্কে আমরা শেষে তলিয়ে যাই নিজেরাও। অষ্টম শতাব্দীর গোপালদেব যা করতে পেরেছিলেন আমরাই বা তা পারব না কেন ? যে গণতন্ত্রে টাকা দিয়ে বলপ্রয়োগ করে লোভ দেখিয়ে ভোট যোগাড় করতে হয় সে গণতন্ত্র গণতন্ত্র নয়—গণতন্ত্রের নামে তাও ধনতন্ত্র তা-ও জবরদস্তিতন্ত্র। আপনাদের কাছে আমার আবেদন, আপনারা পশুত্বের পথ ত্যাগ করে মনুষ্যত্বের আদর্শের দিকে উন্মুখ হোন, স্থাপন করুন সেই গণতন্ত্র যা স্বাধীন বিচার-শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা লোভ বা মোহ দ্বারা প্রভাবিত নয়—"

আর একজন অশ্বারোহী একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি কার্তিকের পাশে আসিয়া অশ্বের বল্গা সংযত করিলেন। বলিলেন, "আপনার বক্তৃতা শুনলাম। যদি অনুমতি করেন এ বিষয়ে আমার মতামতও ব্যক্ত করি।"

"কে আপনি।"

"আমার নাম ফকির চাঁদ সামন্ত।"

নামটা শুনিয়া কার্তিকের ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। নামটা যেন শোনা-শোনা।

"আপনিই কি গোপালদেব সম্বন্ধে একটা বই লিখেছিলেন ? ডাস্টবিন থেকে আপনার বইয়ের পাণ্ডুলিপি আমি সংগ্রহ করেছিলাম—"

"ও। মালিনীর জ্যাঠা আমাকে দূর করে দিয়েছিলেন। আমার সমস্ত জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। আমি পালিয়ে এসেছি। আমি কিছু বলতে চাই—"

"বেশ তো, বলুন—"

"আমার বক্তব্য সংক্ষেপেই বলছি। সবাই জানেন, গোপালদেব অষ্টম শতাব্দীতে অসাধ্যসাধন করেছিলেন। আমার মনে হয় তা তিনি করতে পেরেছিলেন কারণ তিনি প্রেমিক ছিলেন। তিনি শুধু যে বৌদ্ধ ছিলেন তা নয়, আমার মতে তিনি সহজিয়া-পন্থী সাধকও ছিলেন। দেদ্দা ছিলেন তাঁর সাধনসহচরী। তাঁদের অনাবিল প্রেমই জনপ্রিয় করেছিল তাঁদের। প্রেমের জোরেই তাঁরা জাতিভেদের বৈষম্য দূর করে স্থাপন করেছিলেন আদর্শ গণতন্ত্র—"

ফকির চাঁদের পিছনে আর একটি ছায়া অশ্বারোহী আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার হস্তে ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত শাণিত তরবারি, চোখের দৃষ্টিতে প্রদীপ্ত অগ্নি-শিখা।

তিনি বলিলেন—"আদর্শ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে শক্তির জোরে। সত্য শিব সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করবার আগে, বিনাশ করতে হবে অসত্য অশিব ও অসুন্দরকে। তা প্রেম অহিংসা বা সাম্যের বুলি আউড়ে হবে না—তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান করতে হবে!"

তাঁহার কথা কিন্তু কেহ শুনিতে পাইল না। তাঁহার আবির্ভাবও কাহারো দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না। সেই মহাপ্রেত মহাশূন্যে অসি আস্ফালন করিতে করিতে ক্রমশঃ বিলীন হইয়া গেলেন।